

যখন পুলিশ ছিলাম

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

[redacted] যখন পুলিশ ছিলাম

৩৭)

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল Ph. D., M. Sc., D. Phil, IPS, J.P

জ্ঞানপীঠ
১৬/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
সুধীন ভট্টাচার্য
জ্ঞানপীঠ
১৬/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ আঠার টাকা

মুদ্রাকর ঃ
শুভংকর বসু
জে. জি. প্রিণ্টার্স
১৮৯. অরবিন্দ সরণী
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

সমিত ঘোষাল
সুতপা ঘোষাল
অমিত ঘোষাল
কে
স্নেহের সহিত
পঞ্চানন ঘোষাল

প্রথম অধ্যায়

আমার পুলিশি জীবন এখানে কোনও ব্যক্তিগত জীবন নিশ্চয়ই নয়। এটা ভারতীয় ইতিবৃত্তের একটা উল্লেখ্য সময়কালের ইতিহাস। এই ইতিহাসের সূচনা হয় কলকাতাতে। পরে এটা সমগ্র বাংলাদেশ ও তার পরে সমগ্র ভারতে এর বিস্তৃতি ঘটে। এই বিচারে এটার গুরুত্ব নিশ্চয় অসীম। কলকাতা পুলিশে দীর্ঘকাল বহাল থাকাতে এই ইতিহাস গড়ে উঠতে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। আমরা এখানে দেখেছি পর পর তিনটে কংগ্রেসী আন্দোলন এবং তা দমনে নৃশংস রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন। আমরা দেখেছি বিপ্লবীদের দ্বারা সাহেব হত্যা ও সেই সময়ে তাদেরও নিহত হওয়া। আমরা দেখেছি সুভাষবাবু কে ও তাঁর অন্তর্ধানের রহস্যও জেনেছি, আমরা দেখেছি মহাযুদ্ধ ও তার জন্য সামাজিক রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন। পরে আমরা দেখেছি, কলকাতা ১৯৪৬ সনের ক্যালকাটা কিলিঙ নামে খ্যাত সাম্প্রদায়িক মহাদাঙ্গা এবং এর পরেতে দেখেছি স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন, এইগুলি শুধু আমরা দেখেছি ত বটে, উপরন্তু ঐগুলিতে আমরা সক্রিয় অংশও গ্রহণ করেছি। প্রতিটি ঘটনাই ভয়াবহ ও চিত্তাকর্ষক। এতে বহু অজানা তথ্যও জানা যাবে। এগুলি এখন আজ আর সিক্রেট নয়। ঐ গুলি এতো দিনে ইতিহাস। নইলে ঐ গুলি প্রকাশ করতে আমি পারতাম না। কিন্তু এই সব গোপন তথ্য ফাঁস করার পূর্বে আমার পুলিসী চাকরী গ্রহণের কারণটা সংক্ষেপে বলবো, কিন্তু এর আগে অন্য একটা বিষয় বলে রাখা উচিত হবে। কারণ—এর মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ নিহিত থেকেছে।

[এখানে উল্লেখ্য এই যে, প্রথমে এই পুলিশ বিভাগে আমি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারিনি। মন তখনও আমার দোদুল্যমান। শৈশবের একটা ঘটনাতে পুলিশের উপর মন বিষিয়ে ছিল। সেই কালের একটা থানার অলিন্দতে জনৈক নারীকে মাথার চুল ধরে তার পিঠে জনৈক পুলিশ কর্মীকে কিল বসাতে দেখে-ছিলাম। শিশু মনে স্বল্প আঁচড়ে বেশী দাগ কাটে। তাই পরেতে পুলিশে ঢুকেও ওই ঘটনাটি আমার অবচেতন মনে থেকে গিয়েছে। পরে গান্ধী আন্দোলনের মধ্যে একটু একটু করে বড় হয়েছি। আমরা প্রত্যহ বিদ্যালয় হতে ফিরতি মুখে পুলিশকে স্বদেশী মিটিং ভাঙতে দেখেছি। ওদের উদ্যত লাঠির আঘাত হতে মাথা বাঁচাতে অন্যদের সঙ্গে আমরাও ফুটপাত ধরে দৌড়ে পালিয়েছি। বাসন্তী দেবীদের গ্রেপ্তারের সংবাদে আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছি।

কিন্তু অন্য একদিকে আমরা পুলিশের উপর সহানুভূতিশীল হতাম। আমরা প্রায়ই দেখতাম বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হওয়া পুলিশ কর্মীদের শবাধার আনা। কোনও এক পুলিশ কোয়াটার্সের সম্মুখে কিছুক্ষণের জন্য শবদেহ নামানো হতো,

একজন সদ্য বিধবা হওয়া মহিলা আলু থালু বেশে ঐ বাড়ী হতে বেরিয়ে শবদেহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাড়ীর লোকেরা এসে জোর করে তাঁকে তুলে নিয়ে গেছে। তবে দেশপ্রেমী বিপ্লবীদের জন্যও আমাদের গর্ব থেকেছে। তাদের ফাঁসীতে ও গুলিতে নিহত হওয়া ও কালাপানি হওয়া সংবাদেও আমরা ক্ষুব্ধ হতাম। আমাদের অনেকেরই মন তখন ঔচিত্য, অনৌচিত্যের মধ্যে দোদুল্যমান। এইরূপ মন সমেত পুলিশে ঢোকার কারণটি এবার এখানে আমি ব্যাখ্যা করে বলবো]

ইউনিভারসিটির শেষ পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এম. এস. সি. পরীক্ষাতে নিজ বিষয়ে প্রথম হয়েছি। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডঃ গিরীন্দ্র শেখর বসুর তত্বাবধানে এ্যাবনরমাল সাইকোলজীতে গবেষণা করছিলাম, পচাত্তর টাকা মাসে স্কলারশীপেতে। জীবনের উদ্দেশ্য এই যে ভবিষ্যতে একজন প্রফেসার হবো। জীবনের অন্য উদ্দেশ্য ছিল একজন সাহিত্যিক হওয়া। ততোদিনে তৎকালীন একটা বিখ্যাত পত্রিকা কল্লোলে আমার একটা গল্পও মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু ইংরাজীতে একটা প্রবাদ থেকেছে। ম্যান প্রপোজেস গড ডিসপোজেশ ; পরিশেষে আমাকে পুলিশে ঢুকতে বাধ্য হতে হলো।

বিশ্বভারতীর বর্তমান ভাইস চ্যান্সালার ডঃ প্রতুল গুপ্ত এবং কনিষ্ট ভ্রাতা ডঃ হীরন্ময় তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। প্রতুল গুপ্তের সম্পাদিত কণা পত্রিকাতে আমরা সকলে লিখি, সেই সূত্রে প্রতুলবাবুর কাছ হতে কাজী নজরুলের সদ্য প্রকাশিত 'অগ্নিবীণা' পুস্তকটি পেলাম ও তা পড়ে মুগ্ধ হলাম। এরপর আমাদের দুই ভ্রাতার একটু দুর্মতি হলো। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমাদের দুইজনের জন্ম এক পুরুষানুক্রমে খেতাবধারী ও উচ্চপদী এক রাজভক্ত জমিদার পরিবারে। আমাদের পিতামহ রায়বাহাদুর কমলাপতি (১৮২০-১৯০৮) প্রথম ভারতীয় পুলিশ সুপার ছিলেন। শুধু তাই নয়, তখন আমার জেঠামশাই রায়বাহাদুর কালসদয়, যিনি তখন কলকাতা পুলিশের এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার ছিলেন, তার সরকারী কোয়ার্টার থেকে অমি পড়াশুনা করি। দুজনে কাউকে না বলে লুকিয়ে গিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে হুগলিতে দেখা করলাম। কিন্তু আমরা জানতাম না যে ওর বাড়ীতে পুলিশের ওয়াচ আছে। বাড়িতে ফিরে সব শুনে আমরা অবাক, কলকাতা পুলিশের কমিশনার জবরদস্ত টেগার্ট সাহেব আমাদের ওঁর নিকট উপস্থিত করবার জন্য হুকুম দিয়েছেন। পরের দিনই বকুনি দিতে দিতে সঙ্গে করে আমাদেরকে ওঁর অফিসে নিয়ে গেলেন, ও বললেন যে এবার হতে উনি আমাদের উপর কড়া নজর রাখবেন। কিন্তু টেগার্ট সাহেব আমাদের সকলকে অবাক করে বললেন—নো নো দ্যাট ওণ্ট সল্ভ দি প্রবলেম, পুট দেম ইন দি পুলিশ। ভ্রাতা হিরন্ময় **I. C. S.** পরীক্ষা দেবার অজুহাতে ওরই সাহায্যে ইয়ুরোপে পাড়ি দিল। পরে সে ডক্টরেট ভাষাবিদ হয়ে পোলাণ্ডে ওয়ারসা য়ুনিভার্সিটিতে স্লাভ ফাইলোলজীর প্রফেসার ও দেশ স্বাধীন হলে মস্কোতে ভারতীয় দূতাবাসের সে ফার্স্ট সেক্রেটারী হয়েছিল, কিন্তু সে যাই হোক তার ভাগ্য ছিল ভালো। কিন্তু আমি এতে পুলিশে ঢুকতে বাধ্য হলাম। কারণ ঐ যুগে অভিভাবকদের

আদেশকে ঈশ্বরের আদেশ ভাবা হতো। পরের বছরেই আমাকে ওদের সিলেকশন বোর্ডে হাজির হতে হয়েছিল।

পুলিশ টেনিং স্কুলে আমাকে যেতে হলো বটে। কিন্তু দিনেতে প্যারেড করে ও আইন পড়ে ক্লান্ত হয়ে রাত্রে ঘুমের মধ্যে পুরনো দিনের ঘটনাগুলো মস্তিষ্কে ওর স্মৃতি পটে ফুটে উঠতো। সেই দূর অতীতের বিষয় থেকে থেকে মনে পড়ছে। ঐসময় গান্ধীজী কংগ্রেসে এসেছেন ও স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। ততদিনে চিত্তরঞ্জন দাসও এতে যোগ দিয়েছেন। স্কুলে পড়া কালে ওঁদের আহবানে একবার স্কুলও ছেড়েছিলাম। কিন্তু অভিভাবকদের থাপ্পড় খেয়ে ফের স্কুলে ফিরে এসেছি। কিন্তু তবুও লুকিয়ে কতোদিন পার্কে গান্ধীজী ও চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা শুনতাম ও দেশাত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হতাম। পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে। রাত্রে ঘুমের মধ্যে শুনতে পেতাম চিত্তরঞ্জনের সেই উদাত্ত বাণী। বিলাতী ধুতির আধখানা ছিঁড়ে তা আগুনে ফেলে ওর বাকি আধখানা পরে বাড়িতে ফের'। আরো চাই, আরো চাই, বিলাতি কাপড় পোড়াও। চোখের মধ্যে ভেসে উঠতো তক্ষুনি অন্য আর একটা দৃশ্য। শীর্ণ দেহী গান্ধীজী মঞ্চ হতে নেমে বস্ত্র স্তুপে আগুন ছোয়ালেন। আর তার পরে তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন। পড়ুয়া লোক স্কুল ছোড়ো, উকিল লোক আদালত ছোড়। দেন স্বরাজ উইল বি ই আবটেণ্ডম টোডে। মহম্মদ আলি—আলি ভ্রাতৃদ্বয়েরও মুখে শুনতে পেতাম। জজ ফিস্থ দি কিং অফ ইংল্যাণ্ড প্যারহ্যাপস স্টিল দিই এমপারার অফ্ ইণ্ডিয়া। তবে ইংরাজ তাড়াবার তেজী বক্তৃতা ইংরেজীতে হয়েছে। কিন্তু ভোর হতেই বিউগিলের আওয়াজে সেই ঘুমও ভেঙেছে ও আমরা তাড়াতাড়ি উঠে প্রাতঃকৃত সেরে 'ড্রিল ও তারপর প্যারেডে যোগ দিতে প্রস্তুত হতাম। পরের বার বিউগেল বাজতেই পরিচ্ছন্ন উর্দীতে মাঠেতে দৌড়তে হবে। কলেজে পড়া কালে আমি ওখানে স্টুডেণ্ট ইউনিয়নের এবং ওদের ব্যায়াম ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী থেকেছি। উপরন্তু—তৎকালীন য়ুনিভার্সিটির ট্রেনিং (**C. U. T. C** সৈন্য দলের কর্পোরাল রূপে রাইফেল সুটিং) এ প্রথম হয়েছি, সুতরাং ওই সবে আমার কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু অসহ্য হলো ওই স্থানের এ্যাংলো কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার ও এ্যাঙলো সার্জেণ্ট কেডার এবং বাঙালী অফিসার কেডারদের মধ্যে বিমাতৃ স্বরূপ পার্থক্য। ওদের ব্যারাকে ইলেকট্রিক ফ্যান ও পালিশ করা খাট। কিন্তু আমাদের পাখা হীন ব্যারাকে লৌহ, খাট ওদের শুধু প্যারেড ও খেলা, কিন্তু আমাদের আইন পড়ার সঙ্গে অহেতুক কয়েক মাইল দৌড় করান। আইনের ছাত্রও থাকাতে ওতে আমার অসুবিধা নেই। কিন্তু কারণে, অকারণে গালি গালাজ পুরোপুরি অসহ্য। উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যে পুরোপুরি স্লেভ মেনটালিটী আনা ও বুঝানো যে আমরা ওদের অধীন একটি জাতি। পরাধীনতার গ্লানি এতো স্পষ্ট রূপে পূর্বে আমরা অনুভব করিনি। একবার সহরের মধ্যে দিয়ে মাত্র বাঙালীদেরকেই দৌড় করানো হলো। আমাদের একজন ক্লান্ত হয়ে ট্রামে ফিরতে চাইলে তাকে বলা হলো ঃ ইড আর টু ড্রাগ ট্রাম।

একদিন অবস্থা ওরা চরমে উঠালেন। ঐ এ্যাঙলো প্রধান গাল পেড়ে বললেন 'ইউ নেটিভ ডগস্'। প্রতিবাদে আমি এতে ফেটে পড়লাম। বেটা কুকুর মারা সাহেব। সেই দিনই কাজেতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। কিন্তু সেখানে আমার ভাগ্যে শুধু ভৎসনা। শেষ পরীক্ষার পর ট্রেনিং হতে বেরুবার সময় এতে অমি গেলাম কেন? কিন্তু মনেতে তখনও আমার জিদ। ঠিক আছে। আমি সেই বছরেই এক সর্বভারতীয় পরীক্ষাতে বসলাম ও তাতে তৃতীয় স্থান পেলাম। কিন্তু ভাগ্য তখনও আমার বিরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় হওয়া দুই জন কাস্ট হিন্দু নিয়ে সাম্প্রদায়িক নিয়োগ রীতিমতো আমার দশজনের তলা হতে প্রায় আটজন এ্যাংলো, মুশ্লীম, সিডিউল নেওয়াতে আমি উচ্চ সার্ভিস হতে বাদ পড়ে গেলাম। কিন্তু এতে হতাশ না হয়ে অন্য এক সর্বভারতীয় কাষ্টম সার্ভিসে বসলাম। বোর্ডের ইংরেজ চেয়ারম্যান আমাকে পছন্দ করে বলেছিলেন, ইউ আর গোসেল পি। ঘোষাল দ্যাট ইজ্—সিডিউল কাষ্ট। দেন আই সিলেকটেড ইউ। ঐ সময় ওকে কিছু না বললেও এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেয়েও ওতে জয়েন করলাম না।

এরপর শুনতে থাকি যে আমার লেখাপড়া শিক্ষা ব্যর্থ, এবং আমি একজন অকর্মণ্য অসমর্থ তরুণ। একদিন হগ মার্কেটে কিছু কিনতে গিয়েছি হঠাৎ সেখানে পুলিস ট্রেনিং কলেজের এ্যাংলো প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা, ভদ্রলোক ক্রুর হাসি হেসে আমাকে শুনালেন: মাই ল্যাড। আই হ্যাভ ফায়ারড ইউ ওয়েল। ইউ আর থ্রোন অন সার্কুলার রোড।

ওর ওই বাণী শুনে রক্ত টগবগ করে আমার দেহেতে ফুটছিল, আমি ওই স্থান হতেই লাল বাজারে এসে টেগার্ট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ওই অভদ্র বাঙালী বিদ্বেষী এ্যাংলো সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। স্যার চার্লস টেগার্ট আমাকে চিনতেন। উনি আমায় প্রতিটি অভিযোগ মন দিয়ে শুনে বললেন: এটার কিছু কিছু আমি শুনেছি, তবে এতটা আমি জানতাম না। এসব সত্য হলে এর প্রতিকার করা হবে। কিন্তু তোমাকে আমি নিজে সিলেকট করেছি। ট্রেনিং কলেজের বাইরের পরিবেশ তুমি সম্পূর্ণ অন্য রূপে দেখবে।

এরপর উনি পেনসিল দিয়ে লিখে একটা স্লিপ আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তুমি এখান হতে নর্থ ডিসট্রিক্ট অফিসে মিঃ গর্ডনের অফিসে চলে যাও। কাল থেকে থানাতে জয়েন করবে। আমি ওখানকার ডেপুটি সাহেবকে ফোনে বলে দিচ্ছি। পরে জেনেছিলাম যে এটা ওঁর একটা জেদ। ওঁর, আমাকে সিলেকসন ভুল নয়। উনি এটাই প্রমান করবেন। এই রূপ জেদ আমারও মধ্যে থেকেছে। তাই তক্ষুনি আমি তাঁর ইচ্ছামত কলকাতা পুলিশের নর্থ ডিস্ট্রিক্ট অফিসে এসে ওর প্রধানের সঙ্গে দেখা করে পুলিশে বহাল হলাম। ওদিকে বাড়িতে আমার জন্য খোঁজা খুঁজি পড়ে গিয়েছে। আমাকে অহরহ এমন বকাবকির জন্য তখন তারা চিন্তিত, অনুতপ্ত ও দুঃখিত।

এখানে উল্লেখ্য এই যে প্রথমে আমি পুলিশের উপর কঠোর তদারকী ও তাদের জীবন ধারার ওপর নজর রাখা আদৌ আমার পছন্দ হয়নি। কিন্তু পরেতে ওখানে

অন্যরূপ কাজ হতে দেখে বুঝেছিলাম যে এর প্রয়োজন থেকেছে। পুলিশকে অসীম ক্ষমতার আইনী অধিকারী করা হয়েছে। এরা আইন মতে যে কোনও নারী ও পুরুষকে গ্রেপ্তার করতে ও অপমান করতে সক্ষম। উৎপীড়ন, উৎকোচ গ্রহন ও চরিত্রহীন হওয়ার সুযোগ সুবিধা এদের সবচাইতে বেশি। মানুষের মধ্যে কদর্য কাজ করার ইচ্ছা সুযোগের অভাবে স্থগিত থাকে।

এই জন্যে—ওই যুগে ভেক্সেসাস এ্যারেস্ট এর জন্য কলকাতা পুলিশ এ্যাক্টের একটা ধারাতে ওদের দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। প্রতিবৎসর অন্তত পঞ্চাশটি অফিসার ও সিপাই উৎকোচ গ্রহণ ও উৎপীড়নের অভিযোগে ডিসমিস হয়েছেন কিংবা আদালতে সোপর্দ হয়েছেন। ওইটা হতে মানুষের এই প্রবনতার এই আধিক্য বুঝা যেতো। এই কারণে যাতে ওরা কোনও থানাতে দলবন্দী না হয় তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। এই রূপ আভাষ পাওয়া মাত্র দল ভাঙতে ওদেরকে বিভিন্ন দূর দূর স্থানে বদলি করা হয়েছে। পুলিসে এই জন্য য়ুনিয়ন করা দণ্ডনীয় অপরাধ থেকেছে। জনগনের নিরাপত্তার ও মান সম্মান রক্ষার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। ঐ কালে এই জন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনরের অফিসারদের উপর অর্পিত (Deligated) ক্ষমতা প্রত্যাহার করবার অধিকার ছিল। এই ক্ষমতা প্রদান কালে তাদেরকে সম্মুখে দাঁড় করিয়ে বলা হতো তার একটি বয়ান। 'আই চার্জ' ইউ উইথ দি পাওয়ার এণ্ড প্রিভিলেজ অফ্ ও পুলিশ অফিসার। ইউ মাস্ট নট মিস ইউজ ইট'স, নেমেসিয়েটিং ইস ফোথ উইথ উইথড্রয়াল"।

এই পাওয়ার ও প্রিভিলেজ এর প্রত্যাহারের প্রকৃত অর্থ তা পুলিশ কর্মীরা ভালো রূপেই বুঝতেন। এই জন্য তারা ভোক্যাল অর্থাৎ মুখর পাবলিককে ভয় করেছে। অন্যদিকে তাদেরকে চিফ্ পপুলারিটিকেও এড়াতে হয়েছে। এটিও উর্ধতনদের পছন্দ হতো না। এই রূপ অবস্থাতে ওদের তক্ষুনি অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এই জন্য ঐ কালো জনরোষকে পুলিশ অফিসাররা অত্যন্ত ভয় করেছে। জনগণেরপ্রতি সামান্য অসত্য ব্যবহার সহ্য করা হয়নি। ব্রিটিশরা আইন মেনে চলা, ও লয়েল সাবজেকটদের সর্বতভাবে রক্ষা করেছে। কোন পুলিশ কর্মী থানার বাইরে গেলে সময়ের ও তারিখের পরিপ্রেক্ষিতে তার বাইরে যাওয়ার কারণ লিখতে হতো। এবং ফিরে এসে সে কোথায় কি কাজ করে এলো তাও তাতে লিখতে হতো। কিন্তু এতো কঠোরতার মধ্যেও জনগনের প্রতি অসৌজন্যের জন্য বহু কর্মী প্রতি মাসেই দণ্ডিত হোত। পুরাতন পুলিশ গেজেটগুলি খুলেই তা দেখা যাবে।

কিন্তু গান্ধীজী আন্দোলনের দৌলতে ইংরাজ উর্ধতনরা তাদের এই পুরাতন রীতি নীতি হঠাৎ বদলে ফেললেন। এখানে তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার প্রশ্ন এসে পড়েছে। গান্ধী অন্দোলনের ব্যাপকতাতে তারা তখন উন্মাদ প্রায়। এরা বুঝেছিলেন যে আইন ভঙ্গকারী এই আন্দোলনকে রুখতে হলে তা বে-আইনী ভাবে রুখতে হবে। তাদেরকে এই কাজে সহায়তা করতে ভিন্নমেজাজের অফিসারগণও এগিয়ে এলো। এর ফলে আইন অনুযায়ী বৃটিশ প্রসাশন সেখানে অন্তত কিছু কালের জন্য থাকেনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ট্রেনিং স্কুলে এ্যাঙলো অধিকর্তার কটুক্তি সহ্য করতে না পেরে চাকুরি ত্যাগ করি। কিন্তু বাইরে এসে দেখলাম একজনের বদলে বহু জনের কটূক্তি শুনতে হচ্ছে। আমার চাকুরি ত্যাগের এত বড় বীরত্বের কেউ মর্যাদা দিলো না। সকলেরই অভিমত চাকুরি পাওয়া সহজ কিন্তু তা রক্ষা করা কঠিন। সৌভাগ্য এই-যে টেগার্ট সাহেব আমাকে পুনর্বহাল করলেন। সেই সঙ্গে ট্রেনিং স্কুলে এদেশীয় লোকেদের উপর দুর্ব্যবহার বন্ধেরও ব্যবস্থা করলেন। আমার দীর্ঘ সুঠাম দেহ টেগার্ট সাহেবের বিশেষ পছন্দ, আমার চেহারা যে স্পেলেনডিড তথা অতি ভাল তা বহুলোকের মুখে শুনেছি।

ছেলেবেলায় আমার চেয়ে বয়সে বড়ো বন্ধুকে মহিলারা আদর করে কাছে টেনে বলতেন "এস বাবা এসো"। আর আমি বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা বলেছেন 'একজন ভদ্রলোক এসেছে' ওঁকে বাইরের ঘরে বসতে দে। বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষ বলেছে যে পাত্রের বয়স বেশি। একমাত্র গড়ের মাঠে র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে, ভীড়ের এপার হতে ফুটবল ম্যাচ দেখার আমার তখন যা কিছু সুবিধা। কিন্তু পুলিশে ওই দোষটাই আমার মহাগুণ হিসাবে পরিগণিত হল।

এই পুনর্বহাল না-হলে ও পুলিশে না-থাকলে অপরাধ-বিজ্ঞান গবেষনা কাজে অপারগ হতাম। এই বিজ্ঞান-বিষয়ের বহু মূলসূত্র তাহলে অজ্ঞাত থেকে যেত। এজন্য টেগার্ট-সাহেবের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর হাতে লেখা ঐ শ্লিপটি নিয়ে উত্তর-কলকাতার ডিসট্রিকট অফিসে এলাম। এখান হতে ডেপুটি কমিশনার গর্ডন সাহেব আমাকে থানায় বহাল করেন।

আমার খোঁজে জ্যেষ্ঠতাত রায়বাহাদুর কালীসদয় ঘোষাল নর্থ ডিসট্রিকট পুলিশ অফিসে ফোনে খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন, তিনি বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার ও বিপিন গাঙ্গুলির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এই অপবাদে তাঁকে স্পেশাল ব্রাঞ্চে ডেপুটি কমিশনার করা হয়নি। প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি তখন লম্বা ছুটি নিয়েছেন। আমার খোঁজ পেয়ে উত্তর-কলকাতার ডিসট্রিক্ট অফিসে বসে তিনি কয়েকটি উপদেশ আমাকে দিয়েছিলেন। যেমন, ইচ্ছা করে বদলি হয়ো না। মদ নারী সর্বদা বর্জন করবে। এক কপর্দকও উৎকোচ গ্রহণ করবে না, ইত্যাদি। পরে বলেছিলেন ওরা আমাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি-পদ থেকে বঞ্চিত করলো। আমি আশা করি যে দ্রুত প্রমোশন পেয়ে ওই পদে একদিন তুমিই বসবে। তার উপদেশ আমি সারা জীবন আক্ষরিক অর্থে পালন করেছি। আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনারও হয়েছি। কিন্তু তখন পূর্বের মতো ওই পদের মর্যাদা ও জৌলুস ছিল না। উনিও ততদিন পর্যন্ত জীবিত না থাকাতে তা জেনে যেতে পারেননি।

আমি হুকুম মত বড় বাজার থানাতে এসে সেখানে আসা অভিযোগকারীদের ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওদের ব্যাপার চুপ করে দেখছিলাম।

বড়বাজার থানা

ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়ো থানা বড়বাজার থানা। এলাকার এক, এক ম্যানসনেতেই মহকুমার মতো অতো লোকের বাস। সেখানে থানার ইনচার্জ যথারীতি গরহাজির এইথানার কাজকর্ম এমনই যে এখানে তালা-ভাঙা, হারচুরি, ছেলেচুরি, গাড়ির ধাক্কা, কুলি হারানো, বিড-গাম্বিলিং ব্যাংক। আদি নিত্য ফ্রড্ অভিযোগ নৈমিত্তিক ঘটনা। বড়ো বড়ো থানায় ঘটিবাটি চুরি বা ছোট খাটো চুরি গৃহীত হয় না। ওগুলি নথিভূক্ত করে অভিযোগকারীদের বিদায় দেওয়ারই রীতি। পেটি থেফট প্রভৃতির এনকোয়ারি রিফিউজ করা হয়। দুজন লিখিয়ে বাবু নথীপত্রে মামলা লিখে হিমসিম।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। বড়ো সাহেব ডাইরি ও ডেলি রিপোর্ট দুই-ই এখনই চান। তিনি রাত্রে কোথায় নিমন্ত্রণে যাবেন। শুকুল সাহেবের ডায়েরি লেখা তখনও শেষ হয় নি। কলমের গতি একটু বাড়িয়ে তিনি মুন্সী বাবুকে বললেন, ওঁকে বলে দাও এখনই ডায়েরি আর ডেলি-রিপোর্ট ওখানে পাঠাচ্ছি।

টেলিফোন বেজে ওঠার বিরাম নেই তবু। আগুন লাগার খবর। সেখানে হাল্লা বাহিনী ও অফিসার পাঠাতে হবে। ফের বড়ো সাহেবের তাগিদ। ডায়েরি ও রিপোর্ট পাঠাও। টেলিফোনের ওপার হতেই চিৎকার শোনা যাচ্ছে: কি হল? এখনও পাঠাচ্ছ না কেন? শক্রুল-সাহেব ডায়েরি লেখা থামিয়ে হুকুম দিলেন: 'ওকে বলে দাও ডাক বহুক্ষণ আগে চলে গেছে। এদিকে শিগগির একজন সাইকেল অর্ডারলিকে তৈরি করো। আমি বুঝলাম আত্মরক্ষার জন্য এগুলি এক ধরনের কৌশল।

'বাবু সাহেব! এক নোকর বিশ হাজার রুপেয়া লেকে ভাগা', এক পাগড়িধারী মাড়োয়ারী থানায় ঢুকে বললে, নেগীজমে ষাট হাজার রুপেয়া থে। লেকেন বুড়বাক কো উহো মালুম নেহি'।

'ক্যা, তুম ক্যা বোলতা'? এক অফিসার ডায়েরি লিখতে লিখতে মুখ তুললেন: একজন অফিসার আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। 'হাঁ। এই সেন বাত আছে? নকোরকা ক্যা নাম? উনকো গাঁও আওর কাঁহা'?

'উসকো নাম হুজুর', মাড়োয়ারী লোকটি এই বার একটু বিব্রত হয়ে বললেন, উনে নাম বোলা থা বনবিহারী ইয়ে রাম হরি। এতোয়ারী—ভি হো শেখ থা। উসকো গাঁওকো নাম বোলা থা। মতি হারী ইয়ে গাজীপুর, গাজিয়াবাদ ভি হো শে কথা। তারপরই সেখানে একটি কুলি-হারানো মামলা—এসে গেল। চল্লিশ হাজার

টাকার জিনিস-সমেত ট্রাঙ্ক নিয়ে কুলি উধাও। তার নাম ঠিকানা ও নম্বর ফরিয়াদীর জানা নেই। মশাই, মশাই, সর্বনাশ হয়েছে, এক প্রৌঢ় বাঙালী থানায় ঢুকে বললেন, 'আমার নাবালিকা স্ত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না।

একদল জুয়াড়ীকে ভেড়ার মতো তাড়াতে—তাড়াতে থানায় আনা হল। হাত গুলো জোড়ে-জোড়ে, একসঙ্গে গামছা দিয়ে বাঁধা। দলে পরিচিত কিছু পুরনো পাপীও ছিল। থানার ভিতর ভীড় এবার আরও বাড়লো। এরই মধ্যে গেটের পাহারাদার শান্ত্রী চিৎকার করে জানালঃ 'বড়বাবু, বড়বাবু, আ গায়া'। এই ভাই সব সবকোই মু' সামালকে। অর্থাৎ এবার সবাইকে মুখ বন্ধ করতে হবে। আর তিনি এবার মুখ খুলবেন এবং গালাগালি দেবেন।

ইনচার্জবাবু ঘরে ঢুকে তাঁর চেয়ারে বসলেন। ঘরে জুয়াড়ীদের দেখে তাঁর মেজাজ গরম। 'কে? কে এদের ধরে এনেছে? আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি কেন? জানো না যে নরম্যাল ওয়ার্ক সাসপেণ্ডেড। শুধু কংগ্রেসী ও পিকেটারদের ধরার হুকুম। তারপর উনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ওদের গালি দিতে শুরু করলেন। অশ্রাব্য গালির পর কিছু শ্রাব্য গালি শুরু হল। তার মুখ থেকে সেকেণ্ডে প্রায় কুড়িটি গালি বেরোয়। যেন অটোমোটিক পিস্তলের বুলেট। যেমন, তেরী নানিকো ভেড়ী, উল্লুক' কো পাঁঠা। এই দুটি গালাগালি সাহিত্যে ওর নিজস্ব সংযোজনা,—ফলে সব গালাগালি ফুরিয়ে গেল। তখন একটু দম নিয়ে বিচিত্র সব শব্দ মুখ হতে বার করতে লাগলেন। 'ম্যাডাগাস্কার, ক্যামাসকাটা, হলুলুলু ইত্যাদি। হঠাৎ একজন ইংরেজ মেমসাহেব ঐ ঘরে ঢুকলেন সেই বাক্য তোড়ের মুখে। তাঁর অভিযোগ এই-যে দোকানী তাকে কিছু পচা আঙুর বিক্রি করেছে।

ব্রেক কষলে গাড়ি থামে। কিন্তু গালাগালি থামানো সহজ নয়। গালি আপন বেগে পাগল পারা। অতএব কমপক্ষে দশটি গালি বর্ষিত হ'ল সেই মহিলার উদ্দেশ্যেও। ভাষা সঠিক অনুধাবন করতে না পারলেও ওটা যে গালি তা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হ'ল না। মহিলার সাদামুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো। এযে রীতিমত অপমান! তিনি তৎক্ষণাৎ ফোনে ইংরেজ-ডেপুটিকে কিছু বলতে চাইলেন। ইনচার্জ বাবু প্রমাদ বুঝে সুর পালটে ফেললেন। তিনি বিনীত ভঙ্গিতে ওঁকে বুঝিয়ে বললেন যে সব কাজ তো এক সংগে করা যায় না। তাই শ্রবনেন্দ্রিয় সজাগ রেখে ওর কথা তিনি ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু বাক-সংযম করা যায়নি বলে দুঃখিত। প্রকৃতপক্ষে মেমসাহেব মানে বড়ো বলে মুখ ছিল তাঁর দিকে, কিন্তু মুখের বাক্যরাশি নির্গত হয়েছে ওই নেটিভ গুলোর উদ্দেশে। মাননীয়া মহিলা এই কৈফিয়তে খুশি হয়ে ইনচার্জ বাবুর দেওয়া লেমনেড পান করে ফিরে গেলেন।

আমি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁর এই কাণ্ড কারখানা দেখছিলাম। আমার আর বাক্যস্ফুরণ হতে চায় না। এখান হতে সরে পড়াও সম্ভব নয়। অতএব নির্বাক ভাবে বসেছিলাম। এবার তাঁর দৃষ্টি পড়লো আমার ওপর। ঘাড় কাত করে তিনি আমাকে দেখলেন, এবং যথারীতি কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বিকট গর্জন করে জিজ্ঞেস করলেন,

'কে মশাই আপনি ? এখানে কি চান ? কি জন্যে এসেছেন ? নির্দোষ স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা, কিন্তু কণ্ঠস্বর এত চড়া আর উচ্চারণের ভঙ্গি এত কর্কশ যে চমকে যেতে হয়।

আমার আগমণের উদ্দেশ্যে বলার পূর্বেই উপরের কোয়ার্টার থেকে একটি বালক নেমে এসে অফিস-ঘরে ঢুকলো। তিনি, তখন চেঁচিয়ে এক অফিসারকে বললেন 'রমেশ ! এখানে আমরা মুখোমুখি করছি। বাচ্চাদের অফিস ঘরে ঢুকতে দাও কেন ? ওরা গোল্লায় যাবে যে ! এখন ওকে ওপরে যেতে বলো'। আমার পরিচয় শুনে এবার তিনি সমাদরে নিজের কাছের একটা চেয়ারে আমাকে ডাকলেন, বললেন ঃ 'আসুন মশাই, এখানে বসুন, আজই গেজেটে আপনার নাম দেখেছি' তিনি ফের বললেন। ডেপুটি সাহেব ফোনে আমাকে সব বলেছেন। আমার কোয়ার্টারের পাশেই আপনার কোয়ার্টার। ওটা সুইপার দিয়ে পরিস্কার করানো হয়েছে। একটা কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড কুক বা চাকর রাখবেন, ফ্যামিলি থাকলে, ওদের এখন এখানে না-আনাই ভালো। এই কদিন থানা বড়ো গরম, কংগ্রেসীদের পিকেটিং সম্প্রতি বেড়েছে। ডেপুটিদের মাথা তাতে দারুন গরম। আপনাকে এই পিকেটিং-করা লোকদের ধরার ডিউটি দেওয়া হয়েছে। আপনি এবার থানার জেনরেল ডায়েরিতে লিখুন ঃ 'জয়েণ্ট দি থানা। মে গড্ হেল্প মী। আজকের দিনটা বিশ্রাম করুন। কাল সকাল ছটার সময় থানায় নামবেন'।

'তার নির্দেশ মতো কোয়ার্টারের উপরে উঠে বারান্দায় দাঁড়ালাম। হঠাৎ নিচের অফিসে একটা সোরগোল হলো। বড়সাহেব, বড়সাহেব বড়সাহেব এসেছেন, গরুর পালে যেন বাঘ পড়লো। পরক্ষণেই নিচের অফিসে দারুন চেঁচামেচি ও টেবিল ঠোকাঠুকি। বড়সাহেব থানা ইনস্পেকসনে এসে কিছু ভুল ধরেছেন। একটা ছোট ছেলে উপর থেকে নিচে নেমেছিল। সে একবার থানার অফিসঘরে উঁকি দিয়েই দৌড়ে উপরে উঠে মা-কে বললে 'মা' একজন সাহেব এসে বাবাকে বকছে, আমি কৌতুহলী হয়ে বড়ো-সাহেব জীবটিকে দেখতে নিচে নামছিলাম। হঠাৎ দেখি এক অফিসার নিচে হতে দৌড়ে ওপরে উঠছেন। বড়সাহেব থানাতে ঢুকবার আগেই তিনি একজনের মুখে খবর পেয়েছিলেন, বড়সাহেব একটি থানা পরিদর্শন সেরে বার হওয়া মাত্র সেখান হতে ফোনে একজন ওকে খবর দেয় যে ওই থানায় একজন কর্মীকে কাজে গাফিলতির জন্য সাসপেণ্ড করা হয়েছে। ওদের খবর এই যে তার গাড়ি এই দিকে ঘুরেছে, তার মানে এখানেও ওই রকম কিছু ঘটতে পারে। এই আশংকায় এই অফিসারটি জেনারেল ডায়েরিতে সিক রিপোর্ট লিখে উপরে উঠছিলেন, তাঁর কাগজ-পত্র ঠিকমতো তৈরি হয়নি, আমাকে নীচে নামতে দেখে পথরোধ করে বললেন 'মশাই এখন নীচে নামবেন না, ওর সামনে পড়লে পানিসমেণ্ট অবধারিত (কলকাতা পুলিসের অ্যাসিসটেণ্ট কমিশনারকে বড়সাহেব, এবং তাদেয় উর্ধতম ডেপুটি কমিশনারকে ডেপুটি সাহেব বলার রীতি। ওই যুগে বড় সাহেবদের চোখ দিয়েই উপরওয়ালারা অধীনস্থ অফিসারদের বিচার করতেন। ইংরাজ ডেপুটিরা এই দেশীয় অফিসারটির উপর

নানা বিষয়ে নির্ভরশীল। নিয়মানুবর্তিতার নামে ওদের তদারকি ওখানে কড়া ধরনের হতো। আত্মরক্ষার জন্য দিবারাত্র ব্যস্ত থাকতে হ'ত বলে ঐ যুগে অধীন কর্মীদের পক্ষে উৎপীড়ক হওয়ার বা উৎকোচ গ্রহণের সময় বা সুযোগ কম ছিল। তবে এই পরিদর্শন প্রায়ই গঠনমূলক না হয়ে ধ্বংসাত্মক হ'ত।

ক্ষমা নামক বাক্যটি এখানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ডেপুটি সাহেবদের ক্ষমতা তখন বড়োসাহেবরা নির্বিচারে প্রয়োগ করতেন। তবে সেইসব ক্ষেত্রে কিছু ভুলচুক বা গাফলতি থাকা চাই। নইলে উর্ধতনরা নিম্নপদিদের আনা অভিযোগেরও বিচারে বসবেন।)

[বিঃ দ্রঃ প্রথম জীবনে এই সব অসুবিধা পদ্ধতি ও প্রকরণ আমার স্মরণ ছিল। আমরা ক্ষমতায় আসীন হলে এগুলি সম্পর্কে সচেতন হই। অধীনকর্মীদের ভুল শুধরে দিতে সাহায্য করতাম। তাঁদের সকলের প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সৌজন্য বোধ ফিরিয়ে আনি ও আচরণবিধি সৌষ্ঠবপূর্ণ করে তুলি। তাঁদের পারিবারিক বিষয়েও আমরা সাহায্য করেছি। পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তি ও অসুবিধা থাকলে সরকারী কাজে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব। তাঁরা অসংকোচে অসুবিধার কথা আমাদের জানাতো, এবং আমরা অদের পরামর্শ দিতাম। ফলে পুলিশী কাজে সহযোগিতা ও দক্ষতা অনেক বেড়ে যায়]

সকালবেলা য়ুনিফর্ম পরে অন্যদের মতো নিচে নামলাম। অফিসঘরে জনগণের ভিড় আরও বেশি দেখলাম। একই রকম ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি মাত্র। ওদিকে আইন-অমান্য আন্দোলন আরও বেড়েছে। থানার উল্টোদিকে সদ্য গড়ে-ওঠা একটি নতুন থানা দেখা গেল। কংগ্রেসীরা ঘর-ভাড়া করে সেখানে পাল্টা থানা করেছেন। পাবলিক প্রসিকিউটর তারক সাধুর মতামত তখনও আসেনি বলে তখনও ওটা ভেঙে দেওয়া হয় নি।

এক অ্যাংলো অফিসার হঠাৎ চেঁচিয়ে জনৈক অভিযোগকারী ব্যক্তিকে বললেন "যাও ওহী গান্ধী মহারাজকো থানামে যাও'। অভিযোগকারী ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে দশ হাজার টাকার গহনা চুরি গেছে। একজন বাঙালী-অফিসারও বিনয়ের সঙ্গে ওঁকে নতুন স্থাপিত কংগ্রেসী থানা দেখিয়ে দিলেন। মেদিনীপুর ছাড়া অন্যত্র কংগ্রেসী থানা সফল হয় নি। পরে ফরিয়াদীর অভাবে ঐসব থানা আপনা হতে উঠে যায়। অন্য এক দারোগাবাবু ভদ্রলোককে দারোয়ান রাখার উপদেশ দিলেন। ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'আচ্ছা উনি দারোয়ান রাখার পরও যদি চুরি হয়'?

তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তাহলে আমরা তাকে দারোয়ানের সংখ্যা বাড়াতে বলবো'।

সকলেই তখন ইংরেজ প্রভুদের সাম্রাজ্য সামলাতে ব্যস্ত। সাধারণ চুরি-ডাকাতি তদন্তের ব্যাপারে তাঁদের সময় কই। কোন্ ফাণ্ড হতে জানি না, বাড়তি-কাজের জন্য অফিসারদের ওভার-টাইমও দেওয়া হচ্ছে। পদ-নির্বিশেষে প্রত্যেক কর্মী তখন

অত্যন্ত ক্লান্ত। ফলে অতি পরিশ্রমে অনেকেই অসুস্থ। আন্দোলন আরও বেশি দিন চললে ওদের মনোবল ভাঙতো। এজন্য কর্তৃপক্ষ অফিসারদের রীতিমত আস্কারা দিচ্ছেন। পূর্বে গাফিলতি ঘটলে তারা বরখাস্ত হতেন। এই সময় অসাধুতা চুরি, ডাকাতি, জুয়া ও কোকেন ব্যবসা বেড়ে যায়।

সন্ধ্যাকালে বড়ো সাহেব যথারীতি থানা পরিদর্শনে এলেন। প্রত্যেক কয়েদীকে তার সম্মুখে হাজির করা হলো। বন্দীদের কারো বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে তিনি তা শুনতেন। অন্য থানাতেও তিনি এই রকম সান্ধ্য-পরিদর্শন করেন। এক থানার সংবাদ শুনে তিনি অন্য থানাকে ওয়াকিবহাল করেন। এভাবে এক থানার অপরাধী অন্য থানাতে ধরা পড়লে তিনি তাকে চিনে নিতেন।

আমার সংগে তাঁর ব্যবহার খুবই ভালো। কথা প্রসঙ্গে জানালেন যে তিনি আমার জ্যেষ্ঠতাতের অধীনে কিছুকাল কাজ করেছিলেন। এখন আমার আপদমস্তক নিরীক্ষণ করে বুঝলেন যে জ্যেষ্ঠতাতের মতোই আমি বলবান ও দীর্ঘদেহী। আমাকে তাঁর পছন্দ হওয়ায় তিনি খুসি হয়ে বললেন 'তোমাকে দিয়ে আমি উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করে এই এলাকার নোংরা-আবর্জনা দূর করবো। তোমার জ্যেষ্ঠতাতর মতো তুমি সন্দেহাতীত অনেষ্ট হবে আশা করি। বড়বাজারে প্রথম ও জোড়াসাঁকোতে দ্বিতীয়বার পোস্টেড হলে জীবনে উন্নতি হয়। তোমাকে এরপর জোড়াসাঁকোতে সত্যেনের কাছে পাঠাবো। এই দুই থানায় টিকে গেলে উন্নতি অনিবার্য। তিনি ইনচার্জবাবুকে সযত্নে আমাকে কাজ শেখাতে বলে আমাকে কংগ্রেসের পিকেটার ধরার ডিউটি দিলেন।

[নবীন অফিসারদের কাজ শেখানো ইনচার্জ অফিসারদের পবিত্র দায়িত্ব, ইনচার্জ অফিসাররা তদন্তে বেরুবার সময় নবীনদের সঙ্গে নিতেন, এবং ডিকটেকটেড করে ডায়েরি লেখাতেন, খুউব বাছা ও দুঁদে ব্যক্তিকে থানা-ইনচার্জ করা হত। নবীনদের উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে অক্ষম হলে ইনচার্জদের কৈফিয়ৎ তলব করা হ'ত।]

পুরানো যুগ সদ্য বিদায়ের পর নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। তাঁর প্রতীকস্বরূপ প্রবেশ পথে হেডজমাদারের পুরু তক্তোপোষ ও তার উপরের গদী এখনও দেখা যায়। গদীর উপর একটি নিচু ডেসকে নথী রেখে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ওরা গড় গড়ায় মুখ রেখে বসতেন। এরকম ব্যবস্থা থানার অফিসঘরে অফিসারদের জন্যও ছিল। ছোট জল চৌকির উপর নথী রেখে ভূষিকালি ও সরের কলমে তক্তপোষে আসন পিঁড় হয়ে বসে লেখালেখির কাজ হ'ত। এখন সেখানে কেদারা ও মেজ অর্থাৎ টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা। সাম্প্রতিককালে এই সব লেখালেখি বাংলার বদলে ইংরেজিতে হয়।

তখনকার থানার কাজে বহু দেশজ শব্দের ব্যবহার ছিল। যেমন পেটি অর্থাৎ বেলট, উর্দি, তদন্ত, দারোগা, কৈফিয়ৎ, গাফিলতি সরেজমীন তদন্ত, খানা-তল্লাস, দায়রা আদালত, টুলি অর্থাৎ ট্রুপ, সেরাস্তা, হাজতঘর, মেয়াদ লালকেতাব অর্থাৎ স্টাটিসটিকস্, হাতকড়ি, মুন্সিবাবু, ময়না-তদন্ত অর্থাৎ পোস্ট মর্টম, চেরাইঘর অর্থাৎ মর্গ, হুকুমৎ সোপর্দকরণ, গ্রেপ্তার, অকুস্থল প্রভৃতি এমনকি ইংরাজি শব্দগুলিকেও সিপাই জমাদাররা

নিজস্ব ভাষায় আত্মসাৎ করেছে। যেমন, পেনসন অর্থাৎ 'পিনসিন', বোঁদ অর্থাৎ রাউন্ড সাসপিন, দলীল অর্থাৎ ড্রিল ইত্যাদি। প্রতিটি থানা অঙ্গনে ওরা একটি বটগাছ, শিবলিঙ্গ কুস্তির আখড়া তুলবেই এ বিষয়ে ওদের রুখবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের কারোরই ছিল না।

পূর্বে কোকেন ও জুয়ার ডেন হতে টাকা তুলে বিচিত্র ভাগে শেয়ার ভাগ হত। যেমন, লায়ন শেয়ার, টাইগার শেয়ার, লেপাড শেয়ার, জ্যাকেল শেয়ার, ও তারপর ক্রমানুসারে, ক্যাট, র‍্যাট, ব্যাট শেয়ার।

লায়ন অর্থাৎ সিংহভাগ বড়সাহেবের, টাইগার নির্দিষ্ট অর্থে ছোটসাহেবের লেপার্ড অর্থে বড়বাবু, এবং তারপর যথাক্রমে মেজ, সেজ, ছোট, ও মুন্সি বাবুর মধ্যে বাকি শেয়ারগুলি ভাগ হত। আমি ছোটবাবু অর্থাৎ মর্যাদার দিক থেকে ব্যাট, যদিও কোনদিনই, আমি ওদের তালিকাভুক্ত হইনি। রাত্রে রোঁদে বেরিয়ে কোকেন ড্রেন পরিদর্শন করে সকলেই প্রাপ্য গ্রহণ করতেন। ছোটবড় পদমর্যাদা অনুযায়ী কুড়ি দশ, পাঁচ বরাদ্দ হিসাবে। কারো, কারো কাছে জুয়াড়ীরা শীল-করা খামে প্রাপ্য, পাঠিয়ে দিতো। সিপাহী জমাদাররা উৎকোচগ্রাহীকর্মীদের বলতো খানেওয়ালা বাবু।

কংগ্রেসী আন্দোলনে উর্ধতনরা ব্যস্ত থাকার ফলে তদারকী ব্যবস্থা অব্যাহত থাকেনি। এজন্য কিছু কর্মীর অধঃপতিত হওয়ার ঘটনা মধ্যে মধ্যে ঘটতো! রাজনৈতিক আন্দোলন দমনে পুলিশ-কর্মীদের আস্কারা দিতে হবেই সেই ক্ষেত্রে এরকম অবস্থা হয়ে থাকে। এজন্য বহুদেশে সাধারণ পুলিশকে রাজনৈতিক আন্দোলন-দমনে নিযুক্ত করার রীতি নেই।

কিছু পুলিশ-কর্মী এই সুযোগে প্রলোভন ইত্যাদির শিকার হন বটে, কিন্তু অন্য দিকে ওরাই আবার বহু প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী ছিলেন। চোর ও গুন্ডাদের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয়, কিন্তু ভদ্র গৃহস্থদের সেবায় তারা কখনও কপর্দকও উৎকোচ গ্রহণ করেন নি। বরং দরিদ্র ও অনাহারী ব্যক্তিদের কিছু কিছু দানধ্যান করেছেন। জুয়া ও কোকেন ব্যবসাক্ষেত্র হতে ও'রা কেউ-কেউ অর্থের ভাগ নিতেন, দুবৃত্তদের এই সব স্থানে আনা গোনা থাকায় তাদের জানতেন ও চিনতেন, এজন্য ও'রা অপহৃত দ্রব্যাদি দ্রুত উদ্ধার করে অপরাধের কিনারা করতে সক্ষম ছিলেন। অবশ্য কোকেন জুয়া ও সরাবের জন্য পরোক্ষভাবে অপরাধও বাড়তো, গৃহস্থেরা ক্ষতিগ্রস্ত হত।

[ওদের বৃহৎ গুন এই-যে ও'রা নারীদের সম্মান করতেন ও শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। হারানো শিশুরা সপ্তাহ-ভর থানায় থেকেছে, তাদের খেলনা, আহার ওরা কিনে দিতেন। খোঁজাখুঁজি করে ওদের অভিভাবকদের ডাকা হতো। হারানো শিশুদের সংবাদ প্রতিটি থানায় জানানো হত। প্রতিদিন জমাদার ঐ শিশুদের সঙ্গে বেরিয়ে তাদের বাড়ীর হদীশ নিতো।

কিন্তু টেগার্ট সাহেবের সরেজমীন দৌরাত্মে এইভাবে ওদের উপরি রোজগার এখন প্রায় বন্ধ। আমার জ্যেষ্ঠতাত ও অন্যেরা এবিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

একবার বড়দিনে ধুনুরি এনেপেজানো তুলো ধুনে সিল্কের ওয়াড় দিয়ে লেপ তৈরি করে অফিসাররা অন্য দ্রব্যাদি সহ মিছিল করে জনৈক ইংরাজ ডেপুটিকে উপহার দিলেন। চার্লস টেগার্ট অল্প সময়ের মধ্যে তা জেনে টেলিফোনে সেই ডেপুটিকে দূরস্থানে বদলি করেছিলেন। কোনও এক নিম্নপদস্থ কর্মী জুয়াড়ীদের ধমকে বলেছিলেন 'কাহে নেহি কাম চলতা? লেও রুপেয়া। চালাও। ভদ্রলোকের এই ভাবে দাদন দিয়ে এলাকার মধ্যে জুয়ার আড্ডা বসানোর সংবাদ তাঁর কাছে পেঁছাতে বেশি দেরি হয়নি। তিনি মাত্র সন্দেহের বশবর্তী হওয়ায় তাঁকে ওজন্যে কর্মচ্যুত করেছিলেন।

এই পাপ কর্মগুলি শহর হতে উচ্ছেদ করতে প্রভাত মুখার্জী, সত্যেন মুখার্জি সহ আমাকে ও অন্য একজনকে, নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমরা সবাই মিলিত প্রচেষ্টায় ওই কর্মগুলি এলাকা হতে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করেছিলাম। তার পরোক্ষ প্রভাবে শহর হতে অপরাধের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যায়। আমার বৃহৎ প্রতিবেদনের পর সরকার ডেঞ্জারাস ড্রাগ এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করেন। কোকেনের প্রত্যক্ষ কুফল সম্বন্ধে ওই প্রতিবেদনটি ছিল আমার একটি উল্লেখযোগ্য থিসিস]

থানার বড়োবাবু আমাকে অনেক কিছু বললেন ও শোনালেন। তিনি একটি পুলিশী প্রবাদ উল্লেখ করে বলেছিলেন 'কাক কখনও কাকের মাংস খায় না, থানার ভিতরের খবর যেন বাইরে না যায়। এখানে দেওয়ালেরও কান আছে। অতএব চোখ আর কান খোলা রাখবে কিন্তু মুখ বন্ধ রাখবে সর্বদা। মুরুব্বীর জোর যতোই থাকুক ফর্জেণ্টর আশ্রয় কদাচ নয়। এখানে ক্ষমা নামক কোনো বস্তু নেই। বাগে পেলে এখানে কেউ কাউকে ছাড়ে না।

থিওরিটিক্যাল শিক্ষা আমার শেষ হ'ল। এবার ফিল্ড ওয়ার্ক-এ যেতে হবে। বড়োবাবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন। চিৎপুর রোড ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। রাস্তার দু'ধারে ঠোটে-রঙ গালে খড়ি পরনে সস্তা জাপানী সিল্কের শাড়ি শীর্ণকায়া হত ভাগিনীরা অপেক্ষারতা। এ অঞ্চলে আমি আগে কখনও আসিনি। বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম 'এরা কারা'? বড়বাবু আমার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন। উনি এবং পাল্টা প্রশ্ন করলেন এই যে, আমার বয়স কতো এবং আমি কতদিন এই শহরে আছি। আমি উত্তর দেবার আগেই একজায়গায় একটা ভিড় দেখে তিনি ঠেঙাতে শুরু করলেন। শুনলাম ওরা টপ্‌কা ঠগীর দল। শিকারের জন্য ওখানে অপেক্ষা করছিল। আমাদের সাথী হাফ-উর্দি সিপাহীর দল ওদের কজনকে ধরে বেঁধে ফেললো।

বড়বাবু এবার আমাকে বুঝিয়ে বললেন 'ঠেঙাতে মায়া করবেন না। নচেৎ এলাকায় ক্রাইমের সংখ্যা বাড়বে। তাতে উর্ধতনদের কৈফিয়ত দিতে হয়। তবে লোক চিনে ও বুঝে ওসব করতে হয়। স্যুট পরা ঠগীও কিছু, কিছু থানায় আসে। আগন্তুক বড়ো অফিসার নাকি মামুলি ব্যক্তি, ইনসিওরেন্সের এজেন্ট নাকি সে এক প্রতারক তা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে বোঝা চাই। প্রয়োজনে ঝুড়ি, ঝুড়ি মিথ্যা কথা

বলবে। ওটা হচ্ছে একধরনের ট্যাক্‌ট অর্থাৎ কায়দা। ওর মধ্য হতে এক ঝুড়ি সংগ্রহ করে রাখবে কোয়ার্টারে স্ত্রীর নিকট সাপ্লাইয়ের জন্য। আমি বিধিবদ্ধ আইনের প্রশ্ন তুললে উনি তার বাখ্যা করে বলেছিলেন : 'ল' আর মেনি বাট্‌ কিউ আর ফলোড। অনেষ্টি অফ পরাপাস্‌ থাকলেই হ'ল। 'ল'-এর ওয়াডিঙ না নিয়ে ওর স্পিরিটটা শুধু নেবে। মামলা সত্য বোঝার পর সাক্ষীর অভাবে যেন মুক্তি না পায়। মোড়ে মোড়ে পানওয়ালা, ভূজাওয়ালা, ও বস্তীর বাড়িওয়ালা আছে। প্রয়োজন মত ওদের সাহায্য নেবে। উন্নাসিক ভদ্রলোকেরা কোনও সাহায্যেই আসে না। এক-পা থানায় আর অন্য পা জেলখানায় রেখে আমরা কাজ করি। এসব তত্ত্বকথায় আমি মুষড়ে পড়েছিলাম। বড়বাবু তা বুঝে আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, ডোণ্ট ওরি বয়, তুমি ঠিক টিকে যাবে।

রাস্তার ওপরে রঙমাখা নারীরা পুলিশ দেখে ঘোড়দৌড় শুরু করে দিলো। কেউ আছড়ে ফুটপাতে পড়লো, উঠে আবার সে দৌড়ায়। পুলিশ তাদের জাপটে ধরে একজায়গায় জড়ো করে। একজন ঘরের তক্তপোষের নীচে লুকিয়ে ছিল। তাকে পাঁজা কোলা করে বাইরে আনা হ'ল। চোখের জল ওদের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

কিন্তু মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই। হতভাগিনীরা দরিদ্রতম রূপোয়াজীবিনীর দল। অভিজাত বেশ্যা-রমণীদের মত এদের বাঁধা উকীল নেই। এরা খরিদ্দারের অপেক্ষায় রাস্তার ধারে দাঁড়ায়। তাই রাস্তাবন্দীর অপরাধে অপরাধিণী। মোক্তার ও দালাল এলে ওদের জামিন হবে। কোর্টে গিয়ে পর দিন এরা জরিমানা দেবে। দৈনিক উপার্জনের দশগুণ গুণাগার। ফলে তাদের উপর্যুপরি কয়েকদিন অনাহার। বাড়িউলির কাছে তাদের দেহগুলি শুধু বন্দক থাকবে। সেই দেনা বহুকালেও পরিশোধ হবে না। ওদের হাড়-জিরজির দেহ। হাত দিলে ব্যাথা লাগে। এই-সব পেটিকেস হতে সরকারের বড়ো রকম আয়। থানার স্ট্যাটিস্‌টিক্স ঠিক রাখতে হলে এর প্রয়োজন। মামলার সংখ্যা কমলে কর্তৃপক্ষের নিকট বড়োবাবুকে কৈফিয়ত দিতে হবে।

আমি এই কুলটা নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ি। শীতের রাতে ওদের পরনে পাতলা শাড়ি, আর পুলিশ মোটা বনাতের ওভারকোট পরে ওদের ধরছে। শীতে এবং ভয়ে ওরা কাঁপছে। রাত দশটা পর্যন্ত রাস্তায় দাড়িয়ে দুটাকাও উপার্জন হয় না। পুলিশের হল্লার ভয়ে ওদের প্রধান খরিদ্দার মুটে—মজুরেরা ও-পথ মাড়ায় না। থানার পশুক্লেশ নিবারণী অর্থাৎ ঘা-ওয়লা পুলিশের [সি. এস. পি. সি, এ] আমি দেখেছি। গবাদি পশুদের জন্য একশ্রেণীর লোক চিন্তা করে। কিন্তু এই পশুদের প্রতি সকলের শুধু ঘৃণা ও অবজ্ঞা। এদের পুর্ণবাসনের বা আশ্রয়ের চিন্তা কারোরই নেই। আমার মনোভাব ও বিষন্নতা বড়োবাবুর নজর এড়ায়নি। তিনি অলপক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর একটু ইতস্তত করে জমাদারকে বললেন। 'এই ছোটবাবু বহুৎ ঘাবড়া গিয়া'। আজ উনলোককো ছোড় দেনে

বোলো। ছাড়া পেয়ে চটি জুতোর পটপট শব্দ করে ওরা দৌড়ে যে যার ঘরে ঢুকলো। ওদের ছেড়ে দিতে পেরে সিপাইহীরাও খুশি। পরে, চেষ্টা করেও আমি এই প্রথা উচ্ছেদ করতে পারিনি।

প্রতিদিন থানায় দলে-দলে ফুটপাত অবরোধ কারী সবজীওয়ালা, ফলওয়ালা, ফুচকাওয়ালা, ভুজাওয়ালা, প্রভৃতিকে সিপাহীরা ধরে এনে হপ্তা পূর্তি করে। ঝুড়ি ও চুবড়িতে থানার মেঝেগুলি ভর্তি। পচনশীল দ্রব্য বিধায় ওগুলো থানাতেই নিলাম হবে। উচিত-মূল্যের সিকিভাগও ওঠার সম্ভাবনা নেই। ওগুলি সবই আইনমত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। আদালতে 'হা' বলবার আগেই ওদের জরিমানা হয়ে যায়। আসামী মাথুরাম, বাবাকো নাম নাথুরাম, রাস্তামে ফল বিক্রি কিয়া? নেহি হুজুর। দো রুপেয়া। কোথাও কমা পূর্ণচ্ছেদ নেই। এক বাক্যে ও নিশ্বাসে বিচার শেষ। বেশি কথা কইলে জরিমানার বহর বাড়ে। মামলা কনটেস্ট করলে পড়তা পোষায় না। তাই সকলে দোষ কবুল করে ঝঞ্ঝাট এড়ায়। এটা ওদের কাছে ফুটপাত ভাড়ার মতো।

আমি বড়োবাবুকে এই বিষয়ে কিছু বলেছিলাম। ফুটে বসার আগেই তো ওদের সরানো যায়। ভোরবেলা লোক পাঠিয়ে তাড়ানো হয় না কেন? এতদিনে তাহলে ওরা বিকল্প জীবিকার সন্ধান করতো এবং তা পেয়ে যেত। এখন অযথা পুনর্বাসনের প্রশ্ন উঠবে। পথ অবরোধ বন্ধ করার এখন একটি মাত্র উপায়। ক্রেতাদের ধরে থানায় আনা। তাহলে ক্রেতার অভাবে ওরা এমনি অন্যত্র চলে যাবে।

বড়বাবু একটু ভেবে আমাকে তত্ত্বকথা ভুলে যাবার জ্ঞান দিলেন। তিনি, আরও বললেন যে আমি ওয়েলার্স হর্স। কিন্তু এখনও যথাযথ ভাবে ব্রেক পাইনি। আমি অবাক হয়ে ভাবি যে ফুটপাতে বসতে দেবো. অথচ তারপর ধরবো। মদ যথেচ্ছ বিক্রি করবো। অথচ মাতাল হলে তাকে ধরবো। এ, কেমন রীতি। বড়বাবুর মতে ওগুলো সরকারের দ্বিমুখী আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা মাত্র।

[ক্ষমতায় আসার পর আমার এলাকায় মুচী ও নাপিত গ্রেপ্তার বন্ধ করি। পরে কর্তৃপক্ষ আমার প্রতিবেদনের যুক্তি মেনে ওদের প্রয়োজনীয়তা বুঝে ওদের পথ অবরোধের আওতা থেকে মুক্তি দেন। এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সকাশে আমি একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন পাঠিয়ে ছিলাম]

হঠাৎ আমার থানার কাজ শেখা বন্ধ হ'ল। আমাকে পিকেটিঙ ডিউটিতে না দেওয়ায় কর্তৃপক্ষ রুষ্ট। শুনলাম। আই অ্যাম আনডার অয়াচ। পরদিন হতে সদামুখ ও মনোহর দাস কাটরা অঞ্চলদ্বয়ে আমার ডিউটি পড়লো, এই কার্য আমি নিজস্ব পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবেই সমাধান করেছিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

[বিঃ দ্রঃ—বড়বাজারে মহিলা ও বালক-পিকেটারদের সংখ্যাই বেশি। এ্যাংলো সারজেণ্টদের বিরুদ্ধে অশালীনতার কিছু অভিযোগ আসে। এজন্য একজন সচ্চরিত্র ও ভদ্রকর্মীকে এই কাজে নিযুক্ত করার হুকুম আসে। কিন্তু এজন্য আমাকে কেন বাছা হ'ল তা বুঝলাম না। আমি নিজে যা-দেখেছি ও করেছি এবং যা-শুনেছি তা-ই মাত্র এখানে উল্লেখ করবো। কলকাতা সহ বাংলার অন্যত্রও এরকম ঘটনাই ঘটে থাকবে। এ হতে আইন-আমান্য আন্দোলনের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যাবে। বড়বাজার তখন ভারতের সর্বপ্রধান বস্ত্র-ব্যবসার কেন্দ্র। এখানকার প্রতিটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া সমগ্র ভারতে পড়তে বাধ্য। বোম্বে, আমেদাবাদ, প্রভৃতি দেশীয় বস্ত্র মিলগুলি এখনও যথেষ্ট জোরদার নয়। বিলাতী বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় তারা টিঁকে থাকতে চায়। তাই বড়বাজারের আন্দোলনে তারা কেউ-কেউ যথেষ্ট টাকা দিতো। মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এই আন্দোলন দেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু বড়বাজারে অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত। তবু ব্যবসায়ীরা মজুত-মাল নষ্ট হতে দেবে না। ওদিকে ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থে ব্রিটিশ-শাসকরা উদগ্রীব। তাই মূল সংঘাত বড়বাজারের বিপনন কেন্দ্রগুলিতে বেশি হয়।

আইন অমান্য

এইদিন থানায় বহু কংগ্রেসী পিকেটার বালকদের ধরে আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেরই বয়স দশ-বার মাত্র। উচু লরীতে তারা নিজেরা উঠতে পারে না। দু'হাতে এক-একজনকে তুলে লরীর ভিতর ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছিল। ভিতরের পাটাতনে পড়ে ওরা যন্ত্রণাদায়ক কোঁক-কোঁক আওয়াজ করছিল। লরী ভর্তি হলে ওদের কোনও দূরস্থানে ছেড়ে দেওয়া হবে। কারণ জেলখানায় আর তিল ধরানোর জায়গা নেই। গন্তব্যস্থানে নিয়ে গিয়ে এমনি করে আবার পথের ওপর ছুঁড়ে ফেলা হবে। আমি এতটা সহ্য করতে না-পারায় একজন সার্জেণ্ট তো চেঁচিয়েই বলল, 'দেন জয়েন দি আদার ক্যাম্প'। বড়বাবু আমাদের উভয়কে শান্ত করে, আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, 'মাথা গরম কোরোনা। সাহেবদের কানে উঠবে। গোপন নথীতে সিমপ্যাথেটিক বলে দাগ পড়েব।

থানা-বাড়িতে একদিকে কংগ্রেসী পিকেটার ও অন্যদিকে সাধারণ আসামী। খোঁয়াড়ের হাস-মুর্গি'র মতো ঠাসাঠাসি করে সকলে মেঝের উপর বসে। সাধারণ আসামীরা দলে-দলে জামীনে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কংগ্রেসী পিকেটারদের কেউ

জামিনে মুক্তি চায় না। তাঁরা জেলগুলি ভর্তি করতেই এসেছেন। তাদের স্থান সংকুলানের জন্য চোর ও বদমায়েসদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। জেলে পাঠানোর আগে পঞ্চাশ-ষাটজন পিকেটারদের সকলেরই বিবৃতি লিখতে হবে। কিন্তু কাজটি অন্যক্ষেত্রে দুরূহ হলেও, এদের বেলায় খুবই সহজ। ওঁরা নিজেদের নামটি শুধু বলবেন, পিতার নাম ও ঠিকানা উহ্য থাকে। অতএব শুধু একটি করে ইংরাজি ছত্র লিখলেই কাজ শেষ। নীচে মন্তব্য ঃ 'দে রিফিউজড্ টু মেক্ স্টেটমেণ্টস্'। অর্থাৎ এঁরা কেউ বিবৃতি দিতে রাজী নন। পঞ্চাশ-ষাটটি নাম লিখে মাত্র দুটি পাতায় আমাদের ডায়েরি লেখা শেষ হ'ল।

এই দিনের ঐ ঘটনাতে সার্জেণ্ট সাহেব কিন্তু আমার নামে রিপোর্ট করেছিলেন। ইংরাজ ডেপুটি কমিশনার আমাদের উভয়কে ডেকে পাঠালেন, এবং বললেন,' ডোণ্ট কোয়ার্লস এ্যামঙ্গ ইয়োরসেল্ফ্। সার্জেণ্ট সাহেব আমার সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড করে বললেন 'ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট'। ট্রামে বাসে আমাদের দুজনের মধ্যে কিছুটা আলাপ হল। উনি তাঁর ইংল্যাণ্ড বাসিনী মায়ের কথা শোনালেন। ভারতে আসার সময় ওঁর মা নাকি দুটি উপদেশ দিয়েছিলেন। উপদেশ দুটি হল ঃ 'কিপ ইওর হেড কভার্ড অ্যাণ্ড ইওর বাওয়েল্স ক্লিনড অর্থাৎ মাথা ঢেকে রাখবে এবং কোষ্ঠ পরিস্কার রাখবে।

সদাসুখ ও মনোহর দাস কটারার বিলাতি বস্ত্রের দোকান গুলিতে পিকেটারদের দৌরাত্ম বেশি। সমগ্র ভারতে এখান থেকেই বিদেশী বস্ত্র সরবরাহ হয়। দোকান গুলিকে অবরুদ্ধ করে রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। তাহলে অন্য-কোথাও বিলাতী বস্ত্র পাঠানো সম্ভব হবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই-যে পিকেটিঙ্গের স্থানে প্রাপ্তবয়স্ক কোন পুরুষ নেই। কেবল নারী, শিশু, বালক ও কিশোর। বহু নারীর ক্রোড়ে শিশু। বয়স্করা ইতিমধ্যে জেলখানা ভর্তি করেছে। মেদিনীপুরের বহু নারী ট্রেন-বোঝাই হয়ে শহরে আসে। বাকিগুলি গুজরাটী নারী আর কলকাতার বাঙালী মহিলা।

ওদের জন্য শহরের মধ্যে বহু হল ও ঘর ভাড়া নেওয়া হ'ত। এগুলোকে বলা হত সিক্রেট ক্যাম্প। এই-সব ক্যাম্পে বালক ও কিশোরদের এনে জমা করা হত। আর এখান থেকেই তারা পিকেটিঙ্গে বেরুতো। ধরা-না পড়লে ফিরে আসতো এই সব জায়গাতেই, এবং পরদিন আবার পিকেটিং। ওদের আহার কারা কারা যোগাতো কেউ তা জানে না। এই সিক্রেট ক্যাম্প আবিস্কার করতে পারলে অফিসাররা ক্যাম্প প্রতি একশ টাকা বকশিস পেতেন।

আমি খবর পেয়ে অন্যদের সঙ্গে ভোররাত্রে একটি সিক্রেট ক্যাম্পে হানা দিয়েছিলাম। একটি হল-ঘরে কজন কিশোর ধরা পড়ার পর আর কাউকে পাইনি। ওদের কিছু বালক হুজুগে মেতে এসেছিল। গৃহ-পলাতক বালকের সংখ্যাও কম নয়। একজন তার বন্ধুকে ফেলে জেলে যেতে চায় নি। সে আমাকে চুপি চুপি ছাদের অন্য এক কক্ষে যেতে বললে। সেখানে গিয়ে আমরা তার বন্ধু-সমেত

আরও আটজন বালককে ধরতে পেরেছিলাম। কিন্তু ওই হল-ঘর কারা ভাড়া করেছে তা বহু চেষ্টা সত্বেও জানতে প্যারি নি।

মহিলারা কিন্তু এভাবে একস্থানে জমায়েত থাকতো না। তাঁরা অন্য কোথা হতে আসতো। বয়স্ক-পুরুষেরা তাদের লরী-ভর্তি করে ভোররাত্রে আনতো এবং সুবিধাজনক স্থানে নামিয়ে দ্রুত গতিতে সরে পড়তো। তাদের কেউ-কেউ, ট্রামে বাসেও আসতো। কিন্তু বাড়ির ঠিকানা তারা কখনও কাউকে দেয় নি।

ওঁরা সকলেই নিরুপদ্রব অসহযোগী ও আইন অমান্যকারী। ওঁদের গ্রেপ্তার করে থানার ঠিকানা বলে দিলেই হ'ল। সঙ্গে করে কাউকে থানায় যাবার প্রয়োজন নেই, ওঁরা নিজেরাই সংশ্লিষ্ট থানায় উপস্থিত হতেন। একদিন এই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটলো। দোকান-মালিকের নিয়োজিত কুলিরা বিলাতীবস্ত্রের গাঁট ঠেলা গাড়িতে তুলছে। একদল হিন্দীভাষী মহিলা তাদের আটকে দিলেন। তাঁরা গ্রেপ্তারও হবেন না। মহিলাদের গায়ে হাত দেবার রীতি নেই। অথচ তাদের গ্রেপ্তার করতে হবেই। দূর হতে অ্যাংলো-সার্জেণ্টরা আমাকে ওয়াচ করছে। কাছেই বাঙালী মহিলাদের একটি দল পিকেটিং করছিলেন। কিছু নাবালিকা এবং শিশুক্রোড়ে মহিলাও আছেন সেই দলে। তাঁদের নেত্রীদের নিকট আমি সাহায্য চাইলাম। গান্ধীজীর নীতির বিষয়েও আমি তাঁদের বোঝালাম।

ওদের নেত্রীদ্বয় মোহিনীদেবী, সুষমাদেবী ও প্রতিভাদেবী এসে ওঁদের কিছুটা বকলেন। ওই সাহায্যকারিণীদেরও আমি পুলিশ ভ্যানে তুললাম। এই মোহিনীদেবী ও সুষমাদেবী ছিলেন ক্যালকাটা কেমিক্যালের এক মালিকের মাতামহী ও মাতা। জনৈকা বৃদ্ধা উচু ভ্যান্ গাড়িতে উঠতে পারছিলেন না দেখে তাঁর সাহায্যোর্থে একটি নিচু টুল এনে দিলাম। একজনের একপাটি শ্লিপার ভ্যান হতে নিচে পড়ে গেল। চুতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে কেউ দেখছে কিনা। তারপর চট করে শ্লিপারটি গাড়িতে তুলে দিলাম।

এই সময় এক উর্ধতন-অফিসার থানা পরিদর্শনে এলেন। জেল থেকে আপত্তি এসেছে সেখানে ছোট শিশু বা কমবয়সী বালক যেন পাঠানো না হয়। এই সাহেব একজন বাঙালী মহিলাকে বললেন 'আপনার খোকার বাবার নাম বলুন। খোকাকে তাঁর কাছে রেখে আসবো' কিন্তু ভদ্রমহিলা স্বামীর নাম বা বাড়ির ঠিকানা বলতে অস্বীকার করলেন, তিনি ওই শিশুপুত্র ক্রোড়েই জেলে যেতে বদ্ধপরিকর। অফিসারটি তখন ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, এই কে আছো, এদিকে এসো। বাচ্চাটাকে ট্রামের তলায় ফেলে দাও। এতে ভদ্রমহিলা শিউরে উঠেও সামলে নিলেন। পরে তিনি অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, ঠিক আছে, তাই হোক। গোলামের সংখ্যা না-ই বাড়লো। একটি বালক তার মাসীর আঁচল কিছুতেই ছাড়বে না। সে কান্না শুরু করে দিলো। মাসীর সঙ্গে সে জেলে যাবে। জনৈক সার্জেণ্ট তার সেই আঁচল চেপে-ধরা হাতে উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত করলো। তবু সে হাত সরালো না। এদিকে জেলখানায় দারুণ স্থানাভাব। অন্যদিকে বালক ও শিশুর দল

জেলে যাবার জন্যে আবদার ও কান্না আরম্ভ করছে। বলা হ'ল যে পরদিন তাদের জেলে পাঠানো হবে। তবু তারা থানা পরিত্যাগ করতে চাইলো না। তখন তাদের রুলের গুঁতো দিয়ে ঠেলে থানা থেকে বার করে দেওয়া হ'ল।

অ্যাংলো-সার্জেণ্টরা ঠেঙাতে ওস্তাদ হলেও ফরিয়াদী হতে নারাজ। পরদিন সারাক্ষণ আদালতে থাকতে হবে। সাক্ষী দিয়ে ফিরতে দেরি হয়ে যায়। তাতে তাদের বলড্যান্স ও ককটেল পার্টি মাটি। বড়োই অসুবিধা। তবে আদালতে অভিযুক্তদের কেউ বড়ো-একটা আত্ম সমর্থন করেন না। সংশ্লিষ্ট যে কোনও পুলিশ কর্মীরা জেরাহীন সাক্ষীতেই তাঁদের ছমাস জেল।

থানায় নাবালক-সাবালক বাছাও মুশকিল হচ্ছিল। সেজন্য মাপকাঠি হিসাবে একটি কচি বাঁশ আড়া আড়ি টাঙানো হ'ল। কারো মাথা তাতে আটকালে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ত। কিন্তু যাদের মাথা ঠেকে গেল, তাদের সাবালক বুঝে ঠেঙিয়ে হাজতে পুরে দেওয়া হ'ল। গান্ধীজীর মন্ত্রমুগ্ধ সমগ্র দেশটাই তখন জেলে যেতে উৎসুক। ওদিকে জেল-কর্তৃপক্ষ বারে বারে বলে পাঠাচ্ছেন: 'ঠাই নাই, ঠাই নাই, ছোট্ট এ তরী'।

[প্রতি সন্ধ্যায় বহু মহিলাকে থানায়আনা হয়। আমি নিজের ব্যয়ে তাঁদের ও তাঁদের বাচ্চাদের চা লসি্য মিষ্টি ও লজেন্স দিই। টেবিলের চতুর্দিকের বিশখানি চেয়ারে লাল, নীল ও সবুজ শাড়িতে ভর্তি হয়ে যায়। পরের দিন ওদের কোর্টে পাঠানো হবে। আত্মপক্ষ সমর্থন না করলে ওদের প্রত্যেকের ছমাস জেল বরাদ্দ।

কোনও পকেট-পিকার ধরা পড়লে সে বলতো: 'হুজুর হামকো পকেটমারীমে মাত ভেজিয়ে, হাম লোককো পিকেটিং মে দে দিজিয়ে। ইসমে ভী ছ' মাহিনা, উসমে ভী ছ' মাহিনা। লেকেন উসমে খানা আচ্ছা মিলতা]

ফুট ফুটে চৌদ্দ বৎসরের এক বালিকাকে মহিলাদের মধ্যে দেখলাম। তার উপর 'আমার একটু মায়া হ'ল। আমার বয়স তখন বাইশ। তাকে এক বাটি দুধ খাওয়ালাম ও বললাম 'খুকি, বাড়ি যাও। তোমাকে আমরা চাই না। জেলে গেলে তোমাকে কেউ বিয়ে করবে না। আমি ভাল মনে কথাগুলি বললেও বালিকাটি ক্ষেপে উঠে বললে, আমার উপর এতো দরদ কেন? গভর্নমেণ্ট অফিসারকে বিবাহ করতে আমরা তৈরি হইনি। আমাদের বিবাহ করবার জন্যে অন্য বহুলোক আছে।

পরদিন আদালতে হাকিম ওয়াজেদ আলীকে আমি বলেছিলাম যে ওই বালিকাটিকে মুক্তি দিলে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তার জেলে যাবার বড়ো ইচ্ছা। সে অদ্ভুতভাবে ক্ষেপে উঠে প্রকাশ্য আদালতে বললে। 'গ্রেপ্তার করার পর, থেকে আমার প্রতি ওঁর বড়ো দরদ। ওর কি মতলব উনি স্পষ্ট করে বলুন।' এতে আদালত সুদ্ধ লোক হতবাক'। কেউ কেউ হেসে উঠলেন, হাকিম-সাহেব মৃদু হেসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলের, স্টিল ইউ রেকম্যাণ্ড হার রিলিজ? পরে কি ভেবে উনি ওই বালিকাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। মেয়েটি কবার আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে তাকালো, এবং তারপর গজ গজ করতে করতে নিচে নেমে গেল।

[উপরোক্ত ঘটনার ছ'বছর পর কলেজস্ট্রীট মারকেটের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ একটি মোটর কিছুদূরে ব্রেক কষে থেমে গেল। একটি সুশ্রী সুবেশ যুবক গাড়ি হতে নেমে আমাকে জিজ্ঞাস করলেন, 'স্যার আপনার নাম কি মিঃ ঘোষাল? ছ'বছর আগে আপনি কি বড়বাজার থানায় ছিলেন? আমার স্ত্রী ওই গাড়ীতে বসে রয়েছেন। তিনি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চান। আপনার সম্পর্কে বহু গল্প তিনি প্রায়ই আমাদের বলেন। তার ওই কথা শুনে আমি তো অবাক, গাড়ি হতে নেমে শাড়ি-সিদঁুরে ঝলমলে এক বধূ আমার পায়ের ধুলো নিলো। পরে তার পরিচয় পেয়ে আমি সত্যিই বিস্মিত। শুনলাম ওর স্বামী একজন মুনসেফ। তখন হেসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'তাহলে মুনসেফ কি গভর্নমেণ্ট সার্ভেণ্ট নন। মহিলাটি আমার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি। লজ্জায় তাঁর মুখ লাল। সময়ের ব্যবধানে তাঁর ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সেদিন ওর নিকট যেটি সত্য, আজ সেটি তাঁর কাছে মিথ্যা। ওরা আমাকে ওঁদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু ওঁদের ঠিকানা দেওয়া সত্ত্বেও সেই নিমন্ত্রণ আমি ইচ্ছা করেই রক্ষা করেনি।]

জনৈক বিদুষী কুমারী তরুণী একদিন রাস্তার মোড়ে শুয়ে পড়লেন। স্বরাজ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি এইভাবে পথ অবরোধ করে থাকবেন। ভদ্রঘরের সুন্দরী বাঙালী তরুণীকে সিপাহীদের দ্বারা সরাতে বিবেকে বাধলো। আমার ডান হাতে স্টিক ছিল, তাই বাম হাতে তাঁর হাত ধরে ফুটে তুললাম। মেয়েটি ফুটপাতে উঠলো বটে! কিন্তু আমার পিছন ছাড়তে চায় না। আমার সঙ্গে সঙ্গে আসে। আর বলতে থাকে ঃ আমার হাত যখন ধরেছেন, তখন আমাকে সঙ্গে করে নিতে হবে। ব্যাপার দেখে অন্যান্য মেয়েরাও হইচই করে উঠেছে। চটকরে মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। আমি বেশ জোরেই তাঁকে বললাম। 'আমি আপনাকে বাম হাতে ধরেছি, ডান হাতে নয়। সুতরাং আমার উপর আপনার কোনও ক্লেম থাকতে পারে না।' ওদের সকলকে অতঃপর ভ্যানে পিক্‌আপ করে থানায় এনেছিলান। পরদিন হাকিম অবশ্য সাবধান করে ওদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কদিন বাদে ওই মেয়েটি একগোছা নিষিদ্ধ প্রচার-পত্র সমেত ধরা পড়লো। সে আমার হাতে কিছু লিফ্‌লেট গঁুজে দিয়ে বললে, 'চলুন, আমাকে নিয়ে এবার থানায় চলুন'। এই শ্রেণীর মেয়েরা সাধারণতঃ বাড়ীর ঠিকানা বলে না বলে আমাদের খুব সুবিধা, বাড়ি তল্লাসীর হামলা থেকে আমরা রেহাই পেয়ে যাই। কিন্তু এই প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটলো। থানাতে এসে সে সহজ ভাবেই ঠিকানা বললে। ওটা ছিল নারী কর্মীদের একটা সিক্রেট ক্যাম্প। ক্যাম্পের সভ্যরা সবাই জেলে, ওদের নেত্রীরূপে সে-ই শুধু বাইরে। অগত্যা কারুর বাড়ী তল্লাসী করার জন্য ওকে নিয়ে ঐখানে আমাকে যেতে হলো।

একটা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি ও তার সংলগ্ন কাঠের বারান্দা। সিঁড়িতে ভারীদেহী সিপাহীদের ভার সহ্য হয় না। সিপাহী দুজনকে নিচে রেখে বারান্দায় উঠে এলাম।

হঠাৎ একটা স্থান মচ মচ করে উঠলো। রেলিংটা একপাশে কাত হয়ে পড়লো। আমি ভয় পেয়ে বললাম 'ভেঙে পড়বে না ত'। সে কাছে এগিয়ে এসে হাসি মুখে বললে, দৈবে, আপনাকে ধাক্কা মেরে ফেলে। মেয়েটির আগমনে সত্যি সত্যি রেলিং কাঁপতে লাগলো। আত্মরক্ষার জন্যে আমি হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে ফেললাম। সে কাছে এসেছিল আমাকে সাহায্য করবে বলেই। আমি ক্ষমা চাইলাম, ও বললাম যে আপনাকে না ধরলে পড়ে যেতাম। সে একটু হেসে বললে। 'এবার কিন্তু আপনিই অপরাধী হলেন'।

তার কক্ষে কোনও নিষিদ্ধ প্রচার পত্র পাওয়া যায় নি। মেয়েটি বললে যে সে চা তৈরী করবে, এবং আমাকে তা খেতে হবে। আমি অস্বীকৃত হলে মেয়েটি শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললে 'যা বলি শুনুন। নইলে চেঁচাব, লোক জড় করবো। মেয়েরা কিন্তু গুছিয়ে লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যে বলতে পারে'। এবার ক্ষিপ্রহাতে সে স্টোভ জেবলে চা তৈরী করলো, এবং আমাকে তা গ্রহণ করতে হ'ল, অনন্যোপায় হয়ে। ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে সাক্ষীরা ও সিপাহীরা উপরে উঠতে পারে নি। আমি তখন বেশ কিছুক্ষণ মেয়েটির হেপাজতে অসহায়।

তাকে আর না ঘাটিয়ে আলাপ শুরু করলাম। জানা গেল যে ধনাঢ্য জমিদার ও ব্যবসায়ীর অতি-আদরের একমাত্র সন্তান। সে গ্রাজুয়েট। ঢাকায় ও কলকাতায় ওদের কয়েকটি বাড়ি আছে। পরিশেষে সে হেসে যা বললে তার অর্থ এইঃ এখন সে আমাকে দাদা বলছে বটে, কিন্তু পরে এই সম্বোধন থাকবে কিনা, তার নিশ্চয়তা নেই। মেয়েটি বেশ প্রাণোচ্ছল ও স্পষ্ট চরিত্রের মেয়ে। সে দুঃসাহী একটী প্রহেলিকাও বটে।

এই সময় জেলে স্থানাভাব হওয়াতে মুচলেকা দিয়ে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হত। আমি তাকে সেই প্রস্তাব দিলাম। সে বললে, 'সংগঠনের পক্ষে নিয়ম বহির্ভূত হলেও আমি এখন এই প্রস্তাবে রাজী'? প্রকৃতপক্ষে সে এ সব ছেড়ে পড়াশুনায় মন দেবার এখন পক্ষপাতী। সে তাদের বালিগঞ্জের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বললেঃ 'আমাদের বাড়িকে অবশ্যই একদিন যাবেন। নইলে এপথে আমি আবার নামবো। এটা তার রীতিমতো হুমকী। সাংঘাতিক মেয়ে! এই ধরনের মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকাই উচিত। কিছুদিন পরে যথারীতি এই ঘটনা আমি ভুলে যাই।

[এর বেশ কিছু পরবর্তী কালের ঘটনা। শহরে ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে। পথে মিছিল নিষেধ। আমি অন্যদের সাথে প্রতিরোধার্থে ডিউটিতে আছি। দেখলাম একটি বিরাট মিছিলের সঙ্গে মারমুখী জনতা। সম্মুখে একটি মেয়ে পতাকা হাতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ওদের রোখা শক্ত বুঝে হেডকোয়ার্টারে ফোন করলামঃ এফেকটিভ ফায়ারিং ছাড়া ওদের রোখা অসম্ভব। হুকুম আসার পূর্বেই ইষ্টক বর্ষন শুরু হয়েছে। জন-দশেক সশস্ত্র শাস্ত্রী আহত। হতাহতের সংখ্যা বেশি হলে বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়বে, এবং ওরাও আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে

যাবে। দলনেত্রী মেয়েটি প্রাণপনে জনতাকে শান্ত করতে চাইছে। কিন্তু তখন তারা আর কারো আয়ত্তে নেই।

ওদের ভয় দেখিয়ে পিছু হটানোর উদ্দেশ্যে হুকুম দেওয়া হল ঃ টু স্পেসেস্ স্টেপ ব্যাক। ওনলি টু রাউণ্ড। ওপেন ফায়ার। পূর্বাপর ঘটনায় আমরা কিঞ্চিৎ নারভাস হয়ে পড়েছিলাম, ফলে অসতর্ক মুহূর্তে একটি গুলি ছিটকে বেরিয়ে অঘটন ঘটালো। জনতা তখনই ছুটাছুটি করে হাওয়া। একমাত্র দলনেত্রী মেয়েটি পথে মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়েছে। তাকে দেখে আমার আর বাকস্ফুরণ হয় না। এই মেয়েটিই ছিল সেই মেয়ে। একটা চলন্ত গাড়ি থামিয়ে দুহাতে তার রক্তাপ্লুত দেহটা তুলে সেই গাড়ির মধ্যে রাখলাম। সে চোখ মেলে অস্ফুটস্বরে বললে, 'এ্যা! আপনি? আপনার কোন ক্ষতি হয়নি তো।

রাত্রে হাসপাতালে তার স্টেটমেণ্ট নিতে নিজেই গিয়েছিলাম! অপারেশন সাকসেসফুল হলেও সে তখনও অর্ধ-অচৈতন্য। তার কপালে হাত রেখে বুঝলাম ক্ষতের জন্য জ্বর এসেছে। যে একবার, চোখ মেলে আমার হাত মুঠি করে চেপে ধরলো। একজন নার্স ছুটে এসে আপত্তি জানিয়ে বললে 'ওকে এখন বিরক্ত করবেন না। এখন ওঁর বিবৃতি দেবার ক্ষমতা নেই। খাতা পেনসিল গুটিয়ে নিয়ে আমি থানায় ফিরে এলাম।

দুদিন পরে টেলিফোনে জানলাম যে মেয়েটি কথা বলছে। এখন তার বিবৃতি নিতে কোনও অসুবিধা নেই। হাসপাতালে তখন তার বহু আত্মীয়-স্বজন। হাসপাতাল-সংলগ্ন রাস্তায় মোটর গাড়ির সারি। ওদের সুটপরা ম্যানেজার ভদ্রলোক ছুটাছুটি করছেন। আমাকে দেখে ওর পিতা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "ইড ইউ, ইড আর দ্যাট ইনেস্পেক্টর"। মেয়েটি ক্ষীণ কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললে, 'ওর দোষ নেই বাবা, উনি গুলি ছোঁড়েননি'। কন্যার কাছেই তার মাতা দাঁড়িয়ে ছিলেন। জগদ্ধাত্রীর মতন চেহারা। তিনি বললেন, 'ওদের আর দোষ কি। ওরা পেটের দায়ে চাকরি করে। এরপর উনি আমাকে বললেন। বাবা তুমি এমন সুন্দর ছেলে। এই নোংরা চাকরি ছেড়ে দাও।

বহিঃ 'প্রাঙ্গনে তখন তরুণ কংগ্রেসী নেতারা চিৎকার করছিল ঃ 'বন্দেমাতরম'। আমারই সম্পর্কিত পিতামহ এই মন্ত্র দেশকে দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তা উচ্চারণ করার অধিকারও আমার নেই। আমি অধোবদনে ওদের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ডাক্তারদের অভিমত ঃ মেয়েটি বাঁচবে না। এজন্য আমাকে কিন্তু নারী হত্যার জন্য দায়ী করা হয় নি।]

ওদিকে বড়বাজারে পিকেটিং এতটুকুও বন্ধ হয় না। কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই বুঝলেন যে গ্রেপ্তার করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না। তাই অন্য ব্যবস্থা প্রয়োজন। দলে, দলে পিকেটার বালকদের থানায় আনা হচ্ছিল। অ্যাংলো-সার্জেন্টদের হাতে মোটা খেটো। পরক্ষণে মার-মার-মার-মার। ওরা অজ্ঞান হয়ে পড়ছিল। 'জল আন, জল আন, ফাস্ট এড-ও দেওয়া হচ্ছে। চকমিলান থানা-বাড়ির উপরের তলাগুলির

চতুর্দিকে ঘিরে অফিসারদের কোয়ার্টারস। সেখানে জানলায়—জানলায় পুলিশ গৃহিনীরা দাঁড়িয়ে নিচের উঠোনে কান্ড দেখছেন ও ডুকরে কেঁদে উঠছেন। গৃহিনীদের কারো কারো হাতে সুতা-কাটা তফ্লি দেখা যায়। পুত্রেরা গোপনে বাড়ীতে চরকাও এনেছে। গান্ধীজীর ডাক পুলিশ পরিবারের অন্তঃপুরেও পেঁাছেছে। রক্তাক্ত কলেবর বালকের দল জ্ঞান ফেরামাত্র চেঁচিয়ে উঠলো, 'বন্দেমাতরম' আবার মার। আবার তারা অজ্ঞান। বারে, বারে একই ঘটনারই পুনারাবৃত্তি। তাদের মুখের হাসি কিন্তু প্রতিবারেই অটুট থেকেছে। কাউকে কটূক্তি করতে পর্যন্ত শোনা যায় নি।

যারা এমনি করে চুপ করে মার খেতে পারে, তারা একবার ঘুরে দাঁড়ালে নিশ্চই দুর্বার হ'ত। কিন্তু ওদের মধ্যে এতটুকু বিদ্বেষের ভাব দেখিনি, অধিকাংশ দেশীয় অফিসাররা নীরব দর্শক। অবশ্য তা বলতে বিবেকে বাধে। একটা শুকনো বেতের ছড়ির মাঝখানটি আমি চিরে রেখেছিলাম। কর্ত্তাদের হুকুমে যদি মারতে হয় তাহলে কাউর বিশেষ লাগবে না। ওথেকে ফটাফট শব্দ বের হবে। তাতে সাহেবরা বুঝবেন সে অন্যদের মতো আমিও একজন লয়েল অফিসার ক্রমে ক্রমে পুলিশ-কর্মীরাও ওদের প্রতি সিমপ্যাথেটিক হয়ে উঠেছে। সিমপ্যাথেটিক শব্দটি পুলিশে তখন সাম্যবাদীদের, শোধনবাদী শব্দের মতো ভয়ঙ্কর। ওদের তাড়া করে ধরতে বললে সিপাহীরা লাঠি ঠুকে কিছুদূর এগোয় ও ফিরে এসে বসে 'না মিলি' 'ক্যা কুরু' মুত্রিম—সিপাহীরা নির্লিপ্তভাবে মুখ ঘুরিয়ে বলেছে যে, এখন তাদের রোজা। তাই মিথ্যে সাক্ষী তারা ওদের বিরুদ্ধে দেবে না।

[আশ্চর্য এই যে-আইনি মারধোরে ওই ব্রিটিশ আদালতেই কজন পুলিশ কর্মী বিপদে পড়েন, জনৈক প্রধান-হাকিম আমাকে বলেছিলেন, "আস্ক ইওর অফিসার টু বি কেয়ারফুল"। আমাদের অধিকর্তা ইংরাজ ডেপুটি-কমিশনার সম্পর্কেই তিনি একথা বলেছিলেন। এই সব হাকিমদের দূর চট্টগ্রামে বদলী হওয়া ঐ কালে অনিবার্য ছিল']

একদিন সন্ধ্যায় বিশজন মহিলা সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে থানায় এনেছিলাম। অভিযোগ বইতে ওঁদের নাম লিখতে হবে। কিন্তু ওরা অসহযোগী হওয়ায় নাম বলতে নারাজ। পীড়াপীড়ির ফলে একজন বললেন' আমার নাম 'শ্রীমতী বৃটিশ শত্রুণী দেবী। অন্যজনের উত্তর 'আমার নাম' 'কুমারী সাম্রাজ্য ধ্বংশী দেবী'। কী সাংঘাতিক! এই সব শব্দ কানে শোনাও মহাপাপ। বাধ্য হয়ে আমরাই ওদের একটা করে নাম রাখি' যেমন ললাটিকা, ললন্তিকা, মহাশ্বেতা, নবনীতা ইত্যাদি। পরিশেষে ভালো নাম ফুরিয়ে গেলে এই সব নাম রাখি, জগদম্বা, ক্ষেমৎকরী, নৃত্যকালী, মহাকালী ইত্যাদি। কিন্তু আদালতে এই সব নামে ওরা সাড়া দিতেন না, ফলে পরদিন তাদেরকে সেখানে সনাক্ত করাও আমাদের পক্ষে মুশকিল হ'ত।

একদিন বড়বাজারে সোরগোল পড়ে গেল। চামুন্ডাদেবী! চামুন্ডাদেবী! মহাবলী গোরা-সার্জেন্টরাও তাঁর ভয়ে ভীত। এক অ্যাংলো সার্জেন্টের ঘড়িশুদ্ধ কবজি একবার তিনি চেপে ধরায় তার হাতটি ফ্যাকচার হয়ে যায়। দুবার বন্দেমাতরম

বলার পর সার্জেণ্টটি মুক্তি পান এবং হাসপাতালে ভর্তি হন। ছ'ফুট লম্বা এই দেহাতি মহিলার মধ্যে-মধ্যে আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু কোথা থেকে এসে কোথায় চলে যান কেউ তা জানে না। তাঁর হাতে হাণ্টার থাকতো বলে তখন তিনি সাধারণ-ভাবে হাণ্টারওয়ালী নামে পরিচিতা।

হঠাৎ একদিন তিনি বড়বাজারে কাটরা অঞ্চলে এসে উপস্থিত। বিলাতী বস্ত্রের গাঁটবাহী কুলিদের পিঠে গুম করে কিল বসিয়ে তাদের পিঠ তিনি দুমড়ে দিচ্ছিলেন। আমরা ব্যাপার দেখে একটা ভারী শতরঞ্চি তাঁর মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে সকলে তাকে চেপে ধরলাম। তিনি সব কজনকে শতরঞ্চি-সহ উল্টে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং কুলিদের পিঠে আবার গুম গুম কিল বসাতে লাগলেন। জনৈক কংগ্রেসী নেতা সেই সময় সেখানে এসে পড়েছিলেন। তার বোঝানোর ফলে, তিনি গ্রেপ্তার হতে সম্মত হন। আমরা তাঁকে থানায় আনলে তিনি পুনরায় নিজমূর্তি ধরে টেবিল-চেয়ার উল্টোতে আরম্ভ করে দিলেন।

আমাদের ইনচার্জবাবু গোলমাল শুনে তাঁর ঘর হতে বেরিয়ে এলেন, এবং আসামীকে দেখে বললেন 'আরে ওঁকে ধরছো কেন? ওকে গ্রেপ্তার করা বারন। এখনই সব চেয়ার-টেবিল ভেঙে তছনছ করে দেবে। বড়বাবু কংগ্রেসী ফাণ্ডে দশটাকা চাঁদা তাঁর হাতে দিলেন, এবং তিনি থানা হতে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর টাকার দরকার পড়লে এইভাবে তিনি আবির্ভূতা হন শুনলাম যে জেল কর্তৃপক্ষ ওঁকে জেলে রাখতে চান না। তাই গ্রেপ্তার না করে কোনমতে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়াই হুকুম। একবার তো বেয়নেটের খোচায় তাকে থানা হতে তাড়াতে হয়েছিল।

কোন স্থানে একজোড়া তরুণ-তরুণী ঘনিষ্টভাবে বসে পিকেটিং করছিল। আমি প্রত্যহই তাদের দুজনকে একসঙ্গে একই স্থানে পিকেটিং করতে দেখি। এতে আমি অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করে একদিন তাদেরকে বললাম। 'উহু এটা ঠিক হচ্ছে না, আপনারা একটু দূরে দূরে বসবেন! ওরা অপ্রতিভ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। বেশ কিছুকাল ওদের আমি প্রতিটি কাটরায় বৃথাই খুঁজেছি। দিন-পনের পরে ওদের আবার একসঙ্গে পিকেটিং করতে দেখলাম, সেদিন মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর আর ছেলেটির হাতে কাঁচা দূর্বার রাখী দেখে ওদেরকে সদ্যোবিবাহিত দম্পতি বুঝে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

এই সময় পুলিশ, এবং পিকেটার্স ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি অলিখিত ভদ্রলোকের চুক্তি গড়ে ওঠে। সন্ধ্যার পরে পিকেটিং হবে না, দোকানীরা দোকান বন্ধ রাখবেন। পুলিশও বিশ্রামার্থে নিজ নিজ থানায় ফিরবেন। এই হল সর্বসম্মত সাধারণ চুক্তি। কিন্তু লোভাতুর কিছু ব্যবসায়ী দোকান সামান্য ফাঁকা করে ভিতরে বসে থাকতেন খরিদ্দারের আশায়।

এই সুযোগে—জনৈক প্রৌঢ় রায়বাহাদুর এক দোকানে গোপনে কিছু বিলাতী বস্ত্র সওদা করতে এলেন। পুলিস এবং পিকেটাররা চুক্তিমতো অনুপস্থিত। চতুর্দিকে বিজলী বাতি গুলি নিবছে একে একে। লোকজনের কলরব তখন স্তিমিত।

'আমার দাদু আপনাকে ডাকছেন, তিনি কাপড় কিনতে এসেছেন,' একটি চতুর্দশী বালিকা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তার কাছে নিবেদন করলো, 'দাদুর পায়ে গাউট হয়েছে বলে তিনি দোকান থেকে উঠে আসতে পারলেন না, আমাকে পাঠালেন। আমার সঙ্গে আপনি ওদিকের দোকানে গেলে তিনি খুশি হবেন'।

দাদুর নাম শুনে তিনিও খুশি। ওরা উভয়ে বন্ধু এবং উচ্চপদস্থ অবসরভোগী রায় বাহাদুর। অতএব উৎসাহিত হয়ে তিনি বালিকাটির সঙ্গী হলেন। তাঁর নির্দেশ মতো একটি গলির মধ্যে প্রবেশ মাত্র অপেক্ষারত ছেলের দল তাঁকে পাকড়াও করলো। একজন নাপিত তাঁর সযত্ন লালিত দীর্ঘ সাদা দাড়িগোঁফ থর থর করে কামিয়ে দিলো। ওদের প্রত্যেকের হাতে ধারালো ছুরি। আর একজন তো চটপট তাঁর কান বিঁধিয়ে এবং আয়োডিন লাগিয়ে প্রতি-কানে একটি করে পিতলের মাকড়ি, এবং দুহাতে কিছু কাঁচের চুড়ি পরিয়ে দিলো। বাকী ছিল পরনের ধুতি। সাজ সম্পূর্ণ করার জন্য সেই ধুতি খুলে শাড়ি ও ব্লাউজ পরিয়ে তাঁকে একটা রিকশায় তুলে দিলো এবং চালককে নির্দেশ দিলো তাঁকে যেন নিটকবর্তী থানায় পোঁছে দেওয়া হয়।

ভদ্রলোক তো থানায় এসে উপস্থিত হলেন। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই তিনি হাউ-মাউ করে বললেন, মশাই আমি স্ত্রীলোক নই। আমি রায়বাহাদুর অমুক চন্দ্র অমুক। থানায় তৎক্ষণাৎ হুলস্থুল পড়ে গেল। এমনটি এই এলাকায় কখনও ঘটেনি। তার প্রতিবেদনে ডাকাতি মামলা রজু করা হল। বড়োসাহেব ছুটে এলেন, এবং কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করলেন। সংবাদ পেয়ে ডেপুটি-সাহেব এলেন এবং ওসব দেখে অবাক হলেন। কোয়াটারস হতে ও'র জন্যে ধুতি ও চাদর আনা হল। তিনি শাড়ি ও ব্লাউজ পরিবর্তন করলেন। আমি দৌড়ে ঘটনাস্থলে গেলাম, এবং সেখান হতে তাঁর ক্ষৌরীকৃত দাড়ি ও গোঁফ সংগ্রহ করে আনলাম। সেগুলি একত্রে একটা তার দিয়ে বেঁধে তাতে লেবেল এঁটে লেখা হল। এক্সজিবিট নং ১ শাড়ি, ব্লাউজ ও চুড়িগুলিকে দুভাগে আলাদা করে যথাক্রমে লেখা হ'ল দুই ও তিন নম্বর একস্‌জিবিট। অন্যগুলিকে চার নম্বরের একস্‌জিবিটের টিকিট সাঁটা হল। পরে আদালতে কেশ উঠলে মামলার প্রদর্শনী দ্রব্যরূপে এগুলো দেখানোর সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা।

একদিন এলাকায় একটি হরতাল ডাকা হলো। অজুহাত পুলিশী জুলুম। হ্যারিসন রোড হরতালের জন্য ফাঁকা। ফুটপাতে চেয়ার ও বেঞ্চি পেতে বসে আমরা অপেক্ষা করছি। সিপাহীরা এখানে-ওখানে বসে গোঁফে তা দিচ্ছে। খৈনি খাচ্ছে। জমাদাররাও আছে। আমাদের আশংকা মিছিল যদি আসে তাহলে এলাকা নিরুপদ্রব না-ও থাকতে পারে।

পুলিশ-ঘেঁষা লোক সব সময় কিছু না কিছু থাকে। সেই রকম এক পরিচিত ভদ্রলোক সেখানে এলেন। পুলিশী ভাষায় এঁদের বলা হয়ঃ পুলিশ ফ্রেন্ড। ইনি ধনীর পুত্র। নিজস্ব গাড়ি ও বাড়ি দুই-ই আছে। গাড়িটি আমরা কেউ চাইলেই ব্যবহার করতে দেন। প্রয়োজনে পুলিশের পক্ষে সাক্ষী হন। তার রায় বাহাদুর পিতার

মতো তিনিও বিশেষ ভাবে রাজভক্ত। পরনে ফিনফিনে বিলাতী ধুতি ও পাঞ্জাবী। তিনি একজন হেড কনস্টেবলের কাছে গিয়ে ভাব জমালেন এবং বললেন, 'ইনে লেড়কা লোককো পিটানে চাহী। ইংরাজলোক হামলোককো কিতনী উপকার কিয়া। এহী বেইমান লোক উনকো হটানে মাঙতা'। জমাদার ঐসব শুনে গোঁফ মুচড়ে যা উত্তর দিলো ও বললো 'উতো ঠিকই। কিন্তু আপনি কি একজন বাঙালী' কোনও বাঙালীর মুখে এরকম উক্তি জমাদারের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। একটু দূরে এক অ্যাংলো সার্জেণ্ট ওদের কথাবার্তার ধরণ লক্ষ্য করছিল। এইবার তিনি কাছে এগিয়ে এসে জমাদারকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ওই বাবু কী বলছিল? জমাদার দাঁড়িয়ে উঠে কিছুটা সত্যি কথাই বললো। উনি স্বদেশীদের সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা বলছিলেন। আর যায় কোথা। সার্জেণ্ট সাহেব তাই শুনে দারুন ক্ষেপে তার গালে এক চড় কসিয়ে দিলেন এবং তাতেও তৃপ্তি না-হয়ে তাকে মাটিতে ফেলে ক্রমাগত বুটের ঠোক্কর দিতে লাগলেন। আমি দূর থেকে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছিলাম, কিন্তু তার আর দরকার হ'ল না, তাকে রক্ষা করতে সেখানে ঘটে গেল একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা!

কংগ্রেসী ষাঁড়

একটি প্রকাণ্ড ষাঁড় বউবাজারের ফুটপাতে নির্বিবাদে ঘুমাচ্ছিল। এক কংগ্রেসী বালক মজা করবার জন্যে কাগজে করে একমুঠো কড়া নস্যি তার নাকের নিচে রেখেছে। ঘুমন্ত ষাঁড় ঘন নিশ্বাসে ঐ নস্যির সবটুকু নাকের মধ্যে টেনে নিয়েছে। এতে শুরু হল তার প্রতিক্রিয়া। যাকে বলে এলাহী কাণ্ড। ষাঁড়টি ক্ষেপে গিয়ে কেবল হাঁচে আর দিক বিদিক জ্ঞান শুন্য হয়ে দৌড়োয়। সে প্রথমেই ওই সার্জেণ্ট সাহেবকে গুঁতিয়ে চিৎ করে ফেললো। তারপর পরোয়া না করে বন্দুকধারী শাস্ত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। পালাও-পালাও। বন্দুকধারী শাস্ত্রীদের সকলেই হিন্দু ও গুর্খা। হাতে রাইফেল থাকা-সত্ত্বেও তাদের কেউ গো-বধে রাজী নয়। ফলে, ষাঁড়টির লম্ফঝম্ফ একটুও কমলো না। তার লাল-পাগড়ির রঙের উপরেই যেন বেশি রাগ। ভয়ে পুলিশও দৌড়োয়, জনতাও দৌড়োয়! হ্যারিসন রোড কয়েক মুহূর্তে একবারে জনমানবশূন্য।

কি অপ্রত্যাশিত ও এক বিচিত্র শিক্ষা! সার্জেণ্ট সাহেবটি তো ঢিট হলেনই। পরদিন সেই রাজভক্ত ভদ্রলোকটিকে দেখে আমি তো অবাক। পরিবর্তন তাঁর মধ্যেও। ফিনফিনে বিলাতী ধুতি ও পাঞ্জাবির পরিবর্তে আজ তার পরনে মোটা খদ্দরের ধুতি আর মাথায় খাদি গান্ধীটুপি। ঐ ষাঁড়ের অযাচিত শিক্ষা তিনি এমন ভাবে গ্রহণ করেছেন যে সেদিন থেকেই তাঁকে কংগ্রেসের বিশ্বস্ত কর্মী হতে দেখা গেল। এমন-কি মোটা অঙ্কের চাঁদাও তিনি কংগ্রেস ফাণ্ডে দিয়েছিলেন।

[প্রকাশ্যে প্রহার দ্বারা নিরোগকারীদের যথেষ্ট ক্ষতি করা হয়েছিল। এই প্রহার যারা দেখে বা শোনে তারাও বৃটিশ-বিরোধী হয়, প্রহৃত ব্যক্তির মতো

তার বন্ধু, আত্মীয় ও পড়শীরাও গভর্নমেণ্ট বিরোধী হয়। এ যুগের পুলিশ কর্মীদের তা স্মরণ রাখা উচিত। শৈশবে আমি এক থানায় এক নারীর চুল ধরে এক দারোগাকে প্রহার করতে দেখেছিলাম। তাতে আমার মনে পুলিশ বিরোধী মনোজটের [কমপ্লেক্স] সৃষ্টি হয়েছিল। পরে বহু উৎপীড়ন ও প্রহারাদি দেখেছি। কিন্তু শৈশবে দেখা সেদিনের ঘটনাটাই আমাকে বেশি ব্যথিত করে। এজন্য শিশুদের সম্পর্কে পুলিশদের বেশী সাবধান হওয়া উচিত।

আমাকে একদিন জনৈক ইংরাজ উর্ধতন অফিসার বলেছিলেন 'তোমাদের মতো ভদ্র ও সদ্ব্যাবহারকারী কর্মী যতো বেশী হবে আমাদের জনপ্রিয়তা ততো বাড়বে। আমাদের রাজ্যশাসনও ততো দীর্ঘায়িত হবে। কিন্তু উৎপীড়ক ও প্রহারকারী অফিসাররা প্রকারান্তরে আমাদের বিদায় ত্বরান্বিত করবে। এদের প্রহারের জন্যই তোমাদের দেশ তাড়াতাড়ি স্বাধীন হবে। প্রকৃতপক্ষে ওরাই এই ঘুমন্ত দেশকে পিটিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছে।]

থানা-বাড়িতে আচমকা ভূতের উপদ্রব শুরু হ'ল। "ঠিক দুপুর বেলা ভূতে মারে ঢেলা। দুপুর রাতে ভূতে ঢেলা নিয়ে মাতে" গোছের ব্যাপার। চক-মিলান থানা-বাড়ির উঠোন ইটের টুকরোয় ভরে যাচ্ছিল। মাঝরাত থেকে ভোর রাত পর্যন্ত ক্রমাগত ইষ্টক বর্ষণ। কিছু কর্মী তাতে জখম হয়। প্রতিবেশীদের ছাদে পাহারা বসানো হ'ল। তীব্র সার্চলাইট জেবলে চতুর্দিক খোঁজা হয়েছে। কিন্তু ইট উৎক্ষেপের উৎপত্তির স্থান বুঝতে পারা যায় নি। আমরা থানা বাড়ির উঠোনটা তারের জাল দিয়ে আবৃত করলাম। তবু গতিরোধ করা গেল না। এক জমদোর তো ভূতের ওঝা ডেকে আনলো। মাঝরাতে তার সে কী মন্ত্র আউড়ানো। আশ্চর্য, তাক করে ঠিক তার মাথাতে ঢিল। মন্ত্র তন্ত্র সব ভণ্ডুল। প্রাণ বাঁচাতে সবাই অস্থির। অতএব ভূত ধরা সম্ভব হল না।

ডেপুটি সাহেব সব শুনে আমাকে বললেন 'বাট ইউ আর এ সায়ন্স স্টুডেণ্ট। অতঃপর ঐ উক্তিতে আমি বুঝেছিলাম যে, ও'র মতে কংগ্রেসী কর্মীদের দ্বারাই এ অ-ভূতকর্ম'। পরখ করবার জন্য কজন ধরা পড়া পিকেটার বালককে উঠানে বন্দি করে সারা রাত্রি বসিয়ে রাখা হ'ল। ব্যস! সেই রাত থেকেই ইষ্টক বর্ষণ বন্ধ। এই করার জন্য আমি কুড়ি টাকা পুরস্কার পেয়েছিলাম।

একবার একটা বে-আইনি কংগ্রেসী মিছিল জোর করে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ক্রুদ্ধ একদল জনতা থানার সামনে এসে ইষ্টক বর্ষণ শুরু করলো! তখন পুলিশের পক্ষ থেকে গুলি-বর্ষণের রীতি নেই। থানায় কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র থাকতো না। লাঠিই ভরসা। ওই অস্ত্রে দাঙ্গাকারীদের রুখতে কনস্টেবলরা প্রায়ই আহত হ'ত। পরে উভয়পক্ষ হাসপাতালের পাশাপাশি শয্যায় শুয়ে সুখ-দুখের গল্পও করেছে। পুলিশের জনৈক কর্তাব্যক্তি এসে হুকুম দিলেন, চার্জ লাঠি। তারপর সাহেব বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'আরে একী-রকম লাঠি চার্জ হচ্ছে। কেউ এখনও ইনজিওরড্ হ'ল না। কারো এতটুকু রক্ত বেরুচ্ছে না, হাসপাতালে পাঠানোর মত একটা কেসও

তো নেই, হুম। দেখছি, সবাই তোমরা সিমপ্যাথেটিক।

সাহেব কোমর থেকে নিজস্ব পিস্তল বার করলেন। এক কিশোর এগিয়ে এসে জামা খুলে বুক পেতে দাঁড়ালো। বললে 'মারুন'—সাহেব এতে লজ্জা পেলেন এবং পিস্তলটি যথাস্থানে গুঁজে রাখলেন। কিন্তু ততক্ষণে, উনি ফোর্স হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, ঘেরাও হয়ে গেছেন, জনতা এবার এই সুযোগে তাঁকে সাবড়ে দিতে উদ্যত।

খবর পেয়ে কংগ্রেসী কর্মীরা ছুটে এসে জনতাকে ঠাণ্ডা করে তাকে উদ্ধার করলেন। ইট-বর্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। ভায়োলেন্সের জন্য কংগ্রেস কর্মীরা দুঃখিত ও দারুণ লজ্জিত। ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার গাড়ীতে উঠলেন এবং তারপর গাড়ি থেকে নেমে ভিড় ঠেলে থানায় ঢুকছিলেন। তাকে অপদস্থ না করে সসম্মানে তারা পথ ছেড়ে দিল।

একবার এক পিকেটার-বালক এগিয়ে এসে একটা লজেন্স ডেপুটি-সাহেবের হাতে গুঁজে দিয়েছিল। ইংরেজ সাহেব পরিস্কার বাংলা ভাষায় বলেছিলেন, সেকি এটা তুমি আমাকে খেতে দিলে? আচ্ছা, আমি এটা নিলাম। খেলেন না! লজেন্সটি তিনি পকেটে পুরে রাখলেন। পিকেটার বালকেরা আমাদের মুখে প্রায়ই লজেন্স গুজে দিতো ও বলতো, সেদিন বড্ডো মেরেছিলেন। এই নিন। আপনি একটা লজেন্স খান।

কোনও জেলে তখন আর কয়েদী রাখার জায়গা নেই। স্থান-সংকুলানের জন্য পুরানো দাগী কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে এলাকায় চুরির সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। আমার উপর একদিন উর্ধতন কর্তাদের হুকুম হ'ল একদল মহিলা ও কিশোরীকে লরী করে দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। আমার সঙ্গে সেই রাত্রে একজন মাত্র ড্রাইভার ছিল। শহর থেকে ষোল-সতেরো মাইল দূরে এক জায়গায় ওদের আমি নামালাম। কিন্তু ওরা ওই জঙ্গলের মধ্যে কিছুতেই পড়ে থাকতে চাইলো না। সবাই মিলে আমাকে ধরে একটা সাঁকোর উপর বসিয়ে দিলো। আমি ও ড্রাইভার তাদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারলাম না। ওরা আমাদেরই দেশের মা ও ভগিনী। উপরন্তু অতজনের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব। সুতরাং ওদের সঙ্গে একটি গোপন সন্ধি করতে হল। আমরা নিকটের একটি রেল-স্টেশনে ওদের পৌছে দিলাম। আমাদের শর্তানুযায়ী দুপক্ষের কেউই এ ঘটনা কাউকে প্রকাশ করি নি। এইরূপ মতলব আমারই আগে থেকে ছিল। এতক্ষণ—ওদের একটু ভয় দেখাচ্ছিলাম।

[এইখানে তরুণ শিক্ষিত পুলিশ অফিসারদের অসুবিধা বেশি হত। লাঠি-চার্জের হুকুম হলে জনতাকে তাড়া করা হ'ত। ওই জনতার মধ্যে আত্মীয়-স্বজন সহপাঠী ও পরিচিত পড়শীদের মুখ দেখা যেতো। উদ্ধত যষ্টি তাদের মাথায় বসানো সম্ভব হত না।]

রাত্রিদিন অবিরাম ডিউটি। শরীর ভেঙে পড়েছে। বহু অফিসার ও সিপাহী পীড়িত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আন্দোলন আরও কিছুদিন চললে শাসন

ব্যবস্থা ভেঙে পড়তো। একজন মহিলা থানায় ঢুকে বন্দেমাতরম ধ্বনি তুললেন। জনৈক রাজভক্ত অফিসার তখন ক্ষেপে উঠে বললেন 'মেথরাণী'! টাট্টিকো ঝাটা লে আও। থানার মেথরাণী ঝাঁটা নিয়ে এলো। কিন্তু তাঁর পরবর্তী আদেশ প্রতিপালন করলো না। এদিকে আমি ও অন্য কজন অফিসার এর প্রতিবাদ করায় নিজেদের মধ্যে কলহ বেধে গেল। সহানুভূতিতে দেশীয় কর্মীদের মধ্যে আনুগত্যও প্রতিদিন কমে আসছিল।

প্রধান হাকিম কয়দিন ছুটিতে ছিলেন। তার স্থলে এক সিনিয়র হাকিম কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর এক মাত্র পুত্রটি প্রতি বৎসর পরীক্ষায় প্রথম হয়, কিন্তু পিকেটারদের সঙ্গে সে-ও গ্রেপ্তার হয়েছিল। ওই বিচারপতি তাঁর পুত্র সম্বন্ধে কি-রকম বিচার করেন তা দেখে একটা প্রতিবেদনের জন্য কর্তৃপক্ষ আমাকে আদালতে পাঠান। হাকিম-সাহেব একবার মাত্র পুত্রের দিকে তাকালেন। তারপর মুখে কলম কামড়ে এক মুহূর্ত বোধ হয় চিন্তা করলেন যে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে কি বলবেন। তিনি অন্যদের সঙ্গে পুত্রটিকেও ছ'মাসের মেয়াদ দিয়ে টলতে টলতে এজলাস ছেড়ে খাস-কামরায় চলে গেলেন। পর বৎসর দেখা গেল তিনি রায়বাহাদুর খেতাব লাভ করেছেন।

সুসংবাদ এলো ৮ই মার্চ ১৯৩১, গান্ধী আরউইন চুক্তি সমাপ্ত। অ্যাংলো-সার্জেণ্টরা তাই শুনে ক্ষেপে উঠে বলছিলেন যে, 'এরকম অপদার্থ বড়লাট ভারতে আগে একজনও আসেনি। আগের দিন বহু তেরঙা ঝাণ্ডা ও কংগ্রেসী ফেস্টুন থানায় এনে বিনষ্ট করা হয়েছিল। আজ সেই সব পতাকা ও ফেস্টুন ফেরত দেবার হুকুম এলো থানাতে। অগত্যা রঙিন কাগজ কিনে তাই দিয়ে পতাকা ও ফেস্টুন তৈরী করে ওদের ফেরত দেওয়া হ'ল। কিছু পরে বড় বাজারে কংগ্রেসী কর্মীরা ঝুড়ি ঝুড়ি মিঠাই থানাতে আমাদের মধ্যে বিতরণ করালো। আইন-অমান্য আন্দোলন তখন সম্পূর্ণ বন্ধ। কিন্তু সিক্রেট ক্যাম্পগুলিতে তখনও বহু বালক মজুত। এদের মধ্যে অনেকেই গৃহপলাতক বালক। বাড়িতে ওদের আশ্রয় নেই, তারা খায়-দায় আর জেল খানা ঘুরে আসে, এখন ওরা মুশকিলে পড়লো। এখন তাদের কেউ আর খবর নেয় না। খানাপিনার কোনো ব্যবস্থাও নেই। নেতা ও উপনেতাদের তারা পাত্তা পায় না, তাদের কোনো কাজ নেই। না লেখাপড়া, না গৃহপ্রত্যাবর্তন। ফলে কিশোর-অপরাধীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গেল।

এই বে-ওয়ারিশ বালকদের সম্বন্ধে আমি সরকার বরাবর একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলাম। ওদের সে-সময় বাড়ি ফেরার গাড়ী ভাড়াও নেই। আমি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে কয়েকজনকে রেল ভাড়া দিয়েছিলাম। পরে গভর্নমেণ্ট থেকে ওদের সংগ্রহ করার হুকুম আসে। কিন্তু তখন কাউকেই আর খুঁজে পাওয়া যায় নি, এখানে উল্লেখ্য এই যে, এই মহা আন্দোলন মাত্র কলকাতায় বড়বাজারে কেন্দ্রীভূত থেকেছে। এর কারণ বিলাতী বস্ত্র ম্যাঞ্চেস্টার হতে এখানে পাঠানো হত। এরপর এখান হতে ঐগুলি সমগ্র ভারতে প্রেরিত হয়েছে।

এই পিকেটার কার্যে কোনও মুসলীম বা কোনও খৃষ্টান থাকে নি। একজন ভুলক্রমে একজন মুসলিম তরুণকে রাজপথ হতে অন্যদের সঙ্গে গ্রেপ্তার করে। তাকে জনৈক উর্ধতন কাজী খান সাহেব ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, 'একে ধরেছ কেন? এতো মুসলীম। এরা এতে থাকবে কেন? উপরন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক হিন্দুদের কাউকে সেখানে শেষের দিকে দেখা যায় নি। শুধু মেদিনীপুরের বাঙালী-মেয়েরা ও গুজরাটী মেয়েরা ও কলকাতার কয়েকটি পরিবারের মেয়েরা ও সংখ্যাহীন বালক ও বালিকারা। ভোর বেলা কোনও অজ্ঞাত স্থান হতে ট্রাকে করে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষরা তাদেরকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে নিজেরা সরে পড়েছে।

সিক্রেট ক্যাম্প

বহুস্থানে বড় বড় বাড়ী ভাড়া করে বালকদের এনে সেখানে রাখা হতো, ওদের সেখানে খাওয়া থাকার সুব্যবস্থা হয়েছে। এরপর এখান হতে এদের গোপনে বার করে বড় বাজারের কাপড়ের বাজার ও মনোহর দাস কাঠরায় পিকেটিংয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে।

[কিন্তু গান্ধী আরউইন চুক্তির পর এইসব গ্রাম হতে আনা বালকরা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। তাদেরকে খাওয়াতো যারা তারা তখন বেপাত্তা। বাড়ীর মালিকরা ভাড়া না পাওয়াতে তাদের তাড়িয়ে দেয় ও পুলিশকে ওদের বিষয়ে খবর দেয়। তখন-এই রূপ শুনা গিয়েছিল যে গুজরাটের মিল মালিকরা তাদের তৈরী কাপড়ের কাটতির জন্য এর ব্যয় নির্বাহ করেছিল। এখন আর এর কোন প্রয়োজন নেই। এই সব বালকদের গ্রামে ফেরার জন্য রেলের ভাড়াও নেই। কেউ কেউ ফিরে যাবার পথও চেনে না। এই সুযোগে পকেট-পিকাবরা ও বারগ্লাররা ওদেরকে রিক্রুট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ক্ষুধার জ্বালায় কেউ, কেউ গৃহস্থ বাড়ীর ভৃত্যও হয়। আমার এ বিষয়ে প্রতিবেদন পেয়ে কর্তৃপক্ষ স্তম্ভিত। আমি এদের বহুজনকে বদজনের খপ্পর হতে উদ্ধার করি। সরকারী বরাদ্দ অর্থ সমেত পুলিশ এসকর্টে তাদের গ্রামেতে পাঠাই। এদের বহুজন দেশপ্রেমে উদ্ভুত হয়ে বাড়ী হতে পালিয়ে ইংরাজদের কবল হতে দেশ উদ্ধার করতে এসেছিল। এবার ঐ ইংরাজ সরকারের অর্থেই তাদের গ্রামে ফিরতে হলো]

এই সময় বড়বাজারে শিশুদের নিয়ে একটি বানর সেনা নামে হিন্দীভাষীদের সংস্থাও তৈরী করা হয়েছিল। এদেরকে পুলিশের পিছনের এগিয়ে দিয়ে বয়স্করা দূরে সরে পড়েছে। আজও ওই শিশুদের কণ্ঠস্বর আমাদের কানে বেজে ওঠে। ঘোষালবাবু হায় হায়। এরা এত কম বয়সের যে এদের গ্রেপ্তার করাও অসুবিধা। অন্যদিকে বহু গৃহহীন ভিখারীদেরকে পরিস্কার খদ্দরের ধুতি চাদর পরিয়ে তাদের হাতে কংগ্রেসী পতাকা ও চার আনা পয়সা দিয়ে এগিয়ে দিয়ে পরে নেতারা পিছন হতে

সরে পড়েছে। পুলিশ ওদের গ্রেপ্তারের বহু পরে প্রকৃত বিষয় বুঝে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে। এতে ওদের উদ্দেশ্য জেলগুলো লোক দিয়ে ভর্তি করা। বহুজন নুন তৈরী করতে সমুদ্রের তীরে গিয়েছে কিন্তু অন্যেরা গ্রামে থেকে সুপারি গাছের বালতো পুড়িয়েও নুন বার করেছে। কারণ বে-আইনী নুন তৈরী করাও এই আন্দোলনের একটি অংশ থেকেছে। হঠাৎ-এই তুঙ্গে ওঠা লড়াই বন্ধতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এতো টেম্পো উঠানো পরেতে আর সম্ভব হয় নি।

এ আন্দোলনে পুলিশদেরও যথেষ্ট আস্কারা দেওয়া হয়েছিল। তাদের মারমুখী স্বভাব সংযত করা কঠিন হয়ে উঠে। পূর্ব স্বভাব ফিরিয়ে আনতে কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। বহুদিন পর্যন্ত ওদের আইনানুগত করা সম্ভবপর হয় নি। প্রকৃতপক্ষে পুলিস দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করতে গেলে এরকমই হয়ে থাকে।

কার্যোদ্ধার সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরদিনই দেখা গেল ইংরাজ উর্ধতনরা ভিন্নমূর্তি ধরেছে। ৮ই মার্চের দিনই রিপোর্ট রুমে একজন অ্যাংলো অ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার জনৈক নতুন ভর্তি স্নাতকোত্তর কর্মীকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন 'ইয়া! ইউ আর এম-এস-সা [এম-এস-সি] ইউ মাস্ট আর্ন লার্ণ হিয়ার, হোয়াট ইউ লার্ণড দেয়ার। সেই সঙ্গে তিনি আরও কয়েকটি আপত্তিকর কটুক্তি করেন। তরুণ কর্মীটি পরেতে প্রতিবাদ স্বরূপ কর্মে ইস্তফা দিয়ে লিখে দিয়েছিলেন। উপস্থিত ইনচার্জবাবুরা তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করতে চাইলেন, ও তাকে বললেন, 'আরে একী করছো! আমরা এখানে দশজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী 'উপরওয়ালারা যদি দশটা গালি দেয় তাহলে বিশটা পাবলিককে আমরা গালি দেব, তাতে নিদ্রাও ভাল হবে আর মনের জ্বালাও মিটবে অন্য একজন বাঙালী প্রৌঢ় ইনচার্জ তাকে সান্তনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আরে শব্দ হচ্ছে ব্রহ্ম! তার কোনো আকার নেই, অর্থও নেই, যা-হোক একটা-কিছু মনে করে নিলেই হ'ল। জাপানে ড্যাম মানে গোলাপ ফুল, এখানে তার অর্থ গালাগালি। তাছাড়া গরু ডাকে, ঘোড়া ডাকে, বাঘ ডাকে,' এটাও একরকম ডাকে! মনে কর এখানে বড়সাহেবের ডাক। তাতে কি রাগ করতে আছে? ছেলে বেলায় বাবা আমাকে বকলে আমি ভাবতাম ষাঁড় ডাকছে।

[কোনও এক নতুন অফিসার সংস্কৃতে এম এ পাশ বলায় তাঁকে প্রৌঢ় ইনচার্জ বলেছিলেন সে কি! সংস্কৃত শিখে থানায় চাকরীতে কি উপকার আসবে। তার চাইতে কোথাও একটা টোল খুলে বসলে না কেন?]

যাদের আত্মসম্মান জ্ঞান নেই তারা মানুষও খুন করতে পারে। উর্ধতনরা এভাবে ওদের আত্মসম্মান বোধ বিনষ্ট করে অনেককেই তাদের মতো অসদ্ব্যবহারী এবং উৎপীড়ক করে তুলতো।

এতদিন বলা হ'ত নরম্যাল ওয়ার্ক বন্ধ করো। এখন নরম্যাল ওয়ার্ক না করার জন্যে কৈফিয়ৎ। ওদিকে ইংরাজ ডেপুটিরা ক্লাব জীবনে ফিরে গেছেন। অফিসাররাও সিনেমা দেখতে ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সক্ষম। কিন্তু শীঘ্রই বোঝা গেল সে পূর্বদিনগুলিই ছিল ভালো।

বড়সাহেব এসে থানার মালখানা পরিস্কারের হুকুম দিলেন। চোখের সামনে এক নিদারুন ঘটনা ঘটতে দেখলাম। বাংলায় লেখা বহু বাঁধানো কেতাব বাইরে এনে জড়ো করা হ'ল। ওগুলিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে সরল পরিভাষা সমূহ লেখা। কলকাতা পুলিশের স্থাপন কাল হতে ১৯১০ খ্রীঃ পর্যন্ত থানার কাজ বাংলা ভাষায় সমাধা করা হ'ত। নিষ্প্রয়োজন মনে করে ওগুলি প্রাঙ্গনে পুড়িয়ে ফেলা হ'ল। দুশো বছরের অমূল্য সম্পদ এভাবে ভষ্মীভূত হতে দেখে আমি হতবাক।

[একই কেতাবে পর-পর নম্বরসহ ভৃত্যচৌর্য, গৃহচৌর্য, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি বহু অপরাধের অভিযোগ। সিপাহীদের বেয়াদবী ও গাফিলতির বিষয়ও তাতে রয়েছে। কে কাকে গালি দিয়েছে বা কে হুকুম তামিল করেনি। কেতাবগুলির পাশে বাংলা ভাষায় উর্ধতনদের লেখা মন্তব্যও ছিল]

মা ঠিক সময়ে খেতে ও ঘুমোতে বলেছিলেন। কারো মনে কষ্ট দিতে ও মারা-মারির মধ্যে যেতেও তাঁর বারণ ছিল। কিন্তু এখানে তাঁর প্রতিটি উপদেশের বিপরীত কাজই করতে হয়। বিপদজনক কাজে ঝাঁপিয়ে কতবার জখম হয়েছি। মার নাগাল হতে ছেলে ছিনিয়ে কতবার গ্রেপ্তার করেছি। বাইরে বেরুলে লিখতে হ'ত কোন সময়ে বেরুলাম ও কখন ফিরলাম; কিজন্য কোথায় গিয়েছি ও সেখানে কি কাজ করেছি। বেরুবার আগে ও ফিরবার পরে ডায়েরি বইয়ে ও প্রতিবেদনে তা লেখা চাই। দু-রাত্রি রাউণ্ডের পর একরাত্রি বিশ্রাম। ঢুলতে, ঢুলতে যাওয়া এবং ঢুলতে ঢুলতে ফেরা। কখনও সারাদিন তদন্তে থাকি। সাক্ষী দিয়ে কোর্ট হতে বিকালে ফিরি। সকালের খাবার আমাকে বিকালে খেতে হয়।

[পরে সাহেবদের বুঝিয়ে আমিই দু-রাত্রির বদলে একরাত্রি রাউণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলাম। এর আগে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করতে কেউ সাহসী হয়নি।]

বড় সাহেব একবার থানায় এসেছিলেন। উনি দারুন চেঁচামেচি করে গেলেন, জুনিয়ার অফিসার শুকুল সাহেব বড়োবাবুকে বললেন আপনি রোঁদে আছেন বললে উনি তাতে বিশ্বাস করলেন না। 'ওকে চেঁচাতে দাও। ওর মন শান্ত হবে, বড়বাবু একটুও ভীত না হয়ে বললেন 'একসঙ্গে দুজনে আগে কাজ করেছি। এখন উনি উচ্চপদস্থ হলেও পরস্পরের দুর্বলতা জানি। জব্বরকে ডেকে বলো, কিছুদিন জুয়া বন্ধ রাখুক। আমাকে উনি বেশি ঘাটাবেন না। তবে তোমরা একটু সাবধানে থেকো। এখন তিনি বাড়িউলি হয়ে পূর্বজীবন ভুলে গেছেন [এ রকম কথাবার্তা তখনও আমার কাছে দুর্বোধ্য।]

শীঘ্রই বুঝলাম যে পুলিশ বিভাগ সুন্দরবনের সঙ্গে তুলনীয়। সেখানকার কাঁকড়াবিছা মাঝে মাঝে দংশন করবে। ডাঁশ মশার কামড়ে উত্যক্ত হতে হবে, শুধু দেখতে হবে সাপের দংশন বা বাঘের আক্রমণের মতো ফেটাল কেস যেন না হয়। জরিমানা, ধমকানো ও বরখাস্ত ওখানে সাধারণ ঘটনা।

এছাড়া একপ্রকার অদৃশ্য জীবাণু আছে যা অজ্ঞাতে ফুসফুস ফুটো করে শরীর অকেজো করে। ডাক্তারী শাস্ত্রে তার নাম যা-ই থাক পুলিস-শাস্ত্রে তার নাম গোপন

নথী। [C. C. Role] যা আরও সাংঘাতিক। কখনও, কখনও বহুকাল পরে প্রমোশনের সময় হলে তার অস্তিত্ব বুঝা যায়।

এই সময় একটা জব্বর কাণ্ড হঠাৎ ঘটে গেল। এটাই ছিল আমার প্রথম মামলার সার্থক ডিডেকসন। পুস্তক বিক্রেতা ভোলানাথ সেন, এক মুশ্লিম তরুণ কর্তৃক কলেজ স্ট্রীটে নিহত হলেন। তিনি ভুল করে একটি পুস্তকে হজরত মহম্মদের প্রতিকৃতি ছেপেছিলেন। শ্রীসত্যেন মুখার্জী ও আমি তাকে চিৎপুরের এক মসজিদ হতে গ্রেপ্তার করলাম। খবরটা ছিল আমারই। আমি অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিরস্ত্র করি। ফাঁসির হুকুম দিতে গিয়ে হাইকোর্টের জজ লিখেছিলেন সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক কোন হত্যাতেই রেহাই নেই।

এই ফ্যানাটাকি লোকটার ফাঁসীর পর কিছু এলাকাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ফের ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের মত আরম্ভ করা হয়েছিল। এজন্য তখুনি বিরাট পুলিশ দল পাঠাবার ব্যবস্থা হলে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্নরাও ফতোয়া দিয়েছিলেন, 'উনে অভি বেহস্তমে চলা গয়া'। কিন্তু এই উপলক্ষে কিছু প্রচারও সুরু হয়ে গিয়েছিল। এটার উগ্রতা নিম্নোক্ত ঘটনাবলী হতে বুঝা যাবে।

জনৈক মুশ্লীম বিহারী বালককে এক মৌলভি সাহেবের অভিযোগে থানাতে এনে তার বাপজানের নাম জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিল, বাপুজান খান। কিন্তু পিতামহের নাম করা হলে সে ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর করেছিল: উনকো বাত ছোড় দিজিয়ে হুজুর। উ সালে হিন্দু থে। এই সময়ে বাঙালী মুশ্লীমরা এবং হিন্দু মুশ্লীম নির্বিশেষে প্রতিটা তদন্তের নিকট তখন পুলিশ ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতির ঊর্ধে একটি পৃথক সম্প্রদায়। আমার আজও বিশ্বাস এই যে পুলিশ ইচ্ছা করলে যে কোনও দাঙ্গা বাধাতে বা তা থামাতে পারে। তখনও বৃটিশরা তাদের ভেদ নীতি পুলিশে ঢুকতে দেয় নি। তাই সেই সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধা অসম্ভব। ঐ কালে বাঙালী হিন্দু, মুশ্লীম বা সাম্প্রদায়িক থাকাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিহারী মুশ্লীমদেরই একচেটিয়া মাত্র ছিল। ওদের তখন আক্রমণ হতো লুঠপাঠার্থে মাত্র ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের ওপর।

যাই হোক পুলিশের সতর্কতায় সেবারে ঐ উপলক্ষে কোন দাঙ্গা হয় নি। আমি নিজে এবং আমার বন্ধু সহকর্মী মহম্মদ মহসীন একত্রে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে হিন্দু ও মুশ্লীমদেরকে এর অযৌক্তিতা বিষয়ে বুঝিয়েছিলাম। আমার এই সার্থক সাম্প্রদায়িক খুনের তদন্ত ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার সংবাদ এবং আমার বাগ্মীতার অর্থাৎ বুঝানোর ক্ষমতার বিষয়ে একটা স্পেশাল রিপোর্ট যা জনান্তীক গোয়েন্দা বিভাগ হতে টেগার্ট সাহেবের নিকট পাঠানো হয়েছিল। ছাত্র অবস্থাতে স্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন করতাম। ওইটা ছিল সম্ভবতঃ প্রথম স্থাপিত স্টুডেন্ডস্ ইউনিয়ন— এটার জন্য আমি ভালো বক্তা হতে পেরেছিলাম। উপরন্তু সাহিত্যিক হওয়াতে কথাগুলি সাজাতেও তাতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। এতো দিনে এইগুলিকে এখানেও কাজে লাগাতে পেরেছিলাম। স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রতিবেদনে খুশী হয়ে চার্লস টেগার্ট

আমাকে ওঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন। আমাকে ওর সিলেকসনেতে কোনও ভুল হয় নি তা বুঝে উনি অত্যন্ত খুশি।

এই সময়ে পুলিশে ভর্তি হওয়ার তিন বছর পর তাকে চাকুরিতে কনফার্ম করা হতো। এর আগে তাদের প্রবেশনে পরিবর্তে কোনও অফিসার ব্রিটিশ বিরোধী কিংবা কর্তব্যে অনুপোযুক্ত বা অসৎ হলে তাকে সরাসরি বরখাস্ত করা হতো, তাই এই বিপজ্জনক কালটুকুতে সকলে সাবধানে থেকেছে। স্যার চার্লস আমাকে দেখে শেখহ্যাণ্ড করে বললেন ভেরি গুড! ওয়েল ডান্ মাই ল্যাড, বাট, ডোণ্ট ফল ব্যাক। উনি অপেক্ষা না করে আমাকে চাকুরিতে কনফার্ম অর্থাৎ পাকা করে দিয়ে হকুম ইসু করে দিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

স্যার চার্লস টেগার্ট আজও ভারতীয় পুলিশের একজন প্রবাদ পুরুষ রূপে খ্যাত ও সেই একই সাথে বাঙালী বিপ্লবী দমনের জন্য কুখ্যাতও বটে। কিন্তু গুণ্ডা এ্যাকট প্রণয়ন করে গুণ্ডা দমন বিভাগ দ্বারা কলকাতার গুণ্ডাকে উনিই সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করেছিলেন। ওই আইনে সাক্ষী আসামীর অবর্তমানে ক্যামেরাতে সাক্ষী দিতে পেরেছে। এই আইনে উনি বহু পেশওয়ারী ও দেশওয়ালী গুণ্ডাকে বাঙ্গলা দেশ হতে তাদের স্বদেশে বিতাড়ন করেছিলেন।

এই টেগার্ট সাহেবের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক যাই থাকুক না কেন, উনি যে ঐ কালে একজন বিতর্কিত পুরুষ ছিলেন তা সকলকে নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এর প্রকৃত চরিত্র এই যুগে অনেকেরই জানা নেই। তাই এখানে তার প্রকৃত চরিত্র ও ওর মধ্যে কনসিলিউড লাইনগুলি এখানে প্রথমে বিবৃত করবো।

একটি সার্ভিস সিলেকসন বোর্ডে স্যার চার্লস টেগার্ট প্রেসিডেণ্টরূপে আমাকে মাত্র একটি প্রধান প্রশ্ন করেছিলেন, 'হ্যাভ ইউ গট এ ন্যাশনাল সঙ ?' উত্তরে আমি 'হ্যাঁ স্যার, আছে' বলার পর তিনি ফের জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াট ইজ দ্যাট সঙ ?' আমি বুঝেছিলাম যে, জাতীয় সংগীত নেই বললে বা 'গড সেভ দি কিং' সঙ্গীতকে আমাদের জাতীয় সংগীত বললে উনি ভাববেন যে, আমার কোন পারসোনালিটি নেই কিংবা আমি একটি মিথ্যাবাদী, চাটুকার। অন্যদিকে আমি 'বন্দেমাতরম'কে আমাদের জাতীয় সংগীত বললে উনি বুঝবেন যে, আমি একজন ব্রিটিশ-বিরোধী কংগ্রেসী। তাই ওঁর ওই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, 'আমাদের জাতীয় সংগীত 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা।'

ওই ধুরন্ধর চতুর সাহেব এর পরই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হোয়াই নট বন্দেমাতরম সঙ ?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমি ওঁকে বলেছিলাম, 'স্যার, বন্দেমাতরম্ গানটা হচ্ছে আমাদের একটা সেক্টের গান। ওটা কংগ্রেসীরা ব্যবহার করে। কিন্তু 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটা আমাদের প্রত্যেক সেক্টের সমান আদরের জাতীয় সঙ্গীত।'

এতে উনি ওই বোর্ডের অন্যান্যদের মতামতের তোয়াক্কা না করে ওখানেই আমাকে বলেছিলেন, 'ওয়েল মাই ল্যাড, উই হ্যাভ টেকেন ইউ।'

পুলিশ ট্রেনিং স্কুল হতে ট্রেনিং নিয়ে বেরুনোর ওর আবার প্রথম পোস্টিং হয় বড়বাজার থানাতে। ওই সকয় ম্যাঞ্চেস্টার হতে জাহাজ বোঝাই বিলাতী বস্ত্র প্রথমে বড়বাজারে আসতো ও তারপর ওখান হতে তা ভারতে পাঠান হতো। এইজন্য মহাত্মা গান্ধীর বিদেশী বস্ত্র বর্জন নীতি মতে সেখানের হোলসেল ও রিটেল

দোকানগুলিতে পিকেটিং দল ছিল। সহর ও পল্লী অঞ্চলের বহু তরুণী ও তরুণ এবং বালক-বালিকা প্রতিদিন গ্রেপ্তার হতো। পরে জেলে আর জায়গা না থাকাতে তাদের পেটাবার হুকুম হয়।

একদিন এ্যাংলো সার্জেণ্টরা একদল ১০/১২ বছরের শিশুদের নির্মমভাবে পেটাচ্ছে দেখে আমি সহ্য করতে না পেরে এর প্রতিবাদ করেছিলাম। এতে প্রথমে আমাকে স্থানীয় ডেপুটি সাহেব ও পরে আমাকে কমিশনার টেগার্ট সাহেবের ঘরে পুটআপ করা হয়।

সাহেব চার্লস আমাকে তখুনি চিনলেন। তারপর ভ্রূকুটি করে আমাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। আমি দুয়ারের এপার হতে শুনলাম উনি মৃদুস্বরে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ওই বাঙ্গালী ঊর্ধতন পুলিশ কর্মীকে বলছেন, 'অফিসারদের টেমপারামেণ্ট বুঝে ঠিক লোককে ঠিক জায়গায় পোস্ট করতে পারো না কেন? ট্রান্সফার হিম টু জোড়াসাঁকো থানা।' এরপর আমাকে ফের ঘরেতে ডাকা হলে উনি আমাকে বলেছিলেন, 'ওয়েল, তুমি একটা ওয়েলাস হর্স। কিন্তু তোমাকে একটু ব্রেক করে নিতে হবে। ইউ মাস্ট ইমপ্রুভ ইওরসেলফ।'

ঐ কালে সামারারী কাউকে স্যাকড করতে হলে কমিশনারের ঘরে তাকে আনার রীতি ছিল। আমার জেঠামশায় রায়বাহাদুর কালিসদয় ঘোষাল তখন স্পেশাল-ব্রাঞ্চ পুলিশের এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার! একজন ট্রাস্টেড অফিসাররূপে উনি ছিলেন স্যার চার্লসের প্রিয় পাত্র। উপরন্তু উনি প্রথম জীবনে তৎকালীন বাংলা বিহার উড়িষ্যার (সংযুক্ত বাংলা প্রদেশের) ভাগলপুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজের নব নিযুক্ত ইংরাজ পুলিস সুপার ছাত্রদের ইনসট্রাক্টার ছিলেন। স্যার চার্লস টেগার্ট তখন ঐখানে তাঁর তরুণ কেডেট-ছাত্র।

আমার বিপদের বিষয়টি শুনে ভীত হয়ে উনি আমাকে আর একটা সুযোগ দেবার জন্য তাঁর পূর্বতন ছাত্র এবং এখনকার প্রধান টেগার্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করলে উনি জেঠামশায়কে ঘরোয়াভাবে একটা অদ্ভূত কথা বলেছিলেন ঃ

'দেখ কালি, গভর্মেণ্টের পলিসি আমার নিজেরও পছন্দ নয়। তবে ওই মত কাজ করতে হবেই। ওটা একটা এক্সপেরিমেণ্ট। তবে ফলাফল অনিশ্চিত। অমুক অমুক অফিসার মারকুটে। ওদের রিওয়ার্ডও দিতে হয়। তবে আমার মতে তোমার নেফিউ পঞ্চুর (পঞ্চানন) মত জনতার প্রতি সদয়ব্যবহারী অফিসারগণ সত্যকার ব্রিটিশ বন্ধু। ওর মতন জনপ্রিয় অফিসারদের জনতার প্রতি সদব্যবহারে যদি জনগন মুগ্ধ থাকে তাহলে ব্রিটিশ রাজত্ব আরও কয়েক শত বছর টিকে থাকবে। কারণ জনগণ পুলিশের সংস্পর্শে প্রথম আসে এবং ওদের ভালোমন্দ ব্যবহার দেখে গভর্মেণ্টকে বিচার করে থাকে। কিন্তু অমুক অফিসারের সংখ্যা বেশী হলে ব্রিটিশ রাজত্ব বেশিদিন টিকবে না। ওরা যাদের ঠেঙাচ্ছে তারা তো ব্রিটিশ বিরোধী হবেই। তাছাড়া যারা দূর থেকে ঐ ঠেঙানি দেখছে ও শুনছে, তারাও ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে যাচ্ছে।'

আমার জেঠামশায়ের মুখে শুনেছিলাম যে, চার্লস টেগার্ট ট্রেনিং কলেজে একজন দুরন্ত ছাত্র ছিলেন। একবার বাংলা শেখার ক্লাসে ছাত্রদের অনুবাদ করতে দেওয়া হয়েছিল—'হরিবাবু ও রতনবাবু গুড় দিয়া মুড়ি খাইলেন।' তরুণ টেগার্ট সাহেব ইচ্ছা করে এইরূপ অনুবাদ করেছিলেন—'গুড়বাবু এবং মুড়িবাবু রতনকে হরিবাবু দিয়া খাইলেন।'

ওই সব তরুণ ইংরাজ পুলিশ সুপাররা জানতেন যে, তাঁদের ওই ইনসট্রাক্টাররা সকলেই পদেতে ইনসপেক্টার ও সাব ইনসপেক্টার। পরে ও'দেরকে তাঁদেরই অধীনে কাজ করতে হবে। তাই ওই সব বাঙালী নিম্নপদী শিক্ষকদের পক্ষে ওনাদের কন্ট্রোল করা সম্ভব হত না। এতে সহানুভূতিশীল হয়ে ছাত্র টেগার্ট সাহেব আমার ওই জেঠামশাইকে বলেছিলেন—'আপনারা তো এখন আমাদের শিক্ষক। এমনি ঘটলে আপনি ছাড়া অন্যেরা আমাদের বকুনি দিতে সাহসী হন না কেন?'

এর উত্তরে জেঠামশায় ওঁদের যে কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন সেটি উনি মনে রেখে রিটায়ার করে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তাঁর লেখা আত্মজীবনীতে উদ্ধৃত করেছিলেন। ওইটি ওঁর স্মরণশক্তির প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা হলো—

'একটি ভারতীয় করদ রাজ্যের এক রাজকুমার পঠনকালে সিংহাসনে রাজছত্রের তলাতে বসতেন। তখন ওঁর গুরুমশাই ওই সিংহাসনের তলাতে হাঁটু গেড়ে বসে জোড়হাত করে বলতেন, 'মহারাজ, 'ক' বলিতে আজ্ঞা হউক।' এখানে আমাদের ও তোমাদের সম্পর্কটা তো ঠিক এইরূপ।'

মাত্র দুই মাস পরেই আমাকে বড়বাজার হতে জোড়াসাঁকো থানাতে বদলী করা হয়েছিল। কারণ ওটি মুশ্লীম অধ্যুষিত। ঐখানের হিন্দুরা সব রাজভক্ত ও ধনী। তাঁরা এই সব স্বদেশী আন্দোলনে থাকেন না।

বড়বাজারে একজনও মুশ্লীম পিকেটার আমি দেখিনি। শেষে সালেহ বক্স নামে এক মুশ্লীম এ্যাসিসটেন্ট সাবইন্সপেকটর এতে ক্ষুন্ন হয়ে ক্ষেপে গিয়ে মুশ্লীমদের ইজ্জত রাখতে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে পিকেটিং করে হাজতে গিয়েছিলেন। এটা স্পেশাল ঘটনা হওয়াতে টেগার্ট সাহেবের কাছে স্পেশাল রিপোর্ট গিয়েছিল। কিন্তু পরদিনই গান্ধী-আরউইন চুক্তিমত আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়াতে ওঁকে জেলে যেতে হয়নি।

টেগার্ট সাহেব সালেহ বক্স সাহেবকে ডেকে পাঠালেন ও রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদারকে বললেন, 'ক্যান দ্যাট ম্যান স্টে অ্যান্ড রি-কনসিডার্ড?' এতে সালেহ বক্স রাজী না হলে উনি ওঁকে বললেন, 'তোমার অতগুলো শিশুপুত্র কন্যা ও তোমার পর্দানসীন বিবির কি হবে?' ভদ্রলোক উত্তরে 'খোদা তাদের দেখবেন' বললে, টেগার্ট সাহেব টেলিফোন তুলে বি. এন. আর. রেলের এক সাহেবকে কিছু বললেন। তারপর একটা স্লিপে লিখলেন, 'এই ব্যক্তি পুলিশের কাজে অনুপোযুক্ত হলেও রেল কোম্পানীর কাজে উপযুক্ত হবে।' এরপর ঐ স্লিপটি সালেহ বক্স সাহেবকে দিয়ে বললেন, 'যাও, কালকে ওখানে জয়েন করো।'

সালেহ বক্স ততক্ষণে স্ত্রী-পুত্রের অন্নসংস্থানের চিন্তাতে অতিষ্ঠ। এখন তিনি

অনুতপ্ত। ঝোঁকের মাথায় ক্ষেপে গিয়ে ওই কাজ করেছিলেন। এখন তিনি আরও বেশী মাহিনার এক নিঝ'ঞ্ঝাট চাকুরী পেয়ে মহা খুশী। স্যার টেগার্টের চরিত্রের এই দিকটা দেখে আমরা সকলেই সেইদিন স্তম্ভিত ও ঈর্ষান্বিত হয়েছিলাম।

প্রায়ই দেখা যেত যে, ভারতীয় অফিসারদের প্রতিবেদনে চার্লস টেগার্ট ইংরাজ কর্মীদের ডান হাতে কলম ধরে ডিসমিস করে বাম হাতে টেলিফোন তুলে তাকে কোনো মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি করে দিয়েছেন। কিন্তু স্বজাতিবোধজনিত ওদেরকে ক্ষমা করে পুলিশের ডিসিপ্লিন নষ্ট করেননি।

টালিগঞ্জে ঢাকুরিয়া-লেক তৈরী হলে কিছু তরুণ-তরুণী ওখানে নিভৃতে প্রেম করার কালে পুলিশের কিছু কর্মী মওকা লুটতে ও ঐ সুযোগে কিছ উপরি করতে তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে থাকে। স্যার চার্লস সব শুনে ও জেনে ওই পুলিশ কর্মীদেরকে কঠোর দণ্ড দিয়ে হুকুমনামাৎ দিয়ে বলেছিলেন—'পুলিশের কাজ শান্তি রক্ষা, সমাজ সংস্কার করা নয়। ওসব সমাজসেবীরা দেখুক। পুলিশ বরং দেখবে যে, ওই সব তরুণ-তরুণীরা গুণ্ডাদের দ্বারা নিগৃহীত না হয়।

কিছু আটক-হওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামী বাঙ্গালী বিপ্লবীদের অভিযোগ নিজে শুনতে টেগার্ট সাহেব একবার ওদের তাঁর ঘরে আনতে বললেন। ওঁদের সেখানে এসকর্ট করার ডিউটিতে আমাকে পাঠান হয়েছিল। ওখানে ওঁদের সঙ্গে কথোপকথনের কিছু উল্লেখ্য অংশ উদ্ধৃত করা হলো—

টেগার্ট সাহেব বললেন, 'আমি যেমন আমার দেশকে ভালোবাসি, তেমনিভাবে তোমরাও তোমাদের দেশকে নিশ্চয় ভালোবাসো। মানুষ হিসাবে আমি এতে খুশী। কিন্তু ভ্রান্ত দেশপ্রেম পাগলামী। বাঙ্গালীরা, আমি বলবো বাঙ্গালী হিন্দুরা, ১৯০৫ সনে একটা আন্দোলনে নামলো। তার ফলে রাজধানী কলিকাতা হতে দিল্লীতে গেল ও সেই সাথে তারা হিন্দুবাঙ্গালী মেজরিটির জেলা পুরুলিয়া, পুর্ণিয়া, মানভূম, ধলভূম ও সিংভূম হারিয়ে বাংলাদেশ অর্থাৎ নিজ প্রদেশে মাইনরিটি হলো। এবারের এই দ্বিতীয় মুভমেণ্টে তোমাদের মিঃ সি. আর. দাশ মুশ্লীমদেরকে দলে টানতে বললেন, তোমাদের আমি শতকরা ৫২ ভাগ চাকুরী দেবো।' কিন্তু চাকুরী দেবার ক্ষমতা তো এখনও ব্রিটিশের হাতে। মুশ্লীমদের দেশপ্রেম না জাগিয়ে তাদের লোভ ও স্বার্থবোধ জাগানো হলো। এই সুযোগে আমরা বললাম, 'আরে, বাহান্ন ভাগ কেন? আমরা মুশ্লীমদের শতকরা ৮০ ভাগ চাকুরী দেব। উপরন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এনে তোমাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন দিয়ে হিন্দুদেরকে তোমাদের অধীন করে দেব। ব্যস! মুশ্লীমরা ব্রিটিশদের পক্ষে চলে এলো। উৎকোচ দিয়ে কাউকে দেশপ্রেমী করা যায় না।

তোমরা গাঞ্জির (গান্ধীর) নির্দেশে আইন ভেঙে মাত্র দশ সের নুন তৈরী করে ফিরে এসে দেখলে পুরুষদের অবর্তমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে তোমাদের বহুজনের গৃহ দগ্ধ ও লুণ্ঠিত ও নারীরা নিগৃহীতা। এর পরেও হয়তো আরও একটা মুভমেণ্ট আসবে। তাতে কিন্তু তোমাদের এই সোনার বাংলা খান খান তিনখান হবে। তাই

বলি এই যে, তোমরা ঠাণ্ডা মাথায় এই আত্মধ্বংসী রাজনীতির পাগলামি ত্যাগ করে অন্য কিছু উপায় ভাবো। তোমাদের ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের বিষয়ও চিন্তা করো। যাঁরা সুমুখের একশত বৎসর দেখতে পান, তাঁরাই সত্যকার দেশপ্রেমিক ও রাজ-নীতিবিদ। ইতিহাস পড়ে দেখ, কোনো মুশ্লীম রাষ্ট্রে আজও কোনো অ-মুশ্লীমদের স্থান হয়নি। হঠাৎ ব্রিটিশরা এদেশে এসে না পড়লে তোমাদেরও এতদিনে তাই হতো। তাই বলে যে নীতি বিহারে, মহারাষ্ট্রে, দাক্ষিণাত্যে ও উত্তরপ্রদেশে চলে তা মুশ্লীম লীগ পার্টির বাংলা ও পাঞ্জাবে চলবে না। বরং আধাআধি বা তার চাইতে বেশি ভূমি দিয়ে ফের বাংলা ভাগ করে নাও।'

চার্লস টেগার্টের এই কথা শুনে জনৈক তরুণ বিপ্লবী ক্রোধে ফেটে পড়ে বললেন, 'ওসব কু-পরামর্শ শুনতে এখানে আমরা আসিনি। এর জন্য তো আপনাদেরই ভেদনীতি দায়ী।'

প্রত্যুত্তরে স্যার টেগার্ট তাঁদেরকে বললেন, 'বাপু, এটা তোমাদেরই শাস্ত্র পড়ে আমরা শিখেছি। তোমাদের ব্রহ্মা এটার স্রষ্টা। উনি নিজের গদি ও ক্ষমতা রাখতে একবার দেবতাদের এবং অন্য একবার দানবদের পক্ষে কথা বলে তাঁদের উভয়কে নিয়ত লোভ দেখাতেন। তোমাদের চাণক্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে এই ভেদনীতি তৎকালীন প্রশাসকদের অবশ্য শিক্ষনীয় করেছিলেন। আমাদের নিজেদের স্বার্থ আমরা নিশ্চয়ই দেখবো। ইংরাজরা হিসেব করে কাজ করে, তোমাদের মত পাগল নয়। প্রয়োজন হলে ব্রিটিশরা ঠিক সময় তোমাদের বেইমানির প্রতিশোধ নিয়ে এই দেশ ছেড়ে চলে যাবে।'

'হ্যাঁ, তা জানি'—একজন বিপ্লবীর উত্তর: 'ভূত ছাড়লে যাবার আগে কিছু ক্ষতি হবে।'

এর উত্তরে টেগার্ট সাহেব বললেন, 'কিন্তু আমরা যদি যাই তো বাইরের চাপে যাবো, তোমাদের চাপে নয়। এ বড় বিচিত্র দেশ। একবার কেউ এদেশ জয় করতে পারলে তাদের হটানো শক্ত। এখানে—দেশবালীদের দ্বারা বাঙ্গালীদেরকে, শিখদের দ্বারা দেশবালীদেরকে, গুর্খাদের দ্বারা শিখদেরকে এবং মারাঠী বা দাক্ষিণীদের দ্বারা গুর্খাদেরকে অনায়াসে দমন করা যায়। কারণ তোমরা কেউ দেশকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভালবাস না। তোমাদের অধিকাংশ লোক ক্ষমতাকে ও অর্থকে ভালবাসে। তোমাদের স্বকীয় জীবনে নিজেদের সুখভোগের বিষয় ভাবো। কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্য তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। আমরা কি তোমাদের অনেক উপকার করিনি?'

'না। কিচ্ছু করেন নি। শুধু অর্থনৈতিক এক্সপ্লয়েট করেছেন'—একজন বিপ্লবী তরুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিলেন।

এতে স্যার টেগার্ট হেসে বললেন, 'তা হয়তো সত্যি। কিন্তু পাল্লাটা কোন দিকে ভারী? সম্রাট অশোক, আকবর বা শিবাজী যা পারেন নি, তাই আমরা তোমাদের জন্যে করেছি। অর্থাৎ সমগ্র ভারতকে আমরা একসূত্রে বেঁধে দিয়েছি। ভারতের সীমানার একটুকু জমিও বাইরের কাউকে বেদখল করতে দিইনি।

'একটা দেশীয় সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী ও সুষ্ঠু প্রশাসন তোমাদেরকে গড়ে দিয়েছি। এই যে তোমাদের স্বাধীনতাবোধের চেতনা তাও আমাদেরই দান।

'যে বেদের জন্য তোমাদের এত গর্ব', সেই প্রায়-লুপ্ত বেদ তো ইংরেজ পণ্ডিতরাই পুনরুদ্ধার করে দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর এইগুলো ঠিকভাবে রক্ষা করতে পারবে তো ?

'তোমরা—অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দুরা এক-একটি অন্দোলনে নামবে কিন্তু তাতে সমগ্র ভারত এগুলেও তোমরা পিছুবে এবং হয়তো, গড সেভ ইউ, পুরোপুরি লুপ্ত হবে। মুশ্লীম বাঙ্গালীরা ঠিক পথে থাকাতে মাত্র ওরাই শেষপর্যন্ত বাঙ্গালী থাকবে।

এতোকাল আমরা তো হিন্দুবাঙ্গালীদের মাথায় করে রেখে উভয়ে একত্রে ভাগাভাগি করে ক্ষমতা দখলে রেখেছিলাম। তোমরাই তো—জান, প্রাণ, মান ও ধন বাঁচাতে এখানে ব্রিটিশদের ডেকে এনেছিলে।'

স্যার চার্লস টেগার্ট এস্-বি এবং আই-বি নামক বিপ্লবী দমনার্থে গোয়েন্দা বিভাগের স্রষ্টা। আমার জেঠামশায় রায় বাহাদুর কালিসদয় ঘোষাল এবং রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদার ওঁর সহায়ক ছিলেন। তাছাড়া টেগার্ট সাহেব দুইজন সংস্কৃত পণ্ডিতের নিকট চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের পাঠ নিতেন। মৌর্য গুপ্তচর প্রথার বিষয় পাঠ নিয়ে ওই ছাঁচে উনি রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগ তৈরী করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তবে উনি অনেক আটক বিপ্লবীদের প্রায়ই বলতেন, 'বাপু তোমরা অযথা কিছু পুলিশ ও সরকারী দেশীয় ও ইংরাজ অফিসারকে খুন করছো। গুরুমশায় মরলে অন্য গুরুমশায় আসবে, কিন্তু বাবা মরলে বাবা আসবে না। এই বাবাকে মারার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এখনও কামান বন্দুক সজ্জিত দুর্ধর্ষ ভারতীয় রাজভক্ত দেশীয় সৈন্যেরা ব্রিটিশের রাজভক্ত ও অনুগত। এত বড় শক্তির কাছে তোমাদের কয়েকটা পটকা ও পিস্তল তুচ্ছ। যুদ্ধেও তো আমরা বহু সংখ্যাতে মরি ? তবে গান্ধী-আন্দোলনকে আমরা ভয় করছি, কারণ এতে সমগ্র জনগণের জেগে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

স্যার চার্লস টেগার্ট যে ওই সব বিপদগামী বিপ্লবীদের যথেষ্ট করুণার চক্ষে দেখতেন তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। উনি ওঁদের মধ্য হতে বহু তরুণকে সরকারী অর্থে উচ্চশিক্ষার্থে ইউরোপে পাঠিয়েছেন। জেলেতে বসে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দেবার সুযোগ তিনি দিয়েছেন আটক-বিপ্লবীদের জন্য।

আটক থাকাকালে বিপ্লবীদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য সরকারী অর্থ ব্যবস্থাও করেছেন। মুক্তির পরে ওঁদের ব্যবসার জন্য সরকারী অর্থ প্রদানের ও সাহায্যের রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। এমন কি ওঁদের শিল্পশিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা নিকেতন স্থাপন এবং ওঁদের ব্যবহারের জন্য বিদেশে হতে বহু মূল্যবান যন্ত্রাদিও উনি আনিয়ে দিয়েছেন।

তবে চার্লস টেগার্ট একটি দারুণ অন্যায় কাজের প্রবর্তক। ঐ সময় বাঙ্গালী দেশপ্রেমী বিপ্লবীরা দুইটি পরস্পর ঈর্ষান্বিত দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। যথা—

(১) অনুশীলন সমিতি ও (২) যুগান্তর সমিতি। একদলের কেউ একজন সাহেব মারলে বা ডাকাতি করলে অন্য দলের একজনকে ঐরূপ এলেম দেখাতে তখুনি অনুরূপ একটা কাজ করতে হবেই। এই সুযোগে স্যার টেগার্ট ওঁদের একটি লোককে ধরতেন না বা ধরলেও তাঁকে জামিনে ছাড়তেন। কিন্তু অন্যদলের লোকদের ধরলে তাঁদের মুক্তি নেই। উপরন্তু তাঁদেরকে বেশি গ্রেপ্তার করা হতে থাকে। এই বৈষম্য হেতু এক দলের সন্দেহ হয় যে, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী দল হতে সংবাদ দেওয়া হয়ে থাকে। এতে ওরা একই পথের পথিক হতে ইচ্ছুক হয় এবং উভয়ের বিবাদ চরমে পেঁছিয়ে যায়।

এই উপায়ে ও অন্য উপায়ে এবং বহু লক্ষ লক্ষ টাকা 'সোর্সমানি'র অর্থ ব্যয় করে ওদের সদস্যদের মধ্যে হতে পুলিশকে খবর দিতে গুপ্তচর সংগ্রহ করার ব্যবস্থা উনি করেছিলেন। অনুরূপভাবে কংগ্রেসীদেরও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে হতে গুপ্তচর সংগ্রহ করে ওঁদের মধ্যে বিভেদ আনতে এবং ওঁদের বিষয়ে অগ্রিম খবর জানতে সচেষ্ট হন।

এইভাবে টেগার্ট সাহেব বাংলার বিপ্লবী দমনে সক্ষম হওয়াতে উনি 'স্যার' উপাধি পান।

রিটায়ার করার পর ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট ওঁকে প্যালেস্টাইনের ইহুদী ও আরব, পরস্পর বিরোধী বিপ্লবীদের দমনের জন্য নিযুক্ত করেন। এজন্য উনি ওই আরব ও ইহুদিদের মধ্যে একটি দেওয়াল 'টেগার্ট ওয়াল' তৈরী করেছিলেন। কিন্তু ইহুদি বিপ্লবীরা ওটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেন। এর ফলে ইহুদিদের ইজরায়েল রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ টেগার্ট স্বয়ং এর ম্যানুপুলেটার ছিলেন।

স্যার চার্লস টেগার্টের ইচ্ছা ছিল এই যে, (এটি গোপন প্রতিবেদন) পূর্বতন যুগের বাঙালীদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এককালে ভারতের সর্বত্র বড়সাহেব বলতে একজন ইংরাজকে ও ছোটসাহেব বলতে একজন বাঙ্গালীকে বুঝাতো। বস্তুতঃ পক্ষে ইংরাজরা হিন্দু বাঙ্গালীদের সাহায্যে ভারতে প্রথম প্রশাসন স্থাপন করেছিলেন।

এজন্য উনি বাংলাদেশকে সমানভাবে হিন্দু ও মুশ্লীমদের ভাগ করে দুইটি পৃথক প্রদেশ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁর ধারণায় সাম্প্রদায়িকতা একটি ঐতিহাসিক বীজ। মেটেরিয়াল ওতে আছে বলেই সহজে ওটা জাগ্রত করা যায়। মুশ্লীমরা তাদের হিন্দু-পূর্বপুরুষত্ব না বুঝা পর্যন্ত এটা থাকবেই।

ওঁর মতে মুশ্লীমরা কিছুকাল পৃথক থাকলে পরে উভয় সম্প্রদায় ধর্মের কৃত্তিম-খোলস ছেড়ে মডার্ন হয়ে এককালে বাঙ্গালীরূপে ফের এক হতে পারবে।

যাই হোক, ভারত ত্যাগের (১৯৩২) আগে উনি আমাকে ইনচার্জ-অফিসার করে বলেন যে, তাঁর আশা ভবিষ্যতে আমি ডেপুটি-কমিশনার (আই. পি) হতে পারবো।

পরিশেষে জানাই—চার্লস টেগার্টের একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি ওঁর গাড়িতে বসে লেজ তুলে থাকত। কিন্তু ওই ল্যাজ নামালেই টেগার্ট সাহেব বুঝতেন সম্মুখে

বিপ্লবীদের ফাঁদ পাতা আছে। তখন উনি গাড়ি ঘুরিয়ে অন্য পথে অফিসে যেতেন। এইভাবে বহুবার ও'র জীবন রক্ষা পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ওই কুকুর ও'র আগে মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলতো।

এই সময় গুজব রটেছিল, টেগার্ট সাহেব ছদ্মবেশে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। আমি যতটা জানি উনি ঐরূপ কিছু করতেন না। অফিসে বসেই ও'র পুলিশী কর্তব্য পালন করতেন।

চার্লস টেগার্ট বহুবার এখানকার আততায়ীদের হাত এড়িয়ে পরে স্বদেশে ৯৮ বৎসর বয়সে মারা যান।

পঞ্চম অধ্যায়

গান্ধী আরউইন চুক্তির পর, এখন শহর পুরাপুরি শান্ত। আমার অফিসর'রা আত্মীয়দের বাড়ীতে নিমন্ত্রণেতে যেতে সময় পায়। থানা থেকে বেরিয়ে থিয়েটার ও সিনেমাতে যায়। কিন্তু উর্ধতন বা বহুকাল সাম্রাজ্য রক্ষাতে ব্যস্ত থেকেছে, এমন তদন্তকারী বহু কর্মী ফের উৎকোচ গ্রাহক ও উৎপীড়ক। কংগ্রেসী আইন ভঙ্গকারীদের উপর এতদিন তারা ব্রিটিশদের খুশী করতে ও ঐ প্রমোশন পেতে অমানুষিক অত্যাচারে অভ্যস্ত। এই মারকুটে স্বভাব তারা তক্ষুণি ত্যাগ করতে পারে নি। কিন্তু ব্রিটিশরা রাশ যেমন আলগা করতে জানে, তেমনি তারা প্রয়োজনে তা টেনে ধরতেও জানে।

এতো দিন ওরা থানাতে সিঁদেল চোরের দ্বারা সর্বস্বান্ত হয়ে থানাতে এজাহার দিতে এলে ওরা চীৎকার করে বলেছে 'যাও তুমহারা গান্ধী মহারাজকো পাস। অল অর্ডিনারী ওয়ার্ক সাসপেণ্ডেড। খালি পিকেটারদের ও আইন আন্দোলন-কারীদের ধরো আর ঠেঙাও। কিন্তু এখন ওরাই বললেন 'এ্যাট ইলেবেন্তে—এতো ক্রাইম বাড়ছে কেন'? কিন্তু এর উত্তর দেবার সাহস কারুর নেই।

ওদের প্রথম চোট পড়লো বড়বাজার থানার মালখানার ওপর। কারণ শীঘ্রই এই থানাকে এর পুরাতন ভাড়া করা বাড়ি হতে রাস্তার ওপরে **P. W. D.** হতে তৈরী নূতন সরকারী বাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ওই কাজে ঐগুলো দেখা গেল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় হতে ওখানে বহু বাতিল ও নিষ্প্রয়োজনীয় নথীপত্র জমা রয়েছে। নূতন নথীগুলো রাখবার স্থানাভাব। অতএব হুকুম এইগুলি আগুনে পোড়াও। আমি অবাক হয়ে সেদিন দেখেছিলাম যে বাইরে বার করে আনা পুরনো নথীপত্রগুলি বাংলাতে লেখা। কিছু ওড়িয়া ও হিন্দীতে লেখা, কিন্তু পুরোনো নথী ও ডায়েরীগুলির একটাও ইংরাজীতে লেখা নয়।

[বিঃ দ্রঃ—ওই সব ডাইরী পত্র তথা স্মারক লিপি, অভিযোগবহি ও অন্য কিছু বাঁধানো নথীগুলি আমি দেখেছিলাম। বিগত দুইশত বৎসর যাবৎ থানাগুলিতে যাবতীয় কাজ-কর্ম তাহলে বাংলা ভাষাতেই হতো। আমার চোখের সম্মুখে বিগত দুই শত বৎসরের ইতিহাস ওরা পুড়িয়ে ছাই করে দিলো। আমাকে অসহায় ভাবে তা দেখতেও হলো। তবু আমি ওইগুলি হতে বাংলা অক্ষরে লেখা দুইখানি অভিযোগবহি অলক্ষে সরিয়ে নিতে পেরেছিলাম। বর্তমানকালীন আইন, আদালত সম্পর্কিত ইংরাজী পরিভাষা অপেক্ষা তৎকালীন ওইগুলির অনুক্রমিক বাঙলা পরিভাষাগুলি আরও বেশি বোধগম্য ও শ্রুতিমধুরও বটে। জনৈক পেনসনভোগী পুলিশ কর্মীকে ওগুলো আমি দেখালাম। উনি বলেছিলেন যে ১৯০২ খ্রীঃ পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের যাবতীয় কাজকর্ম বাঙলা ভাষাতেই হতো। তবে ওটা থানার

জন্য। একজন ইংরাজীনবীশ নামে কর্মী বহাল ছিলেন। উনি ঐ সব বাঙলাতে লেখা ডাইরীর ও রিপোর্টগুলির উল্লেখ্য ও প্রয়োজনী অংশ ইংরাজীতে তর্জমা করে বিভাগীয় ইংরাজ পুলিশ সুপারদের পড়ার জন্য পাঠাতেন। ঐ অবসর প্রাপ্ত পুলিশ কর্মীর পিতাও একজন এই শহরের থানাদার ছিলেন। ঐ সময় ডেপুটি কমিশনের পদ সৃষ্টি হয় নি। তখন শহরের প্রতিটা বিভাগে একজন করে ইংরাজ পুলিশ সুপার বহাল ছিল। উনি আমাকে তখন আরও বলেছিলেন যে ১৯১০ খৃঃ যাবৎ একটু একটু করে থানার কাজ-কর্মের ইংরেজীকরণ সম্পূর্ণ হয়।

[বিঃ দ্রঃ—আমি আজ অবাক হয়ে ভাবি ১৯০০ খৃঃ পর্যন্ত থানার যাবতীয় কাজকর্ম বাঙলাতে হতো। ওটাকে ইংরাজীকরণ করতে ১৯০৮ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তাহলে—স্বাধীনতার এত বৎসর পর ঐ সব কাজ পুনরায় বাঙলাতে করতে বাধা কোথায়।]

উপরোক্ত বাঙলা, উড়িয়া, হিন্দী ও পাশীর্তে লেখা নথীপত্র এবং ঐগুলি পোড়ানোর পূর্বে, ইংরাজীনবীশ কর্মীর দ্বারা ঐগুলির অংশ বিশেষের তর্জমা গুলি হতে আমি কিছু নোট লিখে নিয়েছিলাম। থানার জনৈক মুশ্লীম কর্মী উদুর্ ও পাশী লেখাগুলি পড়ে আমাকে শুনিয়েছিল। ঐসব তথ্যগুলি আমার লেখা দুইখণ্ডে পুলিশ কাহিনী, এবং দুই খণ্ডে ভারতের প্রশাসনিক ইতিহাস বই কয়টিতে ব্যবহার করেছি। তবে তৎকালে গোপনে দুইখানি বাঙলাতে লেখা পুরাতন অভিযোগবহি আগুনের কবল হতে রক্ষা করাকে নিশ্চই চুরি কেউ বলবেন না। যাইহোক ঝাড় পোঁছ করে এবার থানা বাড়ীটা স্বাভাবিক উপযোগী এতদিন পরে করা হয়েছে। এইবার আমার বারনারী ও পকেটমার মামলাগুলি তদন্ত করার সময়ও পেয়েছি। আমি এখনও পুলিশে শিক্ষানবীশ। কাজকর্ম শেখার আগ্রহ আমার তখন বেশী। আমি ধরা পড়া বা ধরে আনা কয়েদীদের সঙ্গে ভাব জমাতাম। তারা কিভাবে ও কেমন করে চুরি করেছে, এই সব জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে তাদেরকে আমি আরও জিজ্ঞাসা করতাম যে, তারা কেন ও কেমন করে চোর হলো। এই শেষের প্রশ্নটা শুনে তারা কৌতুহলী হয়ে উঠে, আমাকেও পাল্টা প্রশ্ন করতো যে আমি কেন পুলিশে কাজ নিলাম। এই ভাবে ওদের বহুজনের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। স্বাধারণতঃ গভীর রাত্রে থানা বাড়ির উপরের কোয়ার্টার হতে নেমে অফিসে ওদের লক্-আপ হতে বার করে এনে ওদের সঙ্গে গল্প করতাম ও ওদের কাছ হতে বহু কিছু জানতাম ও শিখতাম।

একবার সরযু তেওয়ারী নামে এক সিঁদেল চোরকে বাড়ীর লোকেরা ও তাদের পড়শীড়া হাতে নাতে ধরে থানাতে আনলো। অন্য অফিসাররা ওর তদন্তভার আমার ওপর রাখলো। কিন্তু তখনও আমি সুষ্টু ভাবে ডাইরি লিখতে শিখিনি। ওদের বারে বারে সাহায্য করতে বললাম। কিন্তু ওঁরা তখন নিজেদের ডাইরী লিখতে ব্যস্ত। ঐ পুরনো পাপী আমার কাছে তখনও দাঁড়িয়ে, তার বিবৃতি আমি লিখবো। সে আমার সহকর্মীদের আমার প্রতি এই অসহযোগিতা লক্ষ্য করছিল। সে এবার

আমার কাছে একটু এগিয়ে এসে বললো, 'হুজুর সাহেব এহী মামলা আপকো হাঁতোমে পহেলী মামলা, ঠিক হ্যায়। ঘাবড়াইয়ে মাৎ। এই দেশ মে এহী কাম, আদালতমে এ-এস্কার অর্থাৎ সহী কর পর লেগা।' হ্যামে এভি কহে দেতা তে আপ কমিশনার ইয়ে ডেপুটি বানকে পিনসন লেগী। আউর বহুমে আপকো প্রমোসন আউর নাম ভি হোগী'। ঐ পুরোনো পাপী সরযু তেয়ারী তার কথা রেখেছিল। তাকে আদালতে উপস্থিত করা মাত্র সে প্রথমেই তার অপরাধ স্বীকার করে জেলে গিয়েছিল। কিন্তু তার ঐ কথা গুলোও সত্য হয়েছিল, কারণ পুলিসে উচ্চতম পদ হতেই রিটায়ার করেছি, আর ঐ মামলাটাই ছিল আমার প্রথম তদন্তকৃত সিঁদচুরীর মামলা। ঐ সময় আরও বহু চুরী হওয়া দ্রব্য বামাল গ্রাহক খাউ'দের ডেরা হতে উদ্ধার করতেও সাহায্য করেছিল। এজন্য গভর্মেণ্ট হতে এর দ্বারা করা ১০টী পূর্বতম মামলার কিনারা করার জন্য ২০০ টাকা পুরস্কারও পেয়েছিলাম।

এরপর হতে আমি এইসব পুরানো পাপীদের প্রতি আরও আগ্রহী হয়ে উঠি। পরে ওদের কয়জনের নিকট হতে পাওয়া খবর মত ওদের গোপন ডেরা হতে বহু সিঁদেল চোরদের গ্রেপ্তার করাতে বড়বাজারের ক্রাইমের সংখ্যা কমে যায় ও তাতে সকলে আশ্চর্যও হয়। আমার সার্ভিস বুক লাল কালিতে লেখা রিওয়ার্ডে ভরে যেতে থাকে। আমি দুই মাসের মধ্যেই একজন করনারী এক্সপার্ট রূপে স্বীকৃতি লাভ করলাম।

এই সময়ে এক সন্ধ্যাতে এক ভদ্রলোক থানাতে এসে হুমড়ী খেয়ে মেঝেতে বসে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তিনি তার মেয়ের বিয়ের জন্য দশহাজার টাকা বেনারস ব্যাঙ্ক হতে তুলে গৃহে ফিরছিলেন। বাসেতে তাঁর পকেট কেটে কেউ তা উধাও করেছে। জনৈক সহকর্মী তামাসা করে আমাকে বললেন ওহে ঘোষাল সিঁদমারীতে তো হাত ভালই পাকিয়েছ। এইবার এই পকেঠমারা মামলাটা নিয়ে আর একটা খেল দেখাও।

কিন্তু ঐ ভদ্রলোকটিকে নিয়ে হলো অন্য এক বিপদ। উনি এক সাব ডেপুটি পাত্র যোগাড় করেছিলেন। কিন্তু টাকাটা ফিরে না পেলে তার চামার বাপ এই বিয়ে নাকচ করে দেবে। স্তোত বাক্য দিয়ে শান্ত করতে আমি তাকে আমার বংশ পরিচয় ও আর্থিক অবস্থা বলে ওকে বললাম দেখুন এই টাকা উদ্ধার করতে না পারলে আমি বিনা পনে আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী। ভদ্রলোক এইবার সোল্লাসে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন।

ওর সঙ্গে তদন্ত সেরে ওঁকে ওর বাড়ীতে পেঁাছিয়ে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ। ওঁর মেয়েটি খুবই সুন্দরী,—। ও শিক্ষিতা। এই জন্য ডেপুটি পাত্রের পিতা পছন্দও করেছিলেন। আমারও ওই মেয়েটিকে খুবই পছন্দ হলো। তদন্ত কতদূর এগুলো সে সম্পর্কে খবর দিতে ওদের বাড়ীতে কয়দিন অন্তর গিয়েছি। ঐ মেয়েটির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্পও করেছি। ততক্ষণে তার মা আমার জন্যে জলখাবারের লুচি ভাজতে যেতেন। কিন্তু সেই ডেপুটি পাত্রের পিতাও ফোনে টাকাগুলো

উদ্ধার হলো কি না সেই সম্পর্কে আমাকে ডাকা ডাকি করে খোঁজ নেন। আমি বুঝলাম যে ঐ টাকা আমি উদ্ধার করলে ঐ মেয়েটি পুরোপুরি ওদেরই হবে।

আমার তখন এমন একটা বয়স যে বয়সে প্রথম যে মেয়েটাকে দেখা যায় তাকেই তখন ভালো লাগবে। মনে মনে ঠিক করলাম যে ধেৎ! কে করবে টাকা রিকভারী। কিন্তু এর আগেই আমাকে খুশী করতে আমার ভাব করা বন্ধুরা কাজে নেমে পড়েছে। আমার ইনফরমারদের দেওয়া সংবাদ কর্তৃপক্ষকে আমি যথারীতি পাঠিয়েছি। ওই দিকে ঐ ডেপুটি পাত্রের জজ পিতা আমাদের বড়সাহেবকে ওই টাকা রিকভারী করার জন্য সুপারিশ করেছেন। প্রত্যুত্তরে উনিও ওঁকে আশ্বস্ত করে বলেছেন যে যোগ্য পাত্রেই তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে।

মনের মধ্যে তখন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সরকারী কর্তব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধেছে। সেদিন সোজাসুজি ঐ মেয়েটাকে তার বাড়িতে একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম টাকাটা রিকভারী হবার পর আর হয়তো আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। তাতে ঐ মেয়েটি কেঁদে ফেলে বলেছিল, কেন অতো কষ্ট করছেন। টাকার আমাদের দরকার নেই। এর মধ্যেই ওর বাবা সেখানে এসে পড়াতে আমাদের কথা বন্ধ হলো। কিন্তু ওই মেয়েটার মার'ও আমাকে পছন্দ। পরে শুনেছিলাম এই বিষয়ে ওর বাবা ও মায়েতে প্রায়ই কলহ হয়েছে। তবে মেয়েকে আমার সঙ্গে অতো কথাবার্তা বলতে দেওয়া ওর বাবার একটুও পছন্দ নয়। তবে টাকা রিকভারী না হওয়াতে উনি আমাকেও একটু কাছাকাছি রাখতে চাইছিলেন। দূর হতে ওর পিতার কিছু কথা কানে আসতো। ক্ষুব্ধ মনে থানাতে ফিরতেই আমার পুরানো পাপী বন্ধুটি থানাতে এসে আমাকে জানালো যে সে এক্ষুনি আমাকে ঐ পলাতক আসামীর কাছে নিয়ে যাবে আর বামাল কোথায় সে একটা কৌটিতে করে পুঁতে রেখেছে তাও সে তার কাছে হতে শুনেছে ও জেনেছে। আমার পা দুটো তখন এতো ভারি যে সুমুখে একটুও এগুতে পারি না। কিন্তু ঐ পুরানো পিক পকেট বন্ধু বারে বারে তাগিদ দেয় ও বলে 'বাবু দেরি করলে খবর হয়ে যাবে। এক্ষুনি আমার সঙ্গে চলুন। এক্ষুনি, হ্যাঁ আসামী আমি পাকড়াও করে তার বিবৃতি মত পুরো দশ হাজার টাকাই উদ্ধার করে ক্ষুন্ন মনে থানাতে ফিরে এসেছিলাম।

এতো বড়ো একটা সুসংবাদ তখুনি বড় সাহেবকে ফোনেতে জানালাম। কিন্তু তখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে বড় সাহেব তক্ষুনি ঐ খবরটা সেই পাত্রের পিতা সাবজজ অফিসারকে জানিয়েছেন, ও সেই খবর পেতে সেটা তার ভাবী বেয়াইকে জানাবার জন্যে উনিও তার বাড়ীর দিকে মোটর হাঁকিয়েছেন। বড় সাহেবের হুকুম ছিল তক্ষুনি টাকাটা নিয়ে ওর মালিকের হেপাজাতে রেখে এসো। এতে অবশ্য আমি মহাখুশী। তাহলে আমি এক্ষুনি ওটা নিজে হাতে ঐ মেয়েটার হাতেই তুলে দেব।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে ঐ টাকা সমেত আমিও ওদের বাড়ীতে ছুটলাম। ঐ মেয়েটাকে বাড়ীর দরজার মুখে একলাটি পেয়েছিলাম। তার মা ও বাবা তখন ওদের ঘরের মধ্যে। টাকাটা দেখে মেয়েটি আঁতকে উঠে অঝোরে কেঁদে মুখ ঢেকে শুধু একবার

না না শব্দ উচ্চারণ করলো ও তার পর সে তার পড়ার ঘরে চলে গেল। এর একটু পরেই সেখানে সেই ডেপুটি পাত্রের পিতা তার ভাবী বেয়াইকে কনগ্রাচুলেট করতে ঐ বাড়ীতে ঢুকলেন। আমাকে দেখে উনি আমার পিঠ্ চাপড়ে বললেন গুড্! গুড্!! মাই ল্যাড, আমি তোমার এই ভালো কাজের জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার স্বরূপ কালই পাঠাবো।

এরপর আর ওখানে একটুও অপেক্ষা করা যায় নি। ভদ্রলোক বোধ হয়, আমার সঙ্গে ওর ফের দেখা হওয়াটা অপছন্দ করছিলেন। তাই কোনও নিমন্ত্রণ পত্রও আমাকে পাঠান নি। আমি কিন্তু আমার মনের কোনও ইচ্ছা তাঁকে বা তাঁর মেয়েকেও বলিনি। কিন্তু তা সত্বেও মেয়েটি সব কিছুই বুঝেছিল ও জেনেছিল। কারণ মুখের মত চোখেরও একটা ভাষা নিশ্চয়ই থেকেছে।

[বিঃ দ্রঃ—এর বেশ কয়েক বৎসর পরে এক নিমন্ত্রণ বাড়িতে একটি মেয়েকে দেখে চেনা-চেনা মনে হলো। তার সিঁথিতে জ্বল জ্বল করছে নিষেধের লাল নিশান। মাথাতে তার টক টকে লাল সিঁদুর। সেই আমাকে চিনে আমার কাছে এসে বললো, দেখুন, আপনার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। আমরা বদলী হয়ে এখন কলকাতাতে। আমাদের বাড়ীতে ফোন আছে। আপনি কোন থানাতে আছেন তা আমি জানি। কাল বা পরশু বেলা দুটার সময় ফোনের কাছে থাকবেন। আমার আপনাকে কিছু বলবার আছে। এরপর হঠাৎ একদল মহিলা সেখানে এলেন। আর ঐ মেয়েটি ওদের ভীড়েতে হারিয়ে গেল। পরের দিন এবং আরও কত দিন সব কাজ ছেড়ে দুপুর বেলা আমি থানার ফোনের কাছে উদগ্রীব হয়ে বসে থেকেছি। কিন্তু কোনও দিনই তার কাছ হতে কোনও ফোনই কখনও পাইনি।

শেষে বিরক্ত ও সেই সাথে ব্যথিত হয়ে একটি উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলাম। ওই বইটির নাম পকেটমার : তাতে ঐ তদন্তরীতি ও সেই সম্পর্কে পকেটমারদের বিষয়লব্ধ অভিজ্ঞতা ও শেষ-মেশ ওদের দশ হাজার টাকা উদ্ধার আমি বিবৃত করলাম। প্রকাশক এম. সি. সরকার-এর সুধীরবাবু ও বাগচীবাবু ওটি পড়ে তা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে কারুর প্রথম লেখা উপন্যাস যে এতো ভালো হয় তা তাঁদের ধারণার বাইরে। বোঝা যায় যে এই দরদ দিয়ে লেখা উপন্যাসটির প্রতিটি ঘটনা তাহলে সত্য ঘটনা।

এটি এখন নিউ বেঙ্গল প্রেস হতে পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে।

এই ঘটনাটিতে একটি মানসিক আঘাত পেয়েছিলাম। কিন্তু এর আগেও অনুরূপ আঘাত সহ্য করতে পারাতে, এটাও সহ্য করলাম। এখানে প্রথম ঘটনাটি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলবো।

"তখন ছাত্র অবস্থাতাতে জনৈক প্রফেসারের বাড়ীতে পড়তে যেতাম। তাঁর কন্যাটির ব্যবহার ভারি সুন্দর। আমি তাকে পড়িয়ে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করাই। কিন্তু মনের বাসনা তাকে জানাইনি। এদিকে বাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়াতে ওঁরা আমাকে বিবাহ দিয়ে সখ মেটাবেন। অগত্যা তদের সব বলতে হলো। কিন্তু

এই প্রস্তাব আসা মাত্র মেয়েটি ফুঁপিয়ে কেঁদে অভিযোগ করে বলেছিল, "অমুক দাদাকে আমি আমার মার পেটের ভাই মনে করেছি। কিন্তু ও'র মনে এই সব থেকেছে।"

কিন্তু এর পরেও অনুরূপ অন্য-ঘটনা ঘটেছিল। ভাব করে বিয়ে করার একটা পৃথক বিজ্ঞান থেকেছে। ওটা সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ ছিলাম। আমি নিজে, কালো, বেঁটে, রোগা পছন্দ করতাম না। বউভাতের নিমন্ত্রণে গিয়ে সুন্দর বৌগুলিকে দেখে ভাবতাম ওদের সংখ্যা তো অল্প, তাহলে ওদের সব তো ফুরিয়ে যাবে। স্বাধীনতা আন্দোলন তখন চলছে, ওরা পুলিশকে পছন্দ করেন না। কিন্তু এর জন্য বাঁকাপথ নিলাম কিন্তু তাতেও আমি তিনবার ব্যথা পেয়েছিলাম, ঐ ঘটনাগুলি এখানে সংক্ষেপে বলবো। এর ফলে নেগোসিয়েটেড ম্যারেজে বিশ্বাসী হয়ে সব ভার গার্জেনদের ও'পর ছেড়ে দিয়েছিলাম। তবে তাতে' একটুও ঠকিনি।

(১) সংবাদ পেলাম যে ওই বাড়িতে একটি পরমা সুন্দরী বিবাহ-যোগ্য মেয়ে আছে। কম বয়েসের ওপর আমার বেশি ঝোঁক। বেশি লেখা পড়া নাই বা জানলো। পরে ওসব শিখিয়ে নিলেই হবে।

ওদের যখন সংখ্যা এদেশে দারুন কম কিন্তু ওরা বড় পর্দানশীন। বারান্দাটাও ওদের দিকে ঢাকা, একটা ভাল্লুক ও বাঁদর নাচের ব্যবস্থা করলাম। পথে ডুগ-ডুগী বেজে উঠতেই ঐ নাচ দেখতে দুটি মেয়ে চিকের ফাঁকে মুখ বাড়ালো। কিন্তু কপাল মন্দ। ওই শাম বর্ণের মেয়েটাই কনে। ফর্সা রংয়েরটা কয় দিন আগে অন্যের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এই ব্যবস্থা আগে করলে ওরা রাজী হতো।

(২) একটা ধনীর বাড়ীতে তদন্তে গিয়েছি বৃষ্টিতে জুতো দুটো জব-জবে হয়ে ভিজে কর্দমাক্ত, তাই কার্পেটে পা রাখার আগে বারন্দাতে জুতো খুলে ভিতরে ঢুকলাম। কিন্তু ফিরে এসে দেখি জুতো নেই। ভদ্রলোক এতে ভীষণ লজ্জিত। ভৃত্য তাকে জানালো যে, দিদিমণি নোংরা দেখতে পারেন না, তারই নির্দেশে ও বকুনিতে ওই জুতো দুটো সে বাইরের ড্রেনেতে ফেলে দিয়েছে। সব জেনে ওই ষোড়শী কন্যাটি এসে ক্ষমা চাইল। অপরূপ সুন্দরী ওই মেয়েটি। আমি যেমন চাই ঠিক তেমনটি। খালি পায়ে পথে বেরুনো যায়না। ওই মেয়েটিরই স্যাণ্ডেল দুটো, আমার পায়ে ফিট করলো। তাই ও'র ওই জুতো পরে আমি ডেরাতে ফিরলাম। ওই জুতোর মালিক মেয়েটাকেই বিয়ে করবো। ঘটক পাঠালাম, ওরাও ভাগ্য গুণে রাজী। কিন্তু বাদ সাধলো ওদের সম্পত্তির প্রকৃত মালিক নিঃসন্তান বিধবা পিসীমা। তাঁর মতে তেলা পোকা আবার পাখী। সাবরেজিস্টার আবার হাকিম। ঘোষাল আবার বামুন [এ'র এই উক্তি একটা সামাজিক অপরাধ] অপমানে মেয়ের পিতাকে একটি উকিলের চিঠি পাঠালাম। আমার বক্তব্য এই যে তেলা পোকা পাখী নিশ্চয়ই নয়। সাবরেজিষ্টারদের হাকিমও একটি বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু ঘোষাল নিশ্চই বামুন। এই বিয়ে না হওয়াতে, আমার ওজন কমে গিয়েছে আমার কাছের লোকেদের নিকট আমি হেয় হয়েছি। অন্যত্র আমার বিয়ে হওয়া এখন ভার

হয়েছে। অতএব একলক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণ চাই। কিন্তু এত করেও ওইখানে আমার বিয়ে হলো না। ওদের পক্ষের উকীল পাল্টা চিঠি পাঠিয়ে দানিয়ে ছিলঃ ইউ মে ডু ইট্ এ্যাট ইওর ওন্ রিস্ক।

(৩) এই বার এই বিষয়ে আমার শেষ চেষ্টার বিষয় কলবো। রাজপথে রাউণ্ড দিবার কালে একটি বাড়ীতে পাঠ্য বই হাতে একটি মেয়েকে ঢুকতে দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। এই মেয়েটি সুন্দরী ও শিক্ষিতা। খুবই পছন্দ হলো। কিন্তু ঠিক মত ঘটক খুঁজতে দেরী হলো। এর মধ্যে ওদের ছাদে ম্যারাপ উঠতে দেখে আমি হতবাক, ওর বিয়ে রুখতে হবে। একটা জানা শুনা পুরানো লোককে স্মরণ করলাম। রাত্রে ওঁর বিয়ের জন্য গড়ানো গহনা গুলো চুরি করে গোপন স্থানে ওগুলো সে রাখুক, অতো গহনা না পেলে ওই বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। তারপর আমি ওই গহনা উদ্ধার করে ওদেরকে দেবো, তদন্ত করার কালে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করবো। পরিকল্পনা মত কার্য ঠিকই ফলপ্রসূ হলো। তদন্তের অজুহাতে বার বার ওখানে গিয়ে মেয়েটার হাতে তৈরী চা পান করেছি। গহণা-গুলোও ওরা ফিরে পেলো। তবে পলাতক চোরটা ধরা পড়লোনা। তাদের নাম ধামও জানা যায় নি। কিন্তু ওই বেইমান লোকটা অন্যত্র ধরা পড়ে দোষ কবুল করলো। ওই তদন্তকারী অফিসারটি আমার বন্ধু হওয়াতে উনি ওর ভিতরের ব্যাপারটি সামলে নিলেন, কিন্তু ওই মেয়েটি তাঁর আত্মীয় হওয়াতে উনি তাদেরকে সব খুলে বলে, আমাকে জামাই করতে বললেন।

মেয়েটার পিতা এতে রাজী হলেও, মেয়েটি বেঁকে বসে আমাকে স্পষ্ট ভাষাতে বললো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনাকে বিয়ে করবোনা। কাপুরুষদের আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি, ইত্যাদি।

আমি সাধারণত পুলিশ, ষাঁড় ও নারী এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু পুলিশে ঢুকে পুলিশকে এড়ানো যায় না। এখন নারীকে বেশী করে এড়িয়ে যেতে থাকি। ওদের এক ফুটপাতে দেখলে আমি অন্য ফুটপাত ধরতাম। কিন্তু ওদেরকে এড়ালে কি' হয় ওরা ঘাড়ে এসে পড়ে বিপদ ঘটাতো। এরই মধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটলো, যা আজও মনে পড়লে দেহ ও মন শিউরে উঠে।

উত্তর ভারতের এক রাজা তাদের কলকাতার প্রাসাদে তাঁর দুই রাণীকে রেখে দেহত্যাগ করলেন। এরপরই বড়রাণী প্রেসিডেন্সী প্রধান হাকিম করিম সাহেবেরজোড়া-বাগানের কোর্টে ছোটরাণীর বিরুদ্ধে এক মামলা আনলেন। অভিযোগ, ওই ছোটরাণী দশলক্ষ টাকার জহরত ও অলংকার এক্ষুনি সরিয়ে ফেলবে, হাকিমের থানা ইনচার্জের উপর হুকুম ওই সব জহরত গৃহতল্লাসীতে সিজ করে পরে একটা সম মূল্যের বন্ড নিয়ে ওদের হেপাজাতেই যেন রেখে আসা হয়। অদৃষ্টদোষে এই কাজের ভার আমার উপর পড়েছিল।

৪

ফরিয়াদী পক্ষের উকিলবাবু পর দিনই তাগিদ দিয়ে আমাকে ওদের ওই প্রাসাদে নিয়ে গেলেন, ওদের সন্দেহ দেরীতে বামাল অপসৃত হবে। এক হেড কনেস্টবল ও দুই কনেস্টবল, এবং দুই জন সাক্ষী সহ ওদের দ্বিতলের অলিন্দতে পৌছলাম। দ্বিতলে বিরাট বার্ণিশ করা দরজা। বার কয়েক তাতে টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল। সুমুখে দাঁড়িয়ে এক অপূর্ব সুন্দরী নারীমূর্তি। কোথাও তার খুঁত নেই। দুধে আলতার মতন তার গায়ের রঙ। আমাদের দেখে তীব্র স্বরে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেয়া মাঙতা আপলোক।

আমাদের উদ্দেশ্য বিষয় শুনে উনি শিউরে উঠে বললেন। নেহী, নেহী, তল্লাসী নেহী হোগী। মেরি উকীলবাবুকে আনে দিজিয়ে, এই প্রস্তাবে আমি অপেক্ষা করতে রাজী ছিলাম, কিন্তু ফরিয়াদীনীর উকিলবাবু এতে রাজী নন, কারণ এর মধ্যে অন্য পথে সব কিছু বে-পাত্তা হবে।

ভদ্রমহিলা এবার আমাকে বললেন—আধঘণ্টা পর আইয়ে। দশহাজার রূপেয়া দেগী। এতে আমি মাথা নাড়লুম। উনি ফের বললেন। তবে পঞ্চাশ হাজার লিয়ে লেবেন, মেরে ইজ্জৎ রুখিয়ে। কেয়া? ওভি নেহী, ঠিক হ্যায় তব আইয়ে সাব।

এই তর্কাতর্কির মধ্যে আমি ঝোঁকের মাথাতে ওর ঘরে প্রথমে ঢুকে পড়লাম। এবার ভদ্রমহিলা হঠাৎ ওই ঘরের দরজার কপাট দুটো ধপাস করে বন্ধ করে আঁচলের চাবি দিয়ে ওর ভিতরের লক্‌টা বন্ধ করে দিলেন। এবার আমি উপলব্ধি করলাম যে আমি বন্দী। এবং বাইরে থাকা সিপাহী শান্ত্রী হতে পুরাপুরি বিচ্ছিন্ন।

এবার ঐ মহিলাটি ওঁর শাড়ীর উপরাংশ নীচে ছুঁড়ে ফেললেন। ও অতর্কিতে ওর পরনের ব্লাউজ ফড় ফড় করে ছিড়ে ফেললেন, আমি সন্ত্রস্ত হয়ে দেখি যে ইটালিয়ান ধব ধবে সাদা পাথরের তৈরী মর্মর বক্ষ একটি নারী মূর্তি আমার সন্মুখে দাঁড়িয়ে ঠিক—ধনীদের বাগান বাড়ীর রূপসজ্জায় যেমনটি দেখা যায়। এর পর হঠাৎ উনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'মেরি ইজ্জত লে লিয়া। মেরি ইজ্জত লে লিয়া, তারপর ঘরের কোনে রাখা একটি টেলিফোনের হ্যাণ্ডেল তুলে ব্যারিস্টার আর. সি. চ্যাটার্জি ও কলকাতা বার লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট এ্যাড্‌ভোকেট কেশব সেনকে ফোন করে জানালেন, 'জলদী আইয়ে। লাখ রূপে খরচা করেঙ্গে। এক ছোকরা থানাদার আকে মেরি ইজ্জত লেতি। মেরেকা বাঁচাইয়ে—য়ে—এ—এদ

আমি ততক্ষণে ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করেছি। সকলে মেয়েদের কথাটাই বিশ্বাস করে থাকে। আমি নিজেও এর আগে ওদের অভিযোগকেই প্রাধান্য দিয়েছি। নিজেকে বঞ্চিত করে এতদিন ধরে কাষ্টার্জিত সুনাম নিমেষে নষ্ট হবে। আমি নিজের অজ্ঞাতে পিছুতে থাকি এবং তারপর একটা সোফা পায়ে ঠেকা মাত্র তাতে বসে পড়ি। আমার পা তখন আর আমার দেহের ভার রাখতে পারছে না।

মহিলাটি এবার আমার দিকে তাকালো ও আমার অবস্থা বুঝলো, ততক্ষণে ওঁর একজন পরিচারিকা সেখানে ওঁর চিৎকার শুনে এসে গেছে। সেও বেশ সুশ্রী মেয়ে।

তাহলে অভিযোগের সমর্থক সাক্ষীটিও উপস্থিত হলেন। এটা ভাবতেও আমার দম তখন বন্ধ হয়ে আসছে।

এবার ওই মহিলাটি একটু কি ভাবলেন ও তারপর ঐ পরিচারিকাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'দেখতা নেহী বাবুকা পশিনা নিকালতা। [অর্থাৎ ঘাম বেরুচ্ছে] পাঙ্খা খুল দেও। আউর, যাও এক গ্লাস ঠাণ্ডি সরবৎ লে'আও।

ঐ দাসী বাদীটা মুচকী হেসে, হুকুম তামিল করতে অন্যত্র গেলে উনি হঠাৎ আমার পাশে বসে বললেন 'কেয়া! বাবু, আপ মেরা পর এতনা নারাজ। এর পর দুই হাত দিয়ে আমাকে ধরে উনি আদরে, আদরে, সোহাগ ভরে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললেন। কতগুলো চুমা যে উনি আমাকে দিলেন, তা গুনবার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না। আমি অতিষ্ঠ হয়ে কাষ্ঠবৎ বসে রইলাম। মুখ হতে একটা কথাও বার হয় নি। তোমার বাঁধনে পড়েছি, কিন্তু কোনও রোমান্স নয়। আমার তখন মনে হচ্ছে যে, জলন্ত আগুনে তাতানো এক কলকের ছোপ আমার মুখে, ঠোঁটে, কপালে ও চোখে বার বার পড়ছে। ওঁর হাত দু'টো যেন একটা মাংসল ময়াল সাপের বেষ্টনি, তবে বেশ একটু নরম, নরম।

আমার কাঁপুনি না থামলেও ততক্ষণে তা কমেছে। অন্ততঃ আমি বুঝেছিলাম যে, উনি আমার বিরুদ্ধে আর মিথ্যা অভিযোগ আনবেন না। এরই মধ্যে বাইরের দরজাতে ফের ধাক্কা-ধাক্কি। ওঁর ব্যারিস্টার ও এ্যাডভোকেটদ্বয় এসে গেছেন। উপরন্তু আমার বিপদের খবরে থানা হতে একটা আমাকে উদ্ধার করতে রেশকিউ পার্টিও ততক্ষণে এসেছে। এ্যাডভোকেট কেশববাবু আমাকে চিনতেন ও স্নেহ করতেন। উনি এবার অবাক হয়ে ওই মহিলাকে বললেন। 'ক্যা' এহী লেড়কা? নেহী, নেহী, ইনিতো বহুত আচ্ছা আদমি। ইনে আপকো ইজ্জত লিয়া? ভদ্রমহিলা এবার এর প্রত্যুত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেরি ইজ্জত তো জরুর লিয়া'। এর পর আমার থেমে যাওয়া কাঁপুনি ফের আরম্ভ হলো। আমার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হবার উপক্রম। কিন্তু ওই সংহারিণী এবার আমার রক্ষাকর্ত্রী হয়ে বললেন, 'মেরি ঘর তল্লাসী কিয়া, উসমেই তো মেরি ইজ্জত গায়া। ইনে ভদ্রঘরকে লেড়কা আউর কেইসন মেরি ইজ্জত লেগী।

এই দিন অবসন্ন দেহে আমি থানার কোয়ার্টারে ফিরে কিউটিকিউরাস সোপ মেখে তখুনি স্নান করলাম, ফোরেন্সিফ মাজন দিয়ে অসময়ে দাঁত মাজলাম। তারপর ডেটল দিয়ে মুখ চোখ ও গাল ঠোঁট ধুয়ে শুদ্ধ হলাম। ভদ্রমহিলা আমাকে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড করে দিয়েছিলেন। একদিন হয়তো আমি বিবাহ করবো, কিন্তু উনি বিবাহের প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতা ও আনন্দ হতে আমাকে চিরবঞ্চিত করেদিলেন। এই পরম ও চরম দুঃক্ষ আজও আমার মন থেকে যায় নি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এই ভাবে বারে বারে আঘাত পেয়ে আমি ততদিনে দারুণ নারী বিদ্বেষী হ'য়ে উঠেছি। ঠিক করেছি যে চিরকুমার হয়ে থাকবো, ঐ বাড়তি সময়ে বিজ্ঞানের, সাহিত্যের ও জনগণের সেবা করবো, সেই সাথে পুলিশের কাজে ও আইনে মন দেব। তবে—পরে বুঝেছিলাম যে নারীকে বাদ দিয়ে কোনও গল্প বা উপন্যাস লেখা যায় না। জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়াতে, ওদের পুরাপুরি এড়ানো যায়না, উপরন্তু ওদের মন বুঝাও দুষ্কর। কারণ—বিবাহের পাত্র রূপে যাদেরকে আমি বাতিল করতাম, সেই সব পাত্রদেরকেই ওদের পছন্দ। তবু আমাকে নয়। যাই হোক। আজে বাজে চিন্তা ছেড়ে এবার আমি আন্তরিকভাবে পুলিশের কাজে মন দিলাম। আমার তদন্তাধীন মামলার একটিও আনডিটেকটেড্ থাকে না। অন্যেরা তাদের মামলার বিষয়ে আমার পরামর্শ নেয়। কোনও থানাতে দুরূহ মামলা হলে, সেখানে আমাকে পাঠানো হতে থাকে।

তখনও আমার তদন্ত করা 'সেন বুক কোম্পানীর' ভোলানাথ সেনের পুরানো মামলা প্রিভি কাউন্সিলে আপীল চলছে, তাতে ফাঁসীর হুকুম রদ করবার জন্যে আপীলের ফল আরও বিপরীত হলো। তবে—ওর ফলে আমাকে সাম্প্রদায়িক বলা হতো। কারণ হাওয়া তখন গরম। ঐ কালে সাম্প্রদায়িক হওয়া ও কোনও রাজনৈতিক মতবাদী হওয়া পুলিশেতে একটি বরখাস্তযোগ্য অপরাধ। তবে বস্তীবাসী বিহারী মুশ্লীমদের মতে এতে ঐজন শহীদ হয়ে বেহস্তে যাবে। এখানে এই মামলাটির সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করবো। তবু এটা কিনারা করা সম্ভব হয়েছিল, ওই বিষয়ে খবরও ওদেরই কাছ হতে পাওয়া গিয়েছে।

[বিঃ দ্রঃ—এই মামলার জন্য প্রতিবেদন পাঠাবার কালে, আমার একটি ব্যাখ্যার জন্য সকলে আমাকে খুব প্রশংসা করেছিলেন। বিপক্ষ পক্ষীয় ব্যবহারজীবির জেরার উত্তরে আমি বলেছিলাম সে এটি স্বীকার্য এই যে এই ফটো প্রকাশ একটি অমার্জনীয় ধর্মীয় অপরাধ। এতে মুশ্লীমদের মনে নিশ্চয়ই দারুন আঘাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এজন্য নি'হতজনকে দোষী না করে দায়ী করতে হবে তাঁর নির্দোষ অজ্ঞতা, ও শিক্ষার ঘাটতি। কারণ এদেশে সমাজবিজ্ঞান ছাত্রদের পাঠ্য বিষয় নয়। উপরন্তু মুশ্লীমরা হিন্দু ধর্মের ও সমাজের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ। কিন্তু হিন্দুরা মুশ্লীমদের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমনকি এদেশের হিন্দু হতে ধর্মান্তরিত মুশ্লীম বাঙ্গালীরাও ঐ বিষয়ে বেশ কিছুটা জানেন না। মৃত ব্যক্তি বাঙ্গালী মুশ্লীমদের এই উদার মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত। উনি এই প্রদেশের বাঙালী মুশ্লীমদের হিন্দুদের পূজাতে অংশ নিতে বাল্যকাল হতেই দেখেছেন। তাই ওর চিরন্তন ধ্যান ধারণা মত এতে যে দারুণ দোষ তা বুঝেন নি। এই ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে যাতায়াত থাকলে ও মুশ্লীম ধর্মের সঙ্গে পরিচিতি থাকলে, এই অন্যায় কাজ

উনি করতেন না। এজন্য ধর্মতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞান ছাত্রদের আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় করা উচিত]

এই সফল তদন্তটির পর আমার সুনাম আরো বাড়লো। এখানে আমার তদন্তাধীন 'সেন বুক কোম্পানীর' ভোলানাথ সেনের খুনের মামলাটির বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা আরও একটু বিশদ ভাবে বিবৃত করবো। কারণ সরজু তেওয়ারীর মামলার পর এটা আমার তদন্ত করা দ্বিতীয় মামলা। আমার তদন্ত করা তৃতীয় মামলা ছিল পূর্বোক্ত পকেট মারার মামলা।

কলেজ স্ট্রীটে 'সেন বুক এণ্ড কোং' নামে বই-এর দোকানের প্রকাশক তার একটা বই-এ হজরত মহম্মদের মূর্তি মুদ্রিত করেছিলেন। ওটি ওর এক বন্ধু য়ুরোপের একটি ইংরাজী বই হতে সংগ্রহ করেছিলেন। এটি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে এক অমার্জনীয় অপরাধ। পাঞ্জাব হতে জনৈক মুস্লীম যুবক ওই বইয়ের দোকানে এসে ওর মালিক মিঃ সেনকে ছুরি মেরে খুন করে পলাতক। অন্যদেরকে ও আমাকেও বলা হলো ওই পলাতক আসামীকে খুঁজে বার করতে। আমি বুঝেছিলাম যে ওই ধর্মান্ধ যুবকটি এরপর কোনও একটি মসজিদেই আশ্রয় নেবেন। বড়বাজার থানার এলাকাতে চীৎপুর রোডে একটি মাত্র পাঞ্জাবী মুস্লীমদের অধীনে একটি মসজিদ ছিল। আমি তখুনি ওখানে একদল মুস্লীম সিপাহী নিয়ে হানা দিয়ে এই পলাতককে রক্তাক্ত পরিধেয় ও মাটিতে ফেলে রাখা রক্তমাখা ছুরি সমেত পাকড়াও করি। পথেতে জোড়া-সাঁকো থানার ইনচার্জ সত্যেন মুখার্জির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওকে আমার এই সন্দেহের বিষয় বলাতে উনিও আমার সংগে ঐ মসজিদে ঢুকেছিলেন। উনি ওখানে আমর সঙ্গে না থাকলে ওকে গ্রেপ্তার করা আরও কঠিন হতো। হাইকোর্টের বিচারে ওই হত্যাকারীর ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল। হাইকোর্টের ইংরেজ জজ সাহেব তার রায়েতে লিখেছিলেন যে, ওঁরা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মত সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডও সহ্য করবেন না। কারণ তখনও তাঁদের আগের বছরের বাদল, দীনেশ ও বিনয়ের রায়টার্স বিল্ডিঙসে সিমসন হত্যাকাণ্ড মাথাতে ছিল।

[বিঃ দ্রঃ শ্রীমান বাদল, বিনয় ও দীনেশ রাইটার্স বিল্ডিঙস-এ ঢুকে বাংলার প্রিসনশগুলির ইনস্পেক্টার জেনারেল সিমসন সাহেবকে গুলি করে হত্যা করে। পরে লালবাজার হতে পুলিশও এসে যায় এবং উভয় পক্ষের গুলি বিনিময় ঘটে। ওদের হাতে সাইনাইড বিষের শিশিও ছিল। ওদের মধ্যে বাদল ও বিনয়ের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটলেও দীনেশ হাসপাতালে আরোগ্য লাভ করে ও পরে দীর্ঘ কাল বিচারের পর তার ফাঁসী হয়েছিল।

দীনেশের মৃতদেহ আমাদের থানার এলাকাতে থাকা মর্গে রাখা হয়েছিল। হুকুম মত রাত দুটার সময় ওঁর আত্মীয়দের আমি ওর মরদেহ নিতে দিয়েছিলাম। ওর শবযাত্রার যাত্রীদের সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত এসকর্ট করার হুকুম আমার উপর থেকেছে। গভীর নিশীথে আবছা অন্ধকারে কজন কনেস্টবল সহ আমি ওদের পিছন পিছন চলেছি। অজস্র গালিগালাজ ঐ শব যাত্রীরা পুলিশকে এবং সেই

সাঙ্গে আমাকে দিয়েছে। কিন্তু গালাগালিও যে ক্ষেত্র বিশেষে কতো উপভোগ্য ও মিষ্টি হত, তা আমি সেই দিন বুঝেছিলাম ও ভেবেছিলাম যে ঐ গুলি যথার্থই আমাদের প্রাপ্য। শ্মশানে মৃতদেহের উদ্দেশ্যে লাস্ট স্যালুট দিয়ে ওকে অন্তরের গোপন থাকা শ্রদ্ধা জানিয়ে ভোর রাত্রিতে আমরা ফিরে এসেছিলাম।]

রাজনৈতিক ঝামেলা এতদিনে প্রায় অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। বিগত দিনের ঘটনা-গুলি আমরা এখন প্রায় বিস্মৃত। এইবার আমি বারগ্লারী এক্সপার্ট, পিক পকেট এক্সপার্ট, এবং পরে একবারে মার্ডার এক্সপার্ট রূপে খ্যাত হলাম। এই সময়ে প্রভাত নাথ মুখার্জি নর্থ টাউনের এ্যাসিসটেণ্ট পুলিশ কমিশনার নিযুক্ত হয়ে এলেন। তৎপূর্বে ব্যবসায় কেন্দ্রে বড়বাজারের থানাতে উৎকোচ গ্রহণ একটি সাধারণ ঘটনাছিল। তবে এটাও সত্য যে, ভদ্রজন ও সাধারণ মানুষদের নিকট ওটা কখনও ঐ কালে নেওয়া হতো না। বরং তাদেরকে যথাযথ ভাবে ওঁরা সসম্মানে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। যা কিছু প্রাপ্য তা জুয়াড়ী ও কোকেন বিক্রেতা ও স্মাগলারদের কাছ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। সিপাহীও অধীনস্থ কর্মীদের কেউ কেউ আরও নীচে নেমে পুরানো পাপীদের নিকট হতেও পাওনা নিয়েছেন। কিন্তু ভদ্রজন পাবলিকদেরকে ওরা সব সময়ই ভয় ও, সমীহ ও শ্রদ্ধা করে তাদের সেবা করেছে।

একক ভাবে উৎকোচ গ্রহণ তখনও রীতিবিরুদ্ধ। যা কিছু প্রাপ্য তা হেড জমাদারের নিকট জমা হতো। তারপর সেই সব অর্থ পদমর্যাদা মত ভাগ করা হতো। যথা (১) লায়ন শেয়ার ঃ এটি ডেপুটি সাহেবের প্রাপ্য। তবে সেটা সেখানে পেঁছিতো কিংবা কার নামে এটা নেওয়া হতো তা জানা যেতো না (২) টাইগারের শেয়ার বলা হতো যে, সেটা এ্যাসিসটেণ্ট সাহেবের প্রাপ্য (৩) লেপার্ড শেয়ার। এটি থানার ইনচার্জ বাবুর জন্য নির্ধারিত। (৪) কিন্তু এঁর পরেও সেকেণ্ড, থার্ড, ফোর্থ অফিসারগণ রয়েছেন। এদের শেয়ারের নাম থেকেছে, যথাক্রমে জেকল শেয়ার, ক্যাট শেয়ার, র‍্যাট শেয়ার ও ইত্যাদি।

প্রভাত মুখার্জি আমাকে তাঁর অফিসে একদিন ডাকলেন। সেখানে জোড়াসাঁকো থানার ইনচার্জ সত্যেন মুখার্জিও উপস্থিত। ওই দুই মুখার্জিই আমার ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন যে তাঁরা কারুর মুখে শুনেছেন ও জেনেছেন যে, আমি কখনও একটি পয়সাও ঘুষ নিই না। এমন কি কয়েকটা মামলাতে দুই হাজার টাকা কিছু লোক অফার করলেও আমি তা ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করেছি। তাই ওরা অন্তত নর্থটাউনের কয়টা থানার নোংরা দূর করতে আমাকে ও অন্য বাছা বাছা কয়েকজনকে নিয়োগ করবেন।

আমিও এইরূপ একটি কাজে নামতেই মনে প্রাণে চাইছিলাম। আমি এই কাজে কিছু নাগরিকেরও মদত পেলাম। তখন পুলিশে বহু দক্ষ ও অনেস্ট কর্মী প্রতিটি পদেতে ছিল। কিন্তু কেউ ভয়েতে ওই কাজে জড়াতে চাইছিলেন না। আমি ওদের একত্র করে কাজে নামালাম। আমার সংগৃহীত চোর, পকেটমার, ছিনতাইবাজ,

ওদেরকে পুরোপুরি ইনফরমার রূপে ব্যবহার করলেও, আমি ওদেরকে আমার বন্ধুর মর্যাদা দিতাম। এটি ছিল তাদের কাছে একটি নূতন আস্বাদ। উদ্দেশ্য—ওদের জীবনরীতি ও কার্যপদ্ধতি জানা। আমার সামনে ওরা এখন একটা অজানা জগৎ খুলে দিয়েছে।

আমাদের বড় সাহেব প্রভাতবাবু পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টের অনুমতিতে আমাদের যে কোনও থানা এলাকাতে হানা দেবার অধিকার দিয়েছিলেন। আমি শীঘ্রই আবিষ্কার করি যে বেশ্যা, নারী ও চোররা পানের সঙ্গে উৎকট কোকেন খাবেই। আমার মনে তখন ধারণা যে কোকেন বোধ হয় নারীকে বেশ্যা ও পুরুষকে চোর করে। হয়তো ওই ঔষধ ওদের ভিতরে সুপ্ত থাকা ওই বৃত্তি দুটি জাগিয়ে তুলে। স্বাভাবিক কারনেই লুকানো কোকেন ডেনগুলোর অবস্থান ওদের ভালো করেই জানা।

কয়েকজন পুরানো সিপাহী ও জমাদার আমাকে প্রায়ই চুপি চুপি বলতো, হুজুর সাব, আজ রাতো মে আপকো নাইট রাউন্ড। যাইয়ে না রাজা রাজেন্দ্র স্ট্রীটমে। আপকো বরাদ্দ হপ্তা লে লিজিয়ে। হর সপ্তাহ আপকো বরাদ্দ পঞ্চাশ রুপেয়া বরবাদ হোতি। কিন্তু পুলিশে ঢুকার আগে আমার অভিভাবক রায় বাহাদুর কালিসদয় ঘোষাল আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন (১) ঘুষ নেবে না, (২) স্ত্রীলোক হতে দূরে থাকবে, (৩) ইচ্ছা করে বদলী হবে না। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে ওদেরকে বলে দিলাম, 'এইবাত ইনচার্জবাবুকে মে বাতায় দেগা। এতে ওরা হেসে আমাকে বলেছিল। 'ওনকো বাস্তে তো হর সপ্তাহ খাম বন্ধ নোট আতি।' হ্যাঁ প্রতি সপ্তাহে শনিবার একটা লোককে থানাতে এসে একটা বন্ধ খাম বড়বাবুর হাতে তুলে দিতে আমি দেখেছিলাম।

কিন্তু আমি নিজে ও কিছু তরুণ নূতন অফিসার বিশেষ একটা আদর্শ নিয়ে যারা পুলিশে এসেছি, ঘুষ নিতাম না। বড় সাহেব প্রভাত মুখার্জি এবং সতেন্দ্র মুখার্জির মত কিছু নির্লোভী ও সৎ ইনচার্জ কর্মী আমাদের সহায়। পুরনো যুগকে বিদেয় দিতে পুলিশে নূতন যুগ আমরা আনবোই। কিন্তু শীঘ্রই আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা একটি বিপজ্জনক কঠিন কাজ। কারণ বহু উকিলবাবু ও তদ্ সম্পর্কিত দালালরা এদের মদত দেয়। এদের অর্থ ও লোকবল অঢেল। এরা ভাত ভিত্তি নষ্ট করে এদের নায্য বা অন্যায্য আয় কমাবেই বা কেন।

সাক্ষী নির্ভর বিচার প্রথার সুযোগে এরা সাক্ষী ভাঙাতে ও তা তৈরী করতে সক্ষম। ওই কাজেতে নির্বিচারে লেগে কয়জন সহকর্মী আদালত হতে অপমানিত হলো ও আমাদের দুইজনের বিরুদ্ধে মামলাও হলো। শীঘ্রই আমরা বুঝলাম যে প্রতিটি কাজে ন্যায় অন্যায় দেখা, এক প্রকার ছুঁচি বা-ই।তাই সাক্ষী-সাবুদ ফের সংগ্রহ আমাদেরই করতে হবে, এবং সেই সাথে তাদেরকে সাক্ষী নির্ভর আদালতের বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থিত করতে তো হবেই। উপরন্তু নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য প্রতিআঘাতও রুখে এগুতে হবে। এই নূতন চিন্তা ভাবনা তখনই কার্যকরী করা হলো। এই সব পরিস্থিতি ও তদ্ জনীত গৃহীত পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে

পরেতে আমি আমার কয়েকটি ক্রাইম উপন্যাসে বিবৃত করেছি। বিভিন্ন কোকেন ডেনগুলিতে ও জুয়ার আড্ডাগুলিতে প্রতি রাত্রেই আমরা হানা দিই। রাশি, রাশি মূল্যবান কোকেন আমরা উদ্ধার করি। ঐ সব সংশ্লিষ্ট স্মাগলারদের নিকট বিবৃতি আদায় করার পদ্ধতি তখন আমাদের রপ্ত। ওদের বিবৃতিমত সংবাদ ভারতের অন্যান্য শহরের পুলিশেও আমার পাঠাতে থাকি।

বৃটিশ গভর্মেণ্ট এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে সজাগ হয়ে ওই কোকেন স্মাগলী বন্ধ করতে 'ডেনজারাস ড্রাগ এ্যাক্ট' প্রণয়ন করলেন। এর মূলে ছিল, আমারই লেখা এক বৃহৎ প্রতিবেদন। তখনও আমি একজন নিতান্ত সাধারণ পুলিসকর্মী হওয়া সত্ত্বেও ওইটি ছিল আমার প্রথম সর্বভারতীয় কৃতিত্ব। ততোদিনে এই পুলিশ বিভাগ দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রভাত মুখার্জি ও সত্যেন মুখার্জির নেতৃত্বাধীন অনেস্ট অফিসার গ্রুপ এবং অন্যদের অধীনে কয়েকটি বিতর্কিত মানসিকতার গ্রুপ। তবু বলবো যে ঐ ডিস-অনেস্টমনা গ্রুপের লোকেরা প্রত্যক্ষভাবে জনগনের ক্ষতিকর কখনও হন নি। তাদের নিকট হতে উৎকোচ গ্রহণ বা তাদেরকে উৎপীড়ন বা অবমাননা তাঁদেরও ঘৃণ্য। তবে—পরোক্ষ ভাবে এতে জনগন ক্ষতিগ্রস্থ হতো বৈকি? কারণ জুয়া ও কোকেনে অর্থ ব্যয় মেটাতে চুরি ও সিঁদকাটা ও অন্যান্য অপরাধের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হতো। অন্যদিকে ঐসব ডিস অনেস্টমনা অফিসররা কেউ কেউ বেশ্যা ভোগী হলেও ভদ্রজনদের স্ত্রী ও কন্যাদের প্রতি আমাদের মতই যথেষ্ট সম্মান দেখাতেন।

[বিঃ দ্রঃ—ওদের উপরিউক্ত মানসিকতার কারণগুলিও আমি ঐ সময় অনুসন্ধান করি। ঐ কালে কমিশনার ও তাঁর ডেপুটি কমিশনাররা সকলেই প্রায় ইংরাজ ছিলেন। তখন একজন মাত্র ভারতীয় ডেপুটী কমিশনার ছিলেন। তখন এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনারদের বড় সাহেব বলা হতো। ওরা দুই তিন জন বাদে প্রায় সকলেই তখন ভারতীয়। থানা ইনচার্জরাও দুইচার জন বাদে প্রায় সকলেই ভারতীয় বাঙালী। তাই প্রশাসন কার্য ঐ বড়সাহেবের সম্পূর্ণ এক্তিয়ারে ছিল। ডে-টু-ডে ওয়ার্কে ইংরাজ ডেপুটি সাহেবরা হস্তক্ষেপ করতেন না।

কিন্তু ওই সব ইংরাজ ডেপুটিদের একটি মহৎ গুণ ছিল, ভারতীয়দের মধ্যের বিবাদে তাঁরা চুল-চেরা বিচার করতেন। কোনও পুলিশ কর্মী রাজভক্ত ও আইনানুরাগী জনগণকে উৎপীড়ন করলে তথুনি নিজেরাই তদন্ত করে তাদেরকে কঠোর দণ্ড দিতেন। তাঁরা প্রত্যেক পাবলিক কমপ্লেনগুলির জন্য পৃথক ফাইল রাখতেন। এমন কি কোনও বড়সাহেব বা ইনচার্জবাবুর বিরুদ্ধে একজন ঝাড়ুদার কমপ্লেন করলেও ওরা তার সত্যতা নিজেরা যাচাই করেছেন। এই জন্য পুলিশ কর্মীরা তৎকালে, ভোক্যাল পাবলিক তথা মুখর পাবলিকদের ভয় ও সমীহ করে এলাকাতে পপুলার হতে সচেষ্ট থাকতেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এই স্বাধীনতার যুগে কিছু পুলিশ গুণ্ডাদের ভয় করেছেন, এবং জনগণকে উৎপীড়ন ও অসম্মান করেছেন। কিন্তু ঐকালে পুলিশরা গুণ্ডাদের ভয় না করে মুখর জনগণকে ভয় ও সমীহ করেছে। কেউ কেউ মামলাতে উৎকোচ নিয়ে আসামীদের মুক্তির সহায়ক যে হয়নি তাও নয়। কিন্তু তা

সত্ত্বেও কোন নিরাপরাধীকে ফাঁসানোর জন্য উৎকোচ গ্রহণে তারা কোনওকালেই রাজী হয় নি। তবে ঐসব ইংরাজ সাহেবরা পুলিশে ডিসিপ্লিন রক্ষা করতে কামান দাগতেও ইতস্তত করেন নি। পুলিশ কর্মীদের দল বাঁধা বা বিপ্লবী হওয়া বা কোনও উর্ধতনকে অসম্মান করা বা তাদের আদেশ না শোনা তখন সরাসরি বরখাস্ত-যোগ্য অপরাধ হওয়াতে ঐ বিষয়ে কারুর কোনও ক্ষমা থাকে নি। তবু-কোন এলাকাতে কজনে জুয়া বা স্মাগলিং করছে বা তজ্জন্য চুরি বাড়ছে কি না এই সম্পর্কে তাঁদের পক্ষে খোঁজ রাখা সম্ভব না হওয়াতে ওই গুলির তদন্ত করার ভার তৎ-তৎ বিভাগের বড় সাহেবদের উপরই ন্যস্ত ছিল।]

উপরোক্ত তথ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন অবস্থা ও ব্যবস্থার বিচার করলে আমার এই সম্পর্কিত বক্তব্যগুলি বুঝা যাবে। নিম্নোক্ত ঘটনা হতে আমার তৎকালীন কার্যগুলির ভয়াবহতা বুঝা যাবে।

একদিন গভীর রাত্রে ভিন এলাকার এক স্মাগলিং ডেনে আমরা ছদ্মদেশে হানা দিলাম। গোপনতা রক্ষার্থে এই সংবাদ নিজেদের ও তৎসহ স্থানীয় থানাতে জানানো হয় নি।

কারণ ওই সব দস্যু দলের চররা থানাগুলির সম্মুখে মোতায়েন থেকেছে। থানা হতে হল্লা বেরুনোর খবর তারা সাইকেলে উঠে তক্ষুনি ওদের আড্ডাতে জানিয়ে দেবে। উপরন্তু ওদের প্রতিটি থানাতে অসাধু কিছু পুলিশ কর্মীর মধ্যেও চর রেখেছে। পাঁচিল টপকে কয়জন ভিতরে ঢুকে লোহার দরজা খুলে দিলে আমরা সকলে হুড় মুড় করে ভিতরে ঢুকলাম। আমাদের য়ুনিফর্মের উপর সিভিল জামা চাপানো। ওর তলাতে বুলেট প্রুফ বর্ম। তৎকালে বিপ্লবী বাঙালীদের দমনের জন্য ঐ গুলি তৈরী করিয়ে লালবাজারে রাখা থাকতো। ওগুলি ইমপোর্ট করে আমরা আনিয়ে নিয়ে পরেছি।

হঠাৎ দুড়ুম করে একটা আওয়াজ। একটা গুলি আমার বুকে ঠক করে ঠেকে গড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও পিস্তল গর্জে উঠেছে। আমরা বাড়ীর কাঠের দরজা ভেঙে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলাম। লোহার সিঁড়ি, ওর রেলিংটাও লোহার। কিছুটা ওঠার পরই আমাদের কয়জন চীৎকার করে উঠলো। পুড়ে গেলাম। জ্বলে মলুম। এর পর দুইটি বড় বড় ডাল কুত্তা কোথা হতে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি নিজে ও অন্য বন্ধুজন ইলেকট্রিকের শক খেয়ে পুড়ে যেয়ে ও কুকুরের দংশনে ক্ষত বিক্ষত হয়ে পিছু হটলাম। তবে তার আগে আমি একটা কুকুরকে গুলি করেও মেরেছি। ওদিকে ঐ বাড়ীর উঠানের ড্রেনেতে তোড়ে জল পড়ার শব্দ। কিছু কোকেন ওরা ওই ট্যাঙ্ক হতে বেগে পড়া জলে গুলে নষ্ট করলো। বাড়ীটার লাগোয়া বস্তী। পিছন দিক দিয়ে ওদের একদল বাকী বামাল সরালো। ওদের দুই জন স্থানীয় থানাতে এসে এজাহার দিল যে, তাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে লুঠ করেছে। তাতে ঐ থানা হতে লাঠি হাতে একদল সিপাহী ও অফিসার ডাকাত ধরতে সেখানে উপস্থিত।

আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনে ওরা বলেছিল যে ওরা ডাকাত ভ্রমে পুলিশকে রুখেছিল।

এর মধ্যে অন্য ডিভিসনের বড় সাহেবদের অভিযোগ এলো যে, স্থানীয় থানার কোনও মদত না নিয়ে ঐ কাজ করাতে যত কিছু অঘটন ঘটেছে। তদোপরি লোক চক্ষুতে তাদেরকে আমরা হেয় করেছি। এতে আমি জনৈক ইংরাজ ডেপুটিকে এক রাত্রে গোপনে ওদের আড্ডা বাড়ীর ধারে থাকা এক বন্ধুর ত্রিতল বাটীর বারান্দাতে এক রাতে নিয়ে এলাম।

বাড়ীর উঠানে পুরানো ছোকরা নির্বিবাদে কোকেন পুরিয়া অদ্ভুত এক উপায়ে সওদা করছিল। ওইখানে দুইজন য়ুনিফর্ম পরা সিপাহী নিজেদের হাতে ঘুষ নিচ্ছে। এর মধ্যে একজন উর্দীপরা অফিসার এলেন ও কিছু পুরিয়া এক পেশোয়ারী চরের হাত হতে নিলেন ও সেখান হতে চলে গেলেন।

একটা মাঠ কোঠা বাড়ীর দ্বিতলের একটা ফোঁকর হতে একটা হতে একটি হাত দড়িতে মালা বেঁধে সেটা নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। খরিদ্দার'রা তাতে টাকা বাঁধলে সেটা উপরে উঠে যায় ও পরে ঐ মালাতে করে কোকেন পুরিয়া নামে ও তা হতে খরিদ্দাররা তা উঠিয়ে নেয়। অন্যদিকে একটা ছোট গর্তর মধ্য হতে একটা হাত বেরিয়ে আসে ও ঐ একই ভাবে লেন দেন হয়। কিন্তু-বিক্রেতাদের কেউ দেখতে পায়না। সনাক্তিকৃত না হওয়ার জন্য ওদের ওখানে ঐরূপ ব্যবস্থা।

[পরে এদের হাতে নাতে ধরতে আমরা এক প্রকার রঙ নিক্ষেপক পিস্তল আনিয়েছিলাম। অলীক ক্রেতারূপে ওখানে গিয়ে ওই ফুটোতে ওটা ছুঁড়লে ঐ রঙ বিক্রেতার গাত্রে লেগে যেতো। এইরূপ অস্ত্রটা আমি এক বিলাতফেরত বন্ধুর নিকট হতে সংগ্রহ করেছিলাম।

ওই সাহেবের রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রায় বার জন কর্মী বরখাস্ত হলেন এবং ষোল জনের পদাবনতি হলো। আর ঐভাবে প্রকাশ্যে চোরাকারবার পুরাপুরি বন্ধ হয়ে গেল। এটার জন্য আমার পরবর্ত্তী প্রমশন ত্বরান্বিত হয়েছিল।

এই সময় মাড়োয়ারী অধ্যুষিত বড়বাজার এলাকাতে একটা অদ্ভূত ঘটনা ঘটেছিল। একদল তরুণ মাড়োয়ারী সমাজ সংস্কারক দল আবির্ভাব হয়েছিল। উদ্দেশ্য-তাদের সমাজের মেয়েদের বড় বড় ঘোমটা দেওয়া হতে মুক্ত করা। কিন্তু ঐ ঘোমটার মধ্য হতেই একটা ধারালো কাটারী ধরা হাত বেরিয়ে এলো। ওই ঘোমটা নিবারণী সমাজ সংস্কারক এক তরুণ তাতে সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে গেলেন। আমিও এরপর ওদের এই বিষয়ে আর কোনও মদত দিতে সাহসী হলাম না। আমি বুঝেছিলাম যে সমাজ সংস্কার মানুষ করেনা, ওই যা কিছু সংস্কার কার্য তা 'সময়' করে থাকে। একটা বিশেষ সময় যা বিশেষ প্রয়োজনে তৈরী করেছিল, তা নিবারণ করা বা বাতিল করা ঠিক সময় ঐ 'সময়ই' করবে। ততদিন পর্যন্ত ঐসব কার্য মুলতুবী রাখাই ভালো।

এই সামাজিক সংস্কারের কার্যে মদত দেওয়াতে আমার নামে একটা কর্তৃপক্ষের

নিকট জয়েণ্ট পিটিশনও করে দিল। তাতে ইংরাজ ডেপুটি সাহেব ওটা ফাইল করার পূর্বে আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে শুধু বলে দিলেন, ইউ বেটার অফ্ ইওর হ্যাণ্ড ফ্রম ইট। পুলিশের কাজ শুধু আইন আরোপন, সমাজ সংস্কার সোসাল ওয়ার্কাররা করুক।

[বিঃ দ্রঃ—এই সম্পর্কে আমার ছাত্র জীবনের একটা ঘটনা মনে পড়েছে। আমি আমার স্বগ্রামে একটা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে ওর আমি সেক্রেটারী হই। একদিন আমি স্কুল পরিদর্শনে এসে মাস্টারদের ও সব ছাত্রীদের বললাম "তোমাদের নাকেতে নোলক পরা চলবে না, ওগুলো খোলো, দেখতে খারাপ লাগে। মুখে সাবান দেবে ও কাচান কাপড় পরবে। পরদিন ওদের বাড়ীর গিন্নিরা আমাকে পাকড়াও করে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। ওঁদের এতো দিন আমার উপর ভালো ধারনা ছিল। ওদের বক্তব্য আমরা মেয়েদের পাঠিয়েছি লেখা পড়া শেখাতে। ওদের কিরকম দেখায় বা না দেখায় তাতে তোমার এতো মাথা ব্যথা কেন গা? ওদের অনেকে স্কুল থেকে মেয়েকে ছাড়িয়েও নিয়ে গেলেন।]

যাই হোক মাড়োয়ারী সমাজের রোষ এড়াতে আমি আর ওই সবে থাকি নি। তবু হঠাৎ একদিন পার্শ্ববর্তী জোড়া-সাঁকো থানাতে বদলী হলাম। ওই এলাকার কিছু সমস্যা মেটাতে আমার মত একজন অফিসারের প্রয়োজন হয়েছিল। উপরন্তু প্রভাত মুখার্জী ও সতোন মুখার্জী ওইজন্য আমাকেই মনোনীত করেছিলেন।

এবার বড়বাজার থানা হতে আমি ১৯৩২ খৃঃ অব্দে জোড়াসাঁকো থানাতে বদলি হয়ে এসেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান এই থানার এলাকাতে কিন্তু এখানে আসার পর দিনই, আমাকে কলকাতা য়ুনিভার্সিটিতে কনভোকেসনের ডিউটি দেওয়া হল। আমি ভাড়া করা গাউন পরে স্নাতকের ছদ্মবেশে উপাধিগ্রাহী ছাত্রদের সঙ্গে সম্মুখ সারিতে আসন নিয়েছি। হঠাৎ একটা ছাত্রী উঠে এগিয়ে এসে গভর্নর ক্যাম্বেলকে লক্ষ্য করে পিস্তল হতে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। ভদ্রমহিলার নাম বীণা দাস। উনি বোধ হয় এর আগে পিস্তল কখনও ছোঁড়েন নি। ট্রিগার টানতে শিখলেও উনি টারগেট প্র্যাকটিস করেন নি। তাঁর হাত থর থর করে কাঁপছিল। ওঁর ছোঁড়া প্রতিটি গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে থাকে। মাত্র একটা গুলি বাঙ্গলার অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ডঃ দীনেশ সেনের বাম বাহু ঘেঁসে পিছনের ডায়েসে লাগে। আমি ওঁর নিকটেই ছিলাম। অন্য উর্দীপরা পুলিশ তখন হলের বাইরে। আমি দৌড়ে ভদ্রমহিলার কাছে পেঁছিই। আমার অবচেতন মনে ঐ মহিলার দেহ ছুঁতে তখনও যেন দ্বিধা। আমি ওর হাতের পিস্তলের নলটা মুঠি করে ধরা মাত্র উনি পিস্তলটা ছেড়ে দিলেন, ততক্ষণে বহু পুলিশ কর্মী ওই মহিলাকে ছুঁয়েছেন ও তার হাত দুটো ধরেছেন। ডঃ দীনেশ সেনই একমাত্র বাইরের লোকেদের মধ্যে লাট সাহেবকে আড়াল করে তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে ওঁর সম্মুখে এসেছিলেন।

[পরদিন আমি বেহালাতে ডঃ দীনেশ সেনের বাড়ীতে গিয়ে এই বিষয়ে ওঁর একটা বিবৃতি রেকর্ড করেছিলাম। আমি ওকে কয়েকটি নক্সা-তোলা পুরানো কাঁথা ও কিছু পুরানো নথি সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম]

কনভোকেশন শেষ হওয়ামাত্র সেখানে পুলিশ কমিশনার, চিফ সেক্রেটারী, আমরা উর্ধতনরা দ্রুত গতিতে এলেন। ওই মহিলাটিকে গ্রেপ্তার করার গৌরব মুকুটের তখন বহুজন দাবিদার। কিন্তু বীণা দাসকে মধ্যস্থতা মানা হলে, উনি নিশ্চয় আমাকেই দেখিয়ে দিতেন, কিন্তু বীণা দাস এর পর তাঁর বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ডঃ দীনেশ সেন কে বাঁচাতে যাওয়াতে ওর গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছিল, নইলে উনি অব্যর্থ লক্ষ্যে গভর্নরকে নিহত করতে পারতেন। উনি এও বলেছিলেন যে পঞ্চাননবাবুর ধারণা ভুল। আমি রাগে কাঁপছিলাম, আমি ভয়েতে কাঁপিনি।

ঐ কালে নারী পুলিশ ফোর্সে থাকে নি, ওটা তখনও কল্পনারও বাইরে। নারী অপরাধীদের দেহ তল্লাসীর প্রয়োজন হলে পুলিশ তখন এলাকার কোনও ভূজাউলি বা বাসন উলিকে কিছু অর্থ দিয়ে ঐ কাজ করাতো। তার পর বৎসর কনভোকেসনে সদ্য গ্রাজুয়েট হওয়া নারী ছাত্রীদের মধ্যে গাউন পরিয়ে বসিয়ে রাখার জন্য কয়েকটি তরুণীর প্রয়োজন হলো। কিন্তু এজন্য কোনও বাঙালী মহিলাকে পাওয়া গেল না। পরিশেষে আমাদের দুইজন সহকর্মীর আলোকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে অতিকষ্টে রাজী করানো হয়েছিল। গভর্মেণ্ট হতে এই দুজনাকে দুইটি কানের সোনার দুল উপহার দেওয়া হয়েছিল।

বড়বাজার ও জোড়াসাঁকো ; উভয় থানাতে ছয়জন অফিসার বহাল। বড়বাজারে আমি সিক্সথ অফিসার ছিলাম। কিন্তু কর্মকৃত্যে আমার কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে জোড়াসাঁকোতে আমাকে সেকেণ্ড অফিসার করে পাঠানো হলো। এর ফলে আমি সহকর্মীদের একটা দারুণ হিংসার পাত্র হয়ে উঠলাম।

ইনচার্জ অফিসর সত্যেন মুখার্জী এবং ওই বিভাগের এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার অর্থাৎ ঐ বিভাগের বড় সাহেব, উভয়েই অত্যন্ত অনেস্ট ও স্ট্রিকট অফিসার। ওইরূপ উর্ধতনদেরকেই আমাদের মত অফিসারদের পছন্দ, কঠোর তদারকী না করলে অধীনদের ভালো কাজ উর্ধতনদের নজরে আসে না। এতে মুড়ী-মুড়কীর একদর হয় না। ওতে সহজে ভালো কাজের জন্য স্বীকৃতিও আসে। সৎ ও দক্ষ কর্মী মাত্রেই কামনা করে যে উর্ধতন'রা রেকর্ড মুহুর্মুহু চেক করে তাদের এখন দেখুক ও জানুক।

এই থানার এলাকাতে তখন সেণ্ট্রাল-এ্যাভিনিউ তথা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ তখনও বস্তিগুলি ভেঙে নির্মীয়মান। এলাকার উত্তর দিকে ও পূর্ব দিকে কলাবাগান আদি স্থান চোর গুণ্ডাদের বসতিতে ভরা। কিন্তু ওর উত্তর পশ্চিম দিকে পুরানো ধনী পরিবারগুলি বাস করতো। রূপগাছি তথা রামবাগান নামে বেশ্যা পল্লী। ঐ দিকেই একটা পৃথকীকৃত স্থানে রয়েছেঃ এই এলাকার উত্তর পূর্ব দিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বসত বাটী। ঐ সময়ে এই থানাতে কেউ নূতন বহাল হলে তৎকালীন প্রথামত, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিংবা ওদের প্রধান ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে আসতে হতো। ওদেরকে সম্মান জানাতে হতো। এই প্রথা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় হতেই পুলিশে

প্রচলিত। এই সুযোগ তো আমিও মনে প্রাণে চাইছিলাম। ওই প্রথামত ওঁদের ঐ সুবৃহৎ বাটীতে গেলাম। বাবুর মহলে, ঠাকুর দালানে স্টেজ বাঁধা হয়েছে। প্রশস্ত প্রাঙ্গণেবহু চেয়ার সাজানো হয়েছে। নটীর পূজা অভিনয় হবে। তাতে কবি নিজেও অংশ নেবেন। কবির সঙ্গে সেদিন সাক্ষাৎ করা যায় নি। ওদের ম্যানেজারের কাছ হতে ওই অভিনয় দেখার একটা ফ্রি টিকিট নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে থানাতে ফিরলাম। মনেতে তখন এক অসীম অনুভূতি।

হঁ্যা ঐ রাত্রেই ওখানে গিয়ে সম্মুখের একটা চেয়ার দখল করলাম। বহু ইংরাজ ফরাসী ও জার্মান সাহেব দর্শক রূপে সেখানে উপস্থিত। স্টেজের এক পাশে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে বিশ্বকবি স্টেজের পাশে একটা চেয়ারে বসে রয়েছেন। এর একটু পরেই স্টেজের পর্দা সরে গেল। সেখানে গ্রীস তথা যবন দেশ থেকে আমদানি করা ড্রপসিন তথা যবনিকা নেই। তবে ওখানে প্রাচীন ভারতীর নাটকে ব্যবহৃত তিরস্করণী তথা বর্তমান স্ক্রিন [screen] ছিল। কবি মাত্র দুইবার স্টেজে ঢুকলেন ও চলে গেলেন। প্রথমবার উনি ঢুকেই চলে যেতে যেতে বললেন, 'কে আছ ভিক্ষা দাও' এরপর সর্বশেষে ফের ঢুকে মৃতা নটীর দেহে কিছু ফুল ছড়িয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। আমরা সকলে বাক রহিত স্তব্ধ ও মুগ্ধ হয়ে ওঁকে দেখলাম।

কিন্তু কয়দিন পর ওই বিশ্বকবিকে নিয়েই থানাতে পর পর কয়টি অঘটন ঘটলো। এবং ওতে আমি বিনাদোষে জড়িয়ে পড়ে বিপদগ্রস্ত হলাম। জোঁড়াসাঁকো থানায় অন্য থানার মত কয়েকটি রেজিষ্টার সংস্করণ [Varification] করা হতো। যথা—(১) গুড অফেণ্ডার রেজিস্টার (২) ব্যাড ক্যারেকটার রেজিস্টার (৩) সারভেলেন্স রেজিষ্টার এবং (৪) ক্রিমিন্যাল ট্রাইব রেজিস্টার। ওতে রেজিস্ট্রিকৃত নামের লোক-গুলি সম্বন্ধে অতি গোপনে তদন্ত করে ওদের বাড়ীতে উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নথীভুক্ত করার রীতি। ঐ দিন আমি সারভেলেন্স কেতাবটির এনট্রিগুলি আপ-টু-ডেট করছিলাম।

পুলিশের জনৈক জমাদার গোপন তদন্ত সেরে আমাকে রিপোর্ট করছিল। '১২নং দাগী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাজীর নেহী হ্যায়। এটা শুনে আমি চমকে উঠে ১২নং এণ্ট্রাতে দেখি ওঁর বাড়ীর ঠিকানা লেখা দ্বারকানাথ টেগোর লেন। কাউকে সারভেলেন্স রেজিষ্টারী করতে হলে তার সম্পর্কে একটা হিস্ট্রী শীট তথা জীবন পঞ্জি সংক্ষিপ্ত করে ওতে লিখে রাখার রীতি। আমি ওতে নিম্নোক্ত রূপ, একটা জনৈক ইংরাজ অফিসারের ১৯০২ খৃঃ লেখা, ওর জীবন পঞ্জি দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি। ওই ইংরাজী লিপিকা ওর হতে বাংলা তর্জমার কিছু অংশমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে উনি একটা সুপ্রাচীন রাজভক্ত ও ব্রিটিশ বন্ধু জমীনদার পরিবারে জন্মেও ব্রিটিশ বিরোধী। ১৯০২ খৃঃ উনি রেলওয়ে ওয়ার্কস ইউনিয়নের কাউণ্টার প্রেসিডেণ্ট হলেন। ওঁর শ্রমিক লীডার হওয়া একটা ব্রিটিশ স্বার্থ বিরোধী বিষয়। তদোপরি উনি ধনী জমীনদার হওয়া সত্ত্বেও কৃষকদরদী হয়ে ওই

কৃষকদের বাড়ীতে যান ও সেখানে তাদের মাটির ঘরের দাওয়াতে বসে মুড়ী খান গোয়ান্দার ছদ্মবেশে তা স্বচক্ষে দেখেছে। উনি ধনীর পুত্র ও সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও বোলপুরের নিকট একটা ছোট স্কুলে মাস্টারী করেন। ১৯০৪ সালে উনি বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন ওঁর পরনের আলখাল্লা ও শ্বেত শ্মশ্রু গুম্ফ ও টকটকে গায়ের রঙ দেখলে কিন্তু খৃষ্ট বলে ভ্রম হয়। এতে বিভ্রান্ত হয়ে বহু য়ুরোপীয় পর্যন্ত ওর বাড়ীতে যাতায়াত করছেন। ঐ সব য়ুরোপীয়দেরকে সাবধান করে দিতে হবে।

১৯০৬ খৃঃ এই সব সারভেলেন্স রেজিষ্ট্রীতে লেখা হয়েছিল ওর তৎকালীন গতি-বিধির উপর লক্ষ্য রাখতে ওর একটা কপি বোলপুর থানাতেও তখন পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু গতানুগতিকভাবে গুরু পরম্পরায় তথা বংশ পরম্পরায় ওই কেতাবটি কর্তৃপক্ষের অগোচরেই ওর নোবেল প্রাইজ পাওয়া ও স্যার তথা নাইটহুড উপাধি পাওয়ার পরেও ঐ কেতাবের ওই এণ্ট্রি অন্যান্য এণ্ট্রির সঙ্গে মেনটেন করা হচ্ছিল। তখনও পর্যন্ত ওটা হতে ঐ নাম ষ্ট্রাক্ অফ করা হয়নি। কিন্তু ওই সময় জনৈক রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থানাতে চুরি কেস লেখাতে এসেছিলেন। উনি জনান্তিকে আমার ও জমাদারের কথোপকথন শুনে সব বুঝে স্যার যদুনাথ সরকারকে এই অদ্ভুত বার্তা জানালেন। উনি তা প্রবাসীতে প্রকাশ করে দিলেন। এতে বাঙলা গভর্মেণ্ট স্তম্ভিত হয়ে ওই নাম তখনও ওটা হতে ষ্ট্রাক্ অফ্ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ৎ চাইলেন। পরিশেষে পাবলিককে ঐ ঘটনা জানানোর অপরাধে আমি ভর্ৎসীতও হলাম। তখুনি ওই পাতা হতে ওঁর নাম কেটে দেওয়া হলো।

কর্তৃপক্ষের বিরূপ মন্তব্য সহ একটা ডিসপোজার নোট পেলাম। সেই সাথে রবীন্দ্রনাথকে দাগী বলাতে ওই পুলিশ জমাদারের দশটাকা জরিমানা হলো।

[আমার সার্ভিস বুকে ওটাই একমাত্র বিরূপ মন্তব্য। তবে ওতে রবীন্দ্রনাথ জড়িত থাকাতে ওটাকে আমি পুরস্কার মনে করি। ওতে কালো কালিতে একটাও পানিসমেণ্ট নেই। শুধু লাল কালিতে লেখা বারসতের উপর মনিটারী রিওয়ার্ড। এবং বহু গুড্ সার্ভিস মার্কা ও কমেণ্টমেণ্ডেসন। হাইলি কমেণ্ড ও থেকেছে। প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই এ্যাডমিনিস্ট্রেসন রিপোর্টে আমার নাম স্পেশ্যালি মেনশেন্ড হয়েছে]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম দেখি বাল্যকালে ভবানীপুর গ্রাম সমাজ হলে। সেখানে প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দবাবুর সভাপতিত্বে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছিল।

রমানন্দবাবু ওর বক্তৃতাতে বললেনঃ আমিও প্রথম জীবনে কবিতা লিখেছি। এজন্য মাত্র চার বৎসরের মধ্যে আমি কবিরূপে খ্যাতিলাভও করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সেই কবিতার খাতাখানি এখন হারিয়ে গিয়েছে। এর প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতাতে বলেছিলেনঃ রামানন্দবাবু চার বছরের মধ্যে কবিরূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাই আজ তার কবিতার খাতাখানি পর্যন্ত হারিয়ে গিয়েছে। কিছু

আমাকে কবিরূপে স্বীকৃতি পেতে চল্লিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অল্পকালের মধ্যে পাওয়া খ্যাতি স্থায়ী হয় না। তাই স্বীকৃতি দেরীতে আসাই ভালো।

এতকাল পরে যৌবনে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ওদের বাড়ীর পূজার দালানের মঠে দ্বিতীয়বার দেখলাম, কিন্তু আমার এখন বাসনা ওর সঙ্গে মুখমুখী হয়ে কথা বলা। একদিন ঠাকুরবাড়ীতে সেই সুযোগ পেলাম, সেদিন ওখানে বিচিত্রার একটা অধিবেশন হচ্ছিল। প্রাঙ্গনে কবি হেমেন্দ্র কুমার রায় ও ডঃ কালিদাস নাগের সঙ্গে দেখা হলো। পাঠ্যকালে ডঃ নাগের ফারদার ইণ্ডিয়া সোসাইটির আমি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলাম। ফারদার ইণ্ডিয়াকে ঐ কালে ঠাট্টা করে বলা হতো বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর বুজিয়ে ওটা তৈরী হবে। কিন্তু ওটার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও শ্যাম, কম্পোজ আদি হতে প্রাচীন ভারতকে আবিষ্কার করা। ওরা আমাকে অতি সহজে সভাতে উপবিষ্ঠ কবির সম্মুখে আনলেন ও তাঁকে বললেন যে 'এই ছেলেটির জীবনের বাসনা কবির সঙ্গে কথা বলা। শান্তভাবে স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে কবি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার পরিচয়? কিন্তু কোন পরিচয় আমি দেব? কিছুতেই আমার মুখ হতে কথা বার হয় না। এতে ডঃ নাগ ওকে বলেছিলেন সেটা ও 'ছেলেটি পত্রিকাতে লেখে, কিন্তু যে পরিচয় আপনি চাইছেন, বলতে ওর একটু লজ্জা বাধছে। এতে কবিগুরু বেশ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ মানুষের কাছে মানুষের পরিচয় দিতে লজ্জা করে এমন কি পরিচয় আছে? এরপর আমি লোকাল থানার পুলিস কর্মী শুনে উনি বললেন, 'থানা পুলিশ তো নিকটেই ছিল। কিন্তু এত কাছে?

এই কথা শুনে ঐ সভাতে উপস্থিত প্রায় চল্লিশ জোড়া চোখ আমার দিকে ফিকসড্ হয়েছে। এর একটু আগে কবির একটা নাটক লালবাজারে পুলিশ প্রেস সেকসন হতে ওদের কাছে আপত্তি করে কিছু বাদ দিয়ে মঞ্চস্থ করার নির্দেশ আসা সম্বন্ধে কথাবার্তা হচ্ছিল। পুলিশের এই ধৃষ্টতায় তখনও ওঁরা ক্ষুব্ধ! এরই মধ্যে আমার আগমনে ওরা সন্ধিগ্ধ। যাই হোক ওদের ঐ অগ্নিদৃষ্টি তখন সহ্যাতীত। একমাত্র নলিনী পণ্ডিত মশাই আমার সমর্থনে এগিয়ে এলেন ও বললেনঃ এর কল্লোলে গল্প বার হয়েছে, উনি দুইটি সামাজিক উপন্যাসও লিখেছেন।

কবিগুরু এবার খুব সহজ ভাবে বললেন, 'তুমি সামাজিক উপন্যাস লেখ কেন? ওর জন্যে তো আমি, শরৎ ও অন্যোরা রয়েছি'। 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে কম্পিটিসনে পারবে'? তুমি পুলিশে এখন ঢুকেছো। অপরাধ জগতের রহস্য বুঝতে থাকো। ভারতীয় ক্রিমিনলজী বিষয়ে গবেষণা করো। এর পর উনি ওর বাঙ্গলা নাম করণ করলেন ও বললেন 'ওর বাঙলা হবে অপরাধ বিজ্ঞান'। আর যদি উপন্যাসই লিখতে হয় তো অপরাধীদের জীবন রীতি ভিত্তিক ক্রাইম উপন্যাস লেখ। এরপর সকলকে উনি ডিটেকটিভ নভেল ও বাস্তব ভিত্তিক ক্রাইম উপন্যাসের মৌল প্রভেদ বুঝিয়ে দিলেন।

কিন্তু এর কিছু পরেই কবি পুলিশ সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ উক্তি করেছিলেন।

এর প্রথমটিতে আমি খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু পুলিস সম্পর্কে ওঁর দ্বিতীয় মতটি আমি মেনে নিতে পারিনি।

উনি বলেছিলেন যে পুলিশের জনসেবার ও সমাজসেবার যত সুযোগ ও সুবিধে আছে তা কোন মিশনারী সাহেবদেরও নেই। কিন্তু সেই রকম কোনও চেষ্টা তো ওদের মধ্যে আমরা দেখি না। কিন্তু ওর পরের উক্তিটি পুলিশকে ওঁর ভুল বুঝার পরিচায়ক। উনি হঠাৎ সকলকে শুনালেন ঃ পুলিশ যদি কারুর পা'ও জড়িয়ে ধরে তো লোকে মনে করে যে তার জুতো জোড়াটা সরাবার মতলব।

[কবিগুরুর এই উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছিলাম। এরপর হতে আমি শুধু ক্রাইম উপন্যাস লিখেছি, এবং অপরাধ বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করে অপরাধ বিজ্ঞান শিখেছি। তবে এর আগে কয়েকটা অন্য বিষয়ে পুস্তক বার হয়েছিল।]

এরপর আমি শান্তি নিকেতনেও ওর সঙ্গে দেখা করেছি। উনি তখন আট সেকসনের ছাত্রীদের নিকট ভাষণ দেবার কালে বলছিলেন ঃ যদি আমপাতা এঁকে তলায় লিখে দাও কাঁঠাল পাতা। তাহলে সেটা আমও নয়, কাঁঠালও নয়। সেটা হবে তোমার মনের পাতা। এরপর ইংরাজীতে উনি তাদেরকে শ্রেষ্ঠ আর্ট সম্বন্ধে বললেন যে, ফিউয়েস্ট লাইন বাট মোর এক্সপার্ট।

[এখানে উল্লেখ্য এই যে উনিই গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' উপাধি দিয়ে ওই নামে তাঁকে সম্বোধন করেছিলেন।

সর্বশেষ ওর শব যাত্রার সঙ্গে যাবার আমার ডিউটি পড়েছিল। ঐ কালে এক দুষ্ট যুবক বলে বেড়াতে লাগল যে শবদেহ হতে ওর কয়েক গাছা শ্বেতশ্মশ্রু সে রেলিকশ রূপে সংগ্রহ করেছে। কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটতে আমি দেখিনি। ওতে আমাদের স্পষ্ট সতর্ক দৃষ্টি থেকেছে।

ওই ছোকরার বাড়ী তল্লাস করে ঐ কয়টি আমরা সংগ্রহ করি ? ওগুলি আসল বা নকল তা বুঝা গেল না। আমাদের ইংরাজ ডেপুটি সাহেবের নির্দেশে ওগুলি গঙ্গাতে ফেলে দেওয়া হয়। নচেৎ ঐ গুলি আরও জাল হতো ও ভবিষ্যতে কবির যা দাড়ি পাওয়া যেতো তার ওজন হতো কয়েক টন]

ওঁর মৃত্যুর কিছু আগে শৈল মুখার্জির সঙ্গে ওঁর দেখা করিয়ে দিয়েছিলাম। পত্রযোগে উনি আমাদের যাবার অনুমতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর বাড়ীর এক মহিলা আমাদের বললেন ঃ এভাবে বাবা মশাইকে বিরক্ত করে মেরে ফেলবেন। আমাদেরকে ওর সংগে দেখা করতে না দেওয়ার জন্যে শৈলজাবাবু একটা অভিযোগ পাঠালে, উনি তার প্রত্যুত্তরে লিখেছিলেন ঃ আমার মধ্যে যেটুকু আগুন আছে তা দিয়ে আজ আর সারা বাড়ী আলোকিত করা যায় না। ওটা দিয়ে ঘরের কোণে মাত্র একটা প্রদীপ জ্বালানো যায়। এজন্য তোমরা কি আমাকে ক্ষমা করবে না।

তবে এর আগে আমি আর একবার রবীন্দ্রনাথকে কাছাকাছি দেখেছিলম। বরানগরে প্রশান্ত মহলানবীশের বাগান বাড়ীতে। সেখানে **P E N** ক্লাবের মিটিংয়ে আমিও থেকেছি। সভাপতিরূপে বক্তৃতাতে উনি একজন মুশলীমকে ঐ প্রতিষ্ঠানে

রাখতে সকলকে উপদেশ দিয়ে জসীমুদ্দিনের নাম ওর জন্যে সুপারিশ করেছিলেন। এর আরও আগে একবার তাঁকে দেখিছিলাম। কলকাতা য়ুনিভার্সিটির কনভোকেসন সভাতে উনি সেইবার সর্বপ্রথম প্রধান বক্তা রূপে সেখানে প্রথমবার বাঙলাতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে অন্যান্য বক্তব্যের পরে উনি বলেছিলেন যে, স্যার আশুতোষ সর্বপ্রথম এম. এ'তে বাঙলাকে একটি সাবজেকট করেছিলেন। এখন ওঁর পুত্র শ্যামাপ্রসাদ এখনকার ভাইস চান্সেলার রূপে কনভোকেসনে সর্বপ্রথম বাঙলাতে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করলেন। এরপর তৎকালীন ইংরাজ গভর্নর ক্যাম্বেলার তাঁর বক্তৃতার মধ্যে একটি অদ্ভুত কথা শুনিয়ে বললেন যে, এককালে রবীন্দ্রনাথকে বাঙলার অধ্যাপক করবার প্রস্তাবের প্রতিবাদে বলা হয়েছিল যে 'হি ইজ নট এ কোস্টলী পণ্ডিত, কিন্তু পরেতে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে দেখলো ও বুঝলো যে হি ইজ ক্রিয়েটার অফ কোস্টলী ল্যাঙ্গুয়েজ।

এর আগে ওঁর গৃহেতে একদিন রবীন্দ্রনাথ বলে ছিলেন যে, যে সব বই চলিত ভাষাতে না লিখে সাধু ভাষাতে লেখা হয়েছে, সেই সব জীবনী ও উপন্যাস প্রভৃতি বই লেখা পরে কেউ আর পড়তো না। এতে শ্রোতাদের মধ্য হতে একজন বলে ছিলেন ঃ "আপনার নৌকাডুবি বইটা, কিন্তু সাধু ভাষাতে লেখা। এর উত্তরে কবি গুরু শ্রোতাদেরকে বলেছিলেন। 'এ্যাঁ তাই নাকি! তাহলে ওটাও ডুবলো। এর পর ঐ দিনই কবি গুরু ওঁর তরুণ বয়সের একটি কাহিনী শুনিয়েছিলেন। ঐ কালে মাত্র কতিপয় লেখক ছিলেন। গুরুদাস চাটার্জি তখন সবে তাঁর প্রকাশনী কোম্পানিটী খুলেছেন। কিন্তু উনি লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু—তবু মুখে মুখে উনি বহু জনের চাইতে বেশী জ্ঞানী। অত্যন্ত প্রতিভাধর ও সৎ ব্যক্তি। উনি ওঁর ওই অসুবিধা এড়াতে বিভিন্ন রঙ্গের কয়েকটি কৌট তাঁর র‍্যাকেটে রেখেছিলেন। এক এক জন লেখকের জন্য এক একটি কৌটা রাখা ছিল। তাতে উনি লেখকদের প্রাপ্য বই বিক্রয় করা অর্থ জমা রাখতেন। একদিন তরুণ রবীন্দ্রনাথ ওঁর দোকানে এসে ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেস এই যে, ওঁর কটা বই এযাবৎ বিক্রয় হয়েছে। এতে উনি কবির নাম জিজ্ঞাসা করলেন ও আরও তাঁকে বলে ছিলেন ঃ 'এ্যা! তুমি রবীন্দ্রনাথ। নহিষীর পুত্র। হ্যাঁ। তোমারটা—হ্যাঁ। চলছে। এবার উনি ওটা হতে আট আনা বার করে কবিকে বলে ছিলেন। 'এই নাও। আটআনা। তোমার মাত্র একখানা বই বিক্রয় হয়েছে। কমিশনে বাদে এই আট আনা তোমার প্রাপ্য। এতে রবীন্দ্রনাথ ওঁর নিকট ওই ক্রেতার নাম ও ঠিকানা জানতে চাইলেন গুরুদাস চ্যাটার্জি অবাক হয়ে কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কেন! ওর নাম কেন? এতে কবি ওঁকে উত্তরে বলেছিলেন। 'তাহলে ওই ভদ্রলোককে একদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতাম। অন্ততঃ ওই একজন ভদ্রলোকও তো একটা কিনেছেন।

[উল্লেখ্য—এই যে, ওই একই বই খালি এযাবৎ কয়েক খানি কবিতা বিক্রয় হয়েছে।]

সপ্তম অধ্যায়

মাত্র বার মাস পূর্বে আমি বদলি হয়ে বড়বাজার থানা হতে জোড়াসাঁকো থানাতে এসেছি ! মামলার ও জটিলতার বিচারে বড়বাজার তখন ভারতের সর্ব বৃহৎ থানা। এর পরেই ঐ বিচারে জোড়াসাঁকো থানা তখন ভারতের দ্বিতীয় একটি সমস্যা সংকুল পুলিশী থানা। এই জোড়াসাঁকো থানার ওল্ড অফেণ্ডার রেজিস্টারে তখন তিনশ পুরানো পাপীর নাম নথীভূক্ত থেকেছে। এবং তাদের মধ্যে ২৬০ জনকে ওই এলাকার বস্তীগুলিতে উপস্থিত দেখানো হয়েছে।

বড়বাজার থানার এলাকাতে কোকেন ডেনগুলো আমি উতখাৎ করে দিতে পেরেছিলাম। সেই একই কাজ এই থানাতে এসেও আরম্ভ করলাম। আমার এই সফলতার মূলে ছিল তৎস্থানের পুরানো পাপীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে খবর সংগ্রহ করার উপর।

এই সময় আমি লক্ষ্য করি যে পুরানো পাপীরা ও বেশ্যা নারীরা পানের সঙ্গে কোকেন খাবেই, নইলে তাদের মধ্যে অপরাধ স্পৃহা ও যৌন স্পৃহা কমে যায়। তাই অবৈধ কোকেন ডেনগুলি বন্ধ হওয়া মাত্র অপরাধ ও বেশ্যা বৃত্তির ক্রমাবনতি ঘটে। আমি এই বিষয়ে গবেষনা ভিত্তিক একটি দু'শ পাতার থিসিসের মত একটি প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়েছিলাম। আমাদের কমিশনার সাহেব ওটি গভর্নমেণ্টের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওটাতে আমি একটি পৃথক আইন তৈরীর জন্যও আবেদন রেখেছিলাম।

কয়েক মাস পরে হঠাৎ দেখলাম ডেঞ্জারাস ড্রাগ এ্যাক্ট নামে একটি তৎ সম্পর্কিত আইন ভারত গভর্মেণ্ট বিধিবদ্ধ করেছেন।

জোড়াসাঁকো থানায় প্রবেশ করে বুঝতে পারি যে সেখানে পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রশাসন এক এক রকম হয়। সত্যেন মুখার্জির মত দুঁদে কর্মক্ষম ও সেই সঙ্গে সৎ অফিসার সে যুগে দুর্লভ ছিল। কড়া ও সৎ উর্ধতনদের আমারও পছন্দ। কারণ এদের কাছে ভালো কাজের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। চার মাস পূর্বেই এই থানাতে জয়েন করার প্রথম অভিজ্ঞতা আমি তখনও ভুলি নি।

'আমি কাঁচা খেয়ে ফেলবো। আজই একজনকে আমি খাবো। ইনচার্জ অফিসার সত্যেন মুখার্জি কজন নিম্নপদস্থ কর্মীর উদ্দেশে চেঁচাচ্ছিলেন, আপনারা ছুটি নিন কিংবা বদলি হয়ে যান, নইলে আপনাদের খতম করবো। 'রহমত মি'য়ার জুয়া ও কোকেন ব্যবসা চলছে কী করে। য়্যা ? আপনারা কিসসু করেন না, কেউ কিসসু দেখেন না।

ইতি মধ্যে এক ধনীব্যক্তি মোটর থেকে নেমে, প্রদর্শনী দ্রব্যের মতো আঙুলের হীরের আংটিগুলি উঠিয়ে থানায় ঢুকলেন এবং সত্যেনবাবুকে বললেন, 'আপনি এ থানায়

এসেছেন শুনে আলাপ করতে এলাম। হেঁ, হেঁ, আপনাদের ওপরওয়ালাদের সঙ্গে আমার খাতির আছে। আপনি নিশ্চয় আমার পরিচয় শুনে থাকবেন। সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ তাঁকে বললেন 'মশাই আপনি তো একজন অ্যারিস্ট্রোকেট দালাল। নিম্নপদী ও নবাগত কর্মীদের নষ্ট করে চরিত্রহীন করাই তো আপনাদের কাজ। আপনি ফের এখানে এলে ফাটকে বন্ধ করে দেবো। এই দালাল আর বাস্তু উকিলদের আমি থানায় ঢুকতে দিই না। [থানায় প্র্যাকটিশ করা কিছু উকিল ছিল] ভদ্রলোক আর ওখানে অপেক্ষা করেন নি। তবে—এই একটি ঘটনা হতে এই থানা ইনচার্জ সত্যেন বাবুর প্রকৃত চরিত্র বুঝে নিয়েছিলাম।

বাতাসী-বিবির এই ডেরাতে তার বেতন ভুক দুজন জোয়ান স্বামী কাম (Cum) রক্ষী ছিল। ওরা দিনেতে ওঁর বডিগার্ডের কাজ ও রাত্রে তার সেবা করতো এই আড্ডাটি ছিল বিখ্যাত এক নামী স্মাগলারের। তার ঘরের মধ্যমঅংশ দেওয়াল ঘুরিয়ে ওরা পালাতে পারতো। নিচেও কোন লোক নেই। একতলার ছাদ থেকে আঙটা টানলে ছাদের সিলিঙে সাঁটা চৌকো অংশসহ মই নিচে নেমে আসে, অথচ মনে হবে ওই আঙটা কোনও-কিছু টাঙাবার জন্য তৈরি করা হয়েছে। উপর হতে নারকেল-মালা নেমে এলে কোকেন খোর ব্যক্তি তাতে মূল্য রাখে। এ সম্পর্কে আমি আগে কিছু বলেছি। কে, বা কারা এসব বিক্রি করে তা প্রমাণ করা যায় না।

আমি সনাক্তর জন্য রঙ ছোঁড়া পিস্তল ব্যবহার করতাম। ওদেরজনৈক দস্যু, নেতা শয্যায় দেহ এলিয়ে পিস্তলের গুলিতে বালব ভেঙে আলো নেবাতেন। আমার লেখা অধস্তন পৃথিবী 'খুনরাঙা রাতি' ও 'অন্ধকারের দেশে' প্রভৃতি রচনায় এদের বিষয়ে হুবহু বলেছি। বস্তি অঞ্চলে এনে গুম করা ওদের সাধারণ ঘটনা।]

ওদের কোন এক গুন্ডা-সর্দার উঠানে নিদ্রা যেতো। রৌদ্র উঠলে কেউ তার চোখে রুমাল চাপা দিত। কিছু পরে চারজন তরুণী তাকে খাটিয়া সুদ্ধ ঘরে তুলে নিয়ে যেতো। সেখানে সে খাটিয়ায় বসে গড়গড়াতে মুখ দিত। তার পাঞ্জা দেখলে দলের লোকেরা তাকে মদত দিত।

এরই মধ্যে এই এলাকাতে অন্য আর এক সমস্যাও দেখা গেল। আমার এক বন্ধু কর্মী মহম্মদ মহসীন দুঃখ করে বলেছিল যে, এই সব লোকদের মধ্যে এজেণ্ট প্রপোগেটার কাজ করছে। হ্যালিডে পার্কে মুশ্লীম এবং গিরিশ পার্কে হিন্দু বক্তা সাম্প্রদায়িকতা প্রচাররত। এতদিনে বাঙালী মুশ্লীমরাও এতে কিছুটা প্রতারিত। বন্ধু মহসীনের সাত পুরুষের ভিটায় পাতকুয়া খুঁড়ে বহু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। বাড়ির লোকেরা মূর্তিগুলি লুকোবার চেষ্টা করলে সে বাধা দেয়। তবে—কলকাতায় প্রত্যেক পুলিশ-কর্মী তখনও অসাম্প্রদায়িক ছিল। কারণ তারা নিজেদের হিন্দু-মুশলীম না-ভেবে কেবল পুলিশ হিসাবেই ভেবেছে। তৎকালে পুলিশের কোন জাত ছিল না।

জোড়াসাঁকোর মতো সমস্যা সংকুল থানা গোটা ভারতে তখন আর একটিও ছিল না।

জনৈক তরুণ মুশলীম দুহাতে পেট চেপে থানায় এসে বললে 'মেরি বুনাই দিল্লাগি করকে ছুরি মার দিয়া। জোর করে তার হাত পেটের উপর থেকে সরানো মাত্র নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে পড়লো। থানাসুদ্ধলোক তাতে অপ্রস্তুত এবং হতভম্ভ। একটি সিনেমা হলে বার আনার সিটে বসে কয়েকজন মস্তান ছোকরা 'আফ্রিকা স্পিকস্' নামে একটি জঙ্গল ফিলম দেখছিল। পরনে তাদের লুঙ্গি ও লাল গেঞ্জি, আর কোচরে তাদের ইট। হঠাৎ পর্দাতে একটা বাঘ বেরিয়ে ডেকে উঠেছে। ওই বাঘের ডাক শোনামাত্র ওদের একজন একটা ইট পর্দাতে ছুঁড়ে বলে উঠেছিল 'মার শালাকো বাঘ'। পর্দা ছিঁড়ে যাওয়াতে ওই বাঘটা মরেছিল। এই ছেলেটি ছিল ঐখানকার একটি মল্লান সর্দার আজমাল খাঁর পুত্র। জনৈক উকিল জামীর সাহেব ওই ছেলেটিকে জামিন নিতে এসে বলেছিলেন, ঐ তরুণটি বাঘ দেখে ভয় পেয়ে ঐ কাজ করেছে। কিন্তু আমি তার জামিন নামঞ্জুর করে বলেছিলাম, মশাই, বাঘ দেখলে লোক পালায়। তাকে কেউ ইঁট মারতে যায় না।

এইরূপ কয়টি ঘটনা হতে এই থানার এলাকাটির তৎকালীন পরিস্থিতির একটি ধারনা করা যাবে। এখানে আমার একমাত্র আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের বাড়িটা। এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করার সুযোগে আমার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেছিল।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর বাড়ীতেও আমাকে কবি হেমেন্দ্রনাথ রায়ই নিয়ে গিয়েছিলেন। ওর বাড়ীর নক্সাকাটা কাঠের সিঁড়ি এবং বসবার ঘরে প্রাচ্য রুচিসম্মত আসবাব পত্র দেখে আমি তখন মুগ্ধ। উনি আমাদেরকে ওঁর শিশুদের জন্য লেখা সদ্য নাটক পড়ে শুনালেন। 'দ্রম পড়ে, দ্রাম পড়ে, শব্দ কল্প দ্রুম পড়ে, ভোরের টিকে জ্বলিবে লণ্ঠন।' আদি কয়েকটা পঙক্তি উনি আমাদের শুনালেন। এরপর কথা প্রসঙ্গে উনি আমাদের বলেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে লেখা ছেড়ে আঁকার দিকে ঝোঁক এসেছে। আমিও এখন আঁকা ছেড়ে লেখা ধরেছি'।

[বিঃ দ্রঃ—এর বেশ কয়েক বৎসরের পরের ঘটনা। একদিন শুনলাম অবনীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব বাড়ীটি বিক্রয় হয়ে গেছে। পৃথিবীর বিখ্যাত চিত্র শিল্পী ও ওরিয়েণ্টাল আর্টের স্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথ তাঁর পৈতৃক বাটী হতে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। তখন চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। সকলেরই চোখে জল।

উনি গলবস্ত্র হয়ে ওঁদের বাগানের প্রতিটি লতা, প্রতিটি তরুলতাদির কাছে বিদায় নিচ্ছেন ও বলছেন। হে তরু, তুমি আমাকে বিদায় দাও। হে লতা, তুমি আমাকে বিদায় দাও, ঐ সব দেখে ও শুনে পড়শীরা দুঃখে ডুগরে কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু আমি তখন ভাবছিলাম অন্য কথা। কয়েক বছর আগেও ওদের বাড়িতে পিছনের হলঘরে কাছারিতে বহুকর্মী কর্মরত থেকেছে। কাউকে দেখলে একদল দ্বারি দাঁড়িয়ে উঠে বলেছে আইয়ে মহারাজ। উপরন্তু উনি বংশানুক্রমে মহাধনী এক পরিবারের সন্তান। নিজেও যথেষ্ট অর্থ উপায় করেছেন। তদপরি উনি অত্যন্ত সৎ ও নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও এমন ভাবে ওকে পৈত্রিক পবিত্রতম ভিটা

বাড়ী ও ভারতের শিল্প তীর্থ রূপ ঐ গৃহ ছেড়ে যেতে হচ্ছে কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর আমি আজও পাইনি ।]

এই চোর গুন্ডা অধ্যুষিত স্থানটিকে আমি এর মধ্যেই আমার ক্রিমীনলজীর গবেষণার একটি গবেষণাগার করে নিয়েছি। উপরন্তু রামবাগান নামক স্থানে রূপ-গাছি নামের বিখ্যাত অভিজাত বেশ্যা পল্লীটি এই এলাকাতে। খুন খারাপি ও ছিনতাই তখন প্রায়ই হয়েছে। তবুও ধনীলোকের সেখানে যাতায়াতের বিরাম নেই। পূর্বে বহু ইংরাজ এই পাড়াতে এসেছেন। তাদের জন্মিত পরুষ্টো-দেহী বাছা বাছা রূপসী মেয়ে তখন সেখানে। কর্তৃপক্ষের ধারণা আমি একজন সচ্চরিত্র তরুণ। তাই এই এলাকায় শান্তি রক্ষার ভার আমাকেই দেওয়া হলো।

[এই এলাকাতেই ও তার চতুপার্শ্বে বহু গায়িকা ও মঞ্চ এবং সিনেমা আর্টিস্টের বসবাস। ঐ কালে মহিলা অর্টিস্ট সংগ্রহ করতে হলে এই খানেই আসতে হতো। গৃহস্থ বাটির কোন মহিলা তখন এই সবে থাকেন নি। গায়িকা ইন্দুবালা দেবী, আশ্চর্যময়ী, যার বিখ্যাত গান 'গঙ্গী ময়রা হার মেনেছে। "ভূত ছুঁতে আসে খাট, নূর সুন্দরী সরযুবালা', এই স্থানের নিকটেই থেকেছেন, ইন্দুবালা দেবী আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন, এবং এখানকার বহু সংবাদ আমাকে দিয়ে সাহায্য করেছেন। ওঁর মুখেই শুনলাম যে এখানকার মেয়েদের কষ্টার্জিত অর্থের ভাগ গুন্ডারা নিয়ে থাকে। এই গুন্ডাদের উৎখাত করে আমি এদেরকে রক্ষা করেছিলাম। সেই সাথে এখানে আসমানী গুণী লোকেদের অর্থ ও দ্রব্য ছিনতাই'ও বন্ধ করেছিলাম।

এখানে আমার সমাজসংস্কার আরম্ভ হয়। এই সব ধনী ভিজিটারদের নিকট হতে, যাদের মধ্যে রাজা মহারাজা, ব্যরিস্টার মাননীয় লোক ও শিক্ষক ও রাজনৈতিক নেতারা এবং ধর্ম গুরুরাও থেকেছেন, তাদের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে, আমি এখানে একটু দূরেতে এ পাড়াতে দৈবাৎ জন্মানো কিশোর ও কিশোরীদের জন্য একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলাম। ওদের বাড়ীর কিছু তরুণকে ঐ সব ধনী ভিজিটারদের আর্থিক সাহায্যে আমি কলেজ স্ট্রীটে বহু চায়ের ও অন্যান্য দোকান খুলিয়ে দিয়েছি। পুলিশ থেকে তখনও টিসপ ও হোটেলের লাইসেন্স দেওয়ার রীতি। এইসব লাইসেন্স আমি ওদেরকেই পাইয়ে দিতাম। উপরন্তু ঐ পাড়ার বহু ছেলের সঙ্গে ঐ পাড়ার বহু মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমি শহরে একটা কাস্টলেশ সোসাইটিও সৃষ্টি করেছিলাম।

[এই সময়ে সিমলা স্ট্রিটে সায়েন্স কলেজের প্রফেসার ডঃ বি. সি. ঘোষ 'সরযু সদন' নামে একটা নারী কল্যাণ আশ্রম খোলেন। এইটির গঠনে আমি ওকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলাম। বেশ্যা বাড়ীর ভালো হয়ে যাওয়া উচ্চশিক্ষা প্রয়াসী কয়েকজন নারীকে উনি আমার অনুরোধে ওখানে ভর্তি করে নিয়েছিলেন]

এই পাড়ার সংগঠন, ওদের নিজস্ব আইন, কানুন, শ্রেণী বিভাজন ও পঞ্চায়েৎ ও নিজস্ব আইন, বিচার ও পুলিশ বিষয়ে, আমি যা গবেষণা করে জেনেছিলাম, তা আমি আমার অপরাধ বিজ্ঞান তৃতীয় ও অষ্টম খণ্ডে বিশাল ভাবে বিবৃতি করেছি।

কিন্তু আমার ও কার্যতে, গুণ্ডাদের অত্যন্ত আর্থিক অসুবিধা ঘটে। এজন্য যে ওরা আমাকে খুন করার ব্যবস্থা করেছে তা আমি একটুও জানতে বা সন্দেহ করতে পারি নি। কংগ্রেসীদের উৎপাত কমাতে তখন রাতে অন্যত্র হল্লা ডিউটি পড়েছে, তাই বিনা সিপাহী নিয়েই আমি ঐ সময় টহল দিতে ওখানে যাই। ওখানে আমি চল্লিশ বছরেরনিচের কাউকে যেতে দিতাম না। তরুণদের ওখানে দেখলেই ঝাড়ু কেসে [সুইগিং এ্যারেস্ট] তাদেরকেও গুণ্ডাদের সাথে গ্রেপ্তার করে থানাতে আনা হতো। এর কারণ তরুণদের ভালো বংশ তৈরী করার জন্য দৈহিক সুস্থতার প্রয়োজন থেকেছে। কিন্তু প্রৌঢ়দের দ্বারা প্রজনন কার্য শেষ হওয়াতে তাদের সুস্থকায় ও রোগমুক্ত ছেলেপুলে হয়ে গিয়েছে, উপরন্তু এঁরা চেঁচামেচি ও হৈহুল্লাড় কম করে ও ঐ মেয়েগুলোদেরকে তাদের প্রাপ্য ফিজের বেশী, এবং তাদেরকে দৈহিক কষ্টও কম দিয়ে থাকে। কিন্তু এদের বিষয় ভাবলেও ক্ষতিগ্রস্ত গুণ্ডা ও দালালদের পুনর্বাসনের বিষয় আমি ভাবি নি। তবে ওখানে বাবু রূপে আসা দুজন ডাক্তারকে সপ্তাহে ওখানে এসে রোগাগ্রস্তা মেয়েদের চিকিৎসা করাতেও আমি রাজী করিয়েছিলাম। গুণ্ডাদের ঘুষ দিয়ে আত্মরক্ষা করতে না হওয়ায়, ধনী বাবুরা ঐসব মেয়েদের ঘণ্টা প্রতি ফিজ, আমার অনুরোধে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই দিন সিপাহীরা হল্লা ডিউটিতে থাকাতে আমি একাই যথারীতি কোনও অস্ত্র না নিয়েই ওখানে ঠহল দিতে থানা হতে বেরোবো। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। ওপার হতে একটা গলা ভেসে এলো, 'সে কোথা হতে বলছে, এটা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, সে, ফিক ফিক করে ও ডুগরে ডুগরে হেসে বললো, 'আমার নাম খুকু ! খুকুরাণী। কিন্তু যে জায়গা হতে বলছি, সে জায়গাটার নাম করতে নেই। দাদা।' এতে আমি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে তাকে বল্লাম 'এ্যাঁ আপনি ভেবেছেন কি ? 'দাদা বলছেন, আবার হাসি ? এতে মেয়েটি একটু ভীত হয়ে উত্তর করলো, বিশ্বাস করুণ দাদা, আমি ইচ্ছে করে হাসিনি, প্রতিদিন জোর করে আমরা হাসি অভ্যাস করি। তাই আমরা ইচ্ছা না করলেও অভ্যাসের দোষে ওটা বেরিয়ে আসে। আপনি গত কয়দিন লোকজন সঙ্গে না নিয়ে এখানে আসেন। আমার চাকরের মুখে শুনলাম যে কালই আপনাকে গুণ্ডারা খুন করতো। ওদের ভাত ভিত্তি বন্ধ হওয়াতে ওরা না খেয়ে মরছে। কিন্তু আপনি কাল এখানে আসেন নি। আজ ওরা দয়াল মিত্তির লেনের মোড়ে আপনার জন্যে ছোরা, ছুরি নিয়ে অপেক্ষা করছে।

গত কাল রাত বারোটার পর ওখানে যাবার জন্য বেরিয়েছিলাম ঠিকই। তখন সেণ্ট্রাল এভিনিউ মাত্র বিডন স্ট্রীট পর্যন্ত তৈরী হয়েছে। তখনও পথেতে মোটা ড্রেন পাইপ পড়ে রয়েছে। মধ্যে মধ্যে ওগুলোর ভিতর হতে ঘড়, ঘড়, আওয়াজ আসে। ফুটপাতে শুয়ে থাকা ভিখারী ও ভিখারীনীরা ওর মধ্যে সন্তানোৎপাদন করে।

ঐ সময় কাজী নজরুল ইসলাম প্রায়ই গ্রামাফোন কোম্পানী হতে রাত্রে ওই পথে বাড়ি ফিরতেন। একজন পথ প্রদর্শীর সহিত অন্ধ গায়ক কৃষ্ণ চন্দ্র [কানা কেষ্ট] কেও গ্রামাফোন কোম্পানী হতে ও পথে বাড়ী ফিরতে দেখেছি। গতকাল ওদের

দুইজনার সঙ্গে মাঝ পথে দেখা হয়ে গিয়েছিল। অন্যরাতের মত ও রাতেও আমরা তিনজনে ওখানে ফেলে রাখা একটা মোটা ড্রেন পাইপের উপর বসে বহুক্ষণ গল্প করেছিলাম। তাতে দেরী হওয়াতে ও পল্লীতে, আর না গিয়ে থানাতে ফিরেছিলাম। এই রাত্রে ও মেয়েটিকে যে বিশ্বাস করেছিলাম তা নয়। তবু সাবধান থাকা ভালো। একটা গুলি ভরা পিস্তল কোমরে গুঁজলাম। জনদশেক তাগড়া কনেস্টবলকেও নিলাম। এর পর দয়াল মিত্র লেনের সেই মোড়টা ওদের দিয়ে ঘেরাও করালাম। কিন্তু ওরা যে এতটা প্রস্তুত তা তখনও বুঝিনি। চারি দিক হতে ওরা সোঁ, সোঁ করে ছোরা ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে। আর সেই সঙ্গে বড়, বড়, ইট' ও আমাদের মাথাতে পড়ছে।

কয়জন সিপাহী মাথাতে ও ঘাড়েতে জখম হলো। আমার বাম কাঁধটাও ফুলে উঠেছে। সৌভাগ্য এই যে সঙ্গে পিস্তল এনেছিলাম। নইলে ওই রাত্রেই আমি ওখানে খুন হতাম। আমার পিস্তল গর্জে ওঠা মাত্র ওরা পালালো।

দুইজন সিপাহীকে তখুনি ট্যাকসি করে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। আমি হাসপাতাল হতে পট্টি ধরিয়ে কাতরাতে, কাতরাতে, থানার কোয়ার্টার্সে ফিরে এলাম। আমার সমগ্র দেহমন, ওই মেয়েটির প্রতি ততক্ষণে কৃতজ্ঞতাতে ভরপুর। তখুনি ফোন করে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তার বাড়ীর ফোন নম্বর ও ঠিকানা জেনে নেওয়া হয়নি। ও'পাড়াতে বহু বাড়ীতেই তখন ফোন ছিল। ঠিক করলাম পরের দিন রাত্রের রাউণ্ডের সময় ওকে খুঁজে বার করবো। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যাতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ গোয়েন্দা পুলিশ হতে থানাতে একটা টেলিফোন মেসেজ এলো।

ওতে লেখা ঐ রাত্রে, এই এলাকার কোনও এক স্থানে গৃহ তল্লাস করা হবে। ভোর রাত্র চারটার সময় যেন ওদের কয়জন অফিসারকে ওতে সাহায্য করবার জন্যে ও ওদের প্রোটেকসনের জন্য আটজন ইউনিফর্মড কনেস্টবল ও একজন ইউনিফর্মড অফিসারকে প্রস্তুত রাখা হোক। এই বিভাগের প্লেন ক্লোদড্ অফিসার'রা ঐ সময় থানা হতে ওদের নিয়ে কোন এক গন্তব্য স্থলে যাবেন।

ওদের সব কিছু বিষয়েই গোপনতা। আমাদেরও ওরা তা পূর্বাহ্নে জানাবেন না। ঐ রাত্রে ওদের প্রটেক্সন দেওয়ার ভার আমার উপর দেওয়া হলো। ঐ ভোর রাত্রে ওরা যথারীতি এলেন। আমিও আমার দলবল নিয়ে ওদের সঙ্গে চলেছি। হঠাৎ দেখলাম ওরা কাজী নজরুল ইসলামের বাড়ীর সম্মুখে এসে থামলেন। কাজী সাহেবের সঙ্গে যে আমার ঘনিষ্টতা আছে তা ওদেরকে কেউ জানালে আমার বিপদ। ও'রা কর্তৃপক্ষকে তা তখুনি গোপনে জানিয়ে দেবেন। কারণ ওঁর উপর কর্তৃপক্ষের তখনও কড়া নজর। সেই ভয়ে আমি ওঁর বাড়ীতে কখনও যাই নি। যাই হোক। তখুনি ওর বাড়ীটি ঘেরাও করা হলো। কিন্তু—ততক্ষণে ওর বাড়ীর সম্মুখের একটা বাড়ীর বারান্দা থেকে একটি মেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল' 'ও দিদি অতিথি এসেছে শাঁক বাজাও, দুয়ার খোলো'।

এতো ভোর রাত্রে ঐ মেয়েটির ওখানে আবির্ভাবে আমরা অবাক, বুঝা গেল যে, আদালত হতে নেওয়া সার্চ ওয়ারেণ্টে ভুল নম্বর দেওয়া হয়েছে। গুপ্তচর ওই বাড়ীর নম্বর দিয়েছিল। ওই বাড়ীতে খানাতল্লাস করলে বামাল পাওয়া যেত। কিন্তু এটা আমি বুঝলেও ওরা তা বুঝলেন না। কাজী সাহেবের বাড়ীতে ধাক্কা দিতেই ও'র বাড়ীতে আলো জ্বলে উঠলো। কাজী সাহেবের ভোরেতে জেগে উঠা অভ্যাস। উনি নিজেই দরজা খুলে দিলেন। কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে অভিজ্ঞ কাজী সাহেব আমাকে না চেনার ভাণ করেছিলেন।

ঐ বাড়ীর প্রতিটি বাক্সো ও তৈজস পত্র তন্ন তন্ন করে উল্টে পাল্টে দেখা হলো। তোষক ও একটা লেপও ছেঁড়া হলো। কিন্তু কোথাও আপত্তিকর কোনও দ্রব্য বা পত্র পাওয়া গেল না। কবি জায়া নীরবে সব কিছু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। সম্ভবত ও'র তখন ভাবনা এই যে ও'কেই ফের ওই লণ্ড ভণ্ড করা ও সব গুছাতে হবে। হঠাৎ এই সময় ওদের একজনের লক্ষ্য পড়লো তাকের উপর একটা ছোট বাক্সোতে। ওর ওপর কিছু ফুল রাখা ছিল। ওদের একজন ও দিকে হাত বাড়াতেই, কাজী সাহেব আর্তনাদ করে উঠে বললেন। 'না না'! এবার ও'রা বুঝলেন যে তাহলে বাক্সোর মধ্যেই কিছু রয়েছে। পুলিশকে ধোঁকা দিতে ওর ওপর ফুল রাখা হয়েছে। বাক্সোটি চাবি বন্ধ থাকাতে ও'রা ওটা মেঝেতে আছড়ানো মাত্র কাজী সাহেব ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু ব্যাপার কি? ওর চোখ দিয়ে এত দিন তো আমরা আগুন ঠিকরোতে দেখেছি। কিন্তু সেই চোখ দুটোতে জল কেন?

ওই ছোট বাক্সোটা ততক্ষনে ভেঙে ফেলা হয়েছে, কিন্তু ওটা থেকে কোনও বামালের বদলে এধারে, ও'ধারে গড়িয়ে পড়লো শুধু ছোট ছেলেদের কয়েকটি খেলনা।

পরে শুনলাম যে, ও বাক্সোটা ছিল কাজী নজরুলের অতি প্রিয় মৃত পুত্র বুলবুলের। সে নিজে হাতে ও গুলি ওতে গুছিয়ে, ওটা বন্ধ করে রেখে গিয়েছে। সেই সময় হতে ওটা কেউই খোলে নি। কাজী সাহেব মধ্যে মধ্যে ওটার উপর ফুল রাখতেন। ওই দিন সকালে'ও উনি ওর উপর ঐ তাজা ফুল গুলো রেখে ছিলেন।

এর পরেতে অমনি ভাবে অন্য এক রাতে সেণ্ট্রাল এভিনিউতে ও'র সঙ্গে দেখা হলে, উনি আমাকে খেদ করে বলেছিলেন, 'ভাই, এ তোমরা কি কাজ করলে? আমি বোধ হয় এইবার পাগল হয়ে যাবো।

পরেতে কাজী সাহেবের সহিত আমার এই ঘনিষ্ঠতা আমাদের ইনচার্জ অফিসার ও আমার পুলিশী শিক্ষা-গুরু সত্যেন মুখার্জি জানতে পেরেছিলেন। ও'র অনুরোধে ওর দুই গায়িকা ভাইঝিকে গানের সুর দেবার জন্য গোপনে ও'কে থানা বাড়ীতে, ওর উপরের গৃহেতে আনতে বলেছিলেন। এতে কাজী সাহেব আমার অনুরোধে রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু ও'কে আমি সন্ধ্যের পর থানাবাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে ওপরে নেবার প্রস্তাব করলে উনি তাতে অস্বীকৃত হয়ে উদাত্ত কন্ঠে বলেছিলেন, 'আমি সব সময় সদর দিয়ে হাঁটি। খিড়কীর পথেতে কোনও দিনই আমি

এগোয় নি। যদি এ দেশ কখনও স্বাধীন হয়, তাহলে ও দিনই মাত্র আমাকে ওখানে বন্ধু রূপে নিয়ে যেও।

এরপর বেশ কয়দিন আমার মন খারাপ থেকেছে, ও ঘটনার জন্য আমি দায়ী না থাকলেও, আমি তো ছিলাম ওদেরই সমগোত্রীয় একজন পুলিশ কর্মী।

রামবাগানের বেশ্যা পল্লীর সব কিছুর ভার শুধু আমারই উপর থেকেছে, অন্য কোনও পুলিশ কর্মীর ও অঞ্চলে যাওয়া নিষেধ। কারণ-এর আগে ওখানে পাঠানো অফিসাররা ওদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ওদের শেষ জন অমুক বাবুকে ও অপরাধে বড়বাজার থানাতে বদলি করে আমাকে এখানে এনে ও কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। এই জন্য ওঁর পেটোয়া এক দালাল নিম্নোক্ত একটা গান বেঁধে দূর হতে আমাকে শুনিয়ে গিয়েছিল। পরে আমার অসাক্ষাতে মধ্যে মধ্যে, ঐ সব লোকেরা ওটা গাইত বলে আমি শুনেছি।

"বড়বাজারে অমুক বাবু
খাচ্ছে বসে মেওয়া
পঞ্চু ঘোষালকে করলে রাজা—
রাম বাগানের বেওয়া"

এই দালালটিকে আমি খুঁজে বার করবার আগেই সে এই মহল্লা হতে পালিয়ে বড়বাজারে অমুক বাবুর হুন্দোতে আশ্রয় নিয়েছিল।

পররাত্রে বারোটার পর আমি যথারীতি রামবাগানের মাঠ নামের চত্বরে এসে-ছিলাম। এখানে, ওখানে, এবাড়ী ও বাড়ীতে টানা, টেলিফোনের তার। কিন্তু সেই রাতের ফিক্ ফিক্ করে হাসা, এবং আমার জীবন রক্ষাকারিণী, যার নাম সে বলেছিল খুকুরাণী', সেই মেয়েটার বাড়ীটি কোনটা ?

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ ভদ্রপল্লীবাসী আমার একদা শ্রদ্ধাস্পদ এক মহাপণ্ডিত ও মহাগুরু একটি বাড়ী হতে, সুড়ুত করে বেরিয়ে একেবারে আমারই সুমুখে এসেছেন। দেখি ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে, অযাচিতভাবে আমাকে ওর এখানে আসায় কৈফিয়ৎস্বরূপ বললেন, 'আমি এখানে একজন ভ্রষ্টা শিষ্যাকে মন্ত্র দিতে এসে-ছিলাম। ওর ধর্মীয় আকিঞ্চন এড়াতে পারিনি। তুমি তো জানো বাবা। পাপকে ঘৃণা করতে হয়, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করা মহাপাপ। এর পরেই সুড়ুক করে জনৈক লোক যিনি, ওই যুগের এক প্রধান লেখক ও ওযুগের এক তরুণ কবি ছিলেন, তিনি অর্থাৎ অমুক বাবু একেবারে আমার সমুখে পড়ে গেলেন। সে দিনের ওই তরুণটিকে আমি ভৎর্সনা করলে উনি সেদিন প্রায় কেঁদে ফেলে আমাকে বলেছিলেন, ঘোষাল দাদা ! আপনি আমাকে ফারনেসে তুলে পুড়িয়ে মারুন। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি সিন্ধু দিদির বাড়ীতে গানের সুর নিতে এসেছিলাম। এই দেখুন আমার হাতেতে এই গানের খাতা। অন্য এক তরুণকে আটকালে উনি বলেছিলেন যে এক জ্যোতিষী বলেছেন যে, আমি আর পাঁচ বছর বাঁচবো, তাই যতটা পারি জীবন ভোগ করে নেব। এর মধ্যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার ও একজন নেতার সঙ্গে দেখা হলে

ওরা আমাকে বলেছিলেন "দেখ মিস্টার। মানুষ মাত্রেরই একটা উইকনেস থেকেছে। আমাদের স্ত্রীরা গান জানলে ও আমাদের মনের খোরাক ওরা দিতে পারলে গান শুনতে ও কথা কইতে আমরা এখানে আসতাম না। কিন্তু এটি আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমাদের দেশের ও জাতির প্রতি অন্য অবদানের বিষয় শুধু ভাবুন। কিন্তু অন্য একজন বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিককে আমি আটকালে উনি নিজ ব্যক্তি স্বাধীনতায় আইনী তর্ক তুলে আমাকে বলেছিলেন 'দেখুন। আত্মাকে কষ্ট দেওয়াই একটি মহাপাপ। অন্তত এ পাপে আমি পাপী নই। দেহটা পুড়বার পর তো মান-সম্মান অর্থহীন হবে। তবে আমার আয়ের বাড়তি অর্থ দিয়ে ওই সব গরীব মেয়েদেরকে সাহায্য করছি। আজ্ঞে! আজ যদি আমার জীবন ও যৌবন চলে যায়, তাহলে কি আপনি তা আমাকে ফেরত দিতে পারবেন। সে ক্ষমতা যখন আপনার নেই, তখন আমাকে বাধা দেবার কোনও অধিকার আপনার নেই"। এই ভাবে বহু জনের সঙ্গে আমার ওখানে দেখা হয়। কয়েকজন আত্মীয়ার বিবাহের জন্য নির্বাচিত সৎ মন্য পাত্রের সঙ্গেও। এটার ফলে, পর দিন ওই বিবাহ নাকচ করতে আমাকে ওদের বাড়ীতে দৌড়তেও হলো। কিন্তু সেই খুকু ওরফে খুকুরানীর কোনও সন্ধান পাচ্ছিলাম না।

এইবার ভীড় একটু পাতলা হয়ে গিয়েছে। গোট, গোটা বেলফুলের মালা হাতে ঘোরা লোকগুলো স্থানত্যাগ করছে। এক, একটা করে সব বাড়ীর জ্বল জ্বলে বাল্বগুলো এখন বেগুনি বেড লাইটে রূপান্তরিত।

পানের দোকানের পাটাতনের তলাতে লুকানো মদের বোতল বিক্রী এর আগেই আমার উৎপাতে বন্ধ হওয়াতে ওই দোকানগুলোও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ততক্ষণে এই সুযোগে এবার আমি উপরের বারন্দাগুলোতে টাঙানো চিক গুলোর উপর আমার হাতের টর্চ জেবলে তার লাইটটা ওই সব চিকগুলোর উপর ফেলেছিলাম। হঠাৎ একটা বাড়ীর দ্বিতলে চিকের আড়ালে ধব ধবে সাদা হাত ও একটা রাঙা মুখ দেখে আমি অবাক।

লজ্জিত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য টর্চের আলো নামিয়ে, পরেতে আমার সঙ্গে থাকা সিপাহী দুজনার দৃষ্টি এড়িয়ে ফের টর্চের আলো তার মুখে ফেলতেই সে মৃদু স্বরে বললো "নো, নো, দাদা। ডোণ্ট বি সিলি। পিপল মে থিঙ্ক আদার-ও-ওয়াইজ। এতে আমি ভীষণ লজ্জা পেয়ে ঐ রাতে আর সেখানে থাকিনি। তবে বাড়ীর নম্বরটা জেনে ওর ফোন নম্বর বার করা সম্ভব হয়েছিল।

ঐ রাত্রেই থানাতে ফিরে আর উপরের কোয়ার্টার্সে উঠলাম না। থানার গেটেতে মাত্র একজন সিপাহী পাহারারত, থানার অফিসে তখন কেউই নেই। আমি ফোন তুলে ওখানে রিঙ করলাম। "ওধার থেকে উত্তর এলো যে, কে দাদা। কিন্তু এর উত্তর দিতে আমার কথা আটকে গেল। খুকুরাণীই প্রথম কথা কইলো ও বললো "ও আপনি দাদা, আমি ঠিকই কিন্তু বুঝেছি"। এটা আমাদের অভিজ্ঞতা। এর ব্যতিক্রম কেউই নন, মেয়েরা যেমন বহু কিছু বোঝে ও তা গোপন করতে পারে, তেমনি তারা অনেক

কিছু জানতেও পারে। কয়দিন আপনাকে আমার ফোন করতে বারে বারে ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু ও কাজ করতে ভয় করছিল। সেদিন আপনার বেশী চোট লাগেনি তো! এবার হতে অনেক খবর ঠিক সময়ে আপনাকে আমি জানাবো। আমার চাকরটাকে এইজন্য আমি প্রচুর পারিশ্রমিক দেবো। কিন্তু দাদা, আমি আপনার ছোট বোন হলাম তো!

আমি ওর ওই সব কথা ধীরভাবে শুনে বলেছিলাম, কিন্তু আমার বোনটি আস্তাকুঁড়ে পড়ে থাকবে। আর যত রাজ্যের কুকুর গুলো তাকে চেটে, চেটে খাবে। এটা কোন বোনের কোন ভাই সহ্য করতে পারে? তুমি ভালো হয়ে এ পাড়া হতে ভদ্র পাড়াতে যাও না কেন? বেশ কিছুক্ষণ এর উত্তর পেলাম না, ওপার হতে শুধু নীরবতা, এর পর ফের সে ধীর গলাতে বললো, 'দেখুন দাদা, আপনার বয়স কম। আমার বয়স আরও কম, কিন্তু মেয়েরা ছেলেদের চাইতে সাংসারিক বিষয়ে বেশী অভিজ্ঞ হয়। উপরন্তু এই পাড়ার মেয়েদের অভিজ্ঞতা তুলনাহীন, এখানে যেমন ভদ্র গৃহস্থ বাড়ীর কোনও মেয়েকে, কোনও একজনকে অবলম্বন করে আসতে হয়, তেমনি একজনকে অবলম্বন করেই এখান হতে বেরুনো সম্ভব। আর সেই চেস্টা আমি বারে বারে করছি, ওরা কেউই ভালোবাসার মূল্য দেয়নি, ভালবাসা ওদের কাছে বেচা কেনার সামগ্রী! তাই বারে, বারে আমাকে ঠকতে হচ্ছে। যদি আমি বলি যে আমাকে আপনি' আপনার বাড়ীতে নিয়ে চলুন, আপনি নিশ্চয় আঁতকে উঠবেন, ওতে আপনি রাজী হলেও, আমি আপনার মঙ্গলের জন্যই ওতে রাজী হবো না, কে আমাদেরকে ঘরে এনে তাদের গৃহের পবিত্রতা নষ্ট করবে? এখন আমার মুক্তির এক মাত্র উপায় কোনও শিল্পের আশ্রয় নিয়ে একজন শিল্পী হওয়া, এর মধ্যেই এজন্য একটা ফিল্ম ছবিতে আমি নেমেছি।

এই কথোপকথনের মধ্যে সে কলকাতার এক নামকরা পরিবারের নাম করে বললো, আমি দাদা ওই পরিবারের এক মেয়ে, কিন্তু এখানে আসার জন্য আমি নিজে দায়ী নই। আমার মা আমার ছোট বেলাতে আমাকে নিয়ে একজনের সঙ্গে পালিয়ে আসেন ও তারপর তার বিশ্বাসঘাতকতাতে এখানে এসে আশ্রয় নেন, মা আমাকে বহুকাল এক স্কুলের হোস্টেলে রেখেওছিলেন, কিন্তু কয় বছর পর ওরা সব জেনে আমার নাম কেটে দিলে আমাকে এখানে আসতে ও থাকতে হয়েছিল। আমি তখনও মিথ্যে কথা বলতে শিখিনি, তাই ওদের কাছে সত্য কথা বলতেই আমার এই বিপদ হয়েছিল।"

আমি ওর মুখে এইদিন শুনেছিলাম যে ঐ পাড়াতে হোম হতে সাবালক হওয়ার পর ফেরা বহু মেয়ে আছে। তাই তারা বেশ কিছু ইংরাজী বলতেও পারে। ওতে তরুণদের মোহিত করতে পারাতে ওদের ব্যবসাতে সুবিধা হয়। ওর ওই সব কাহিনী শুনলাম। কিন্তু এরপর ওকে আমার উপদেশ দেবারও কিছু থাকে নি। কিন্তু ওই আমাকে কিছু উপদেশ দিল ও বললো; দাদা আপনার সঙ্গে অন্যদের প্রভেদ এবং আপনার ব্যবহার দেখে এ পাড়ার মেয়েরা মুগ্ধ। কিন্তু দাদা, তবু একটু সাবধানে থাকবেন। আপনি অন্যদের হতে তো সাবধান থাকবেন বটেই!

এমনকি আপনার নিজের হতেও নিজে সাবধানে থাকবেন। শুনলাম, আপনি এখনও বিয়ে করেন নি। একটা বিয়ে না করে এ পাড়াতে না আসাই ভালো। আমি কিন্তু দাদা, এ পাড়াতে আপনার পাহারাদার হয়ে রইলাম। যদি দরকার হয়, তাহলে, আপনাকে আমি বকবো। এরপর সে আমাকে একটা উপদেশ দিয়ে বলেছিল, দেখুন, সমাজের বহু স্তর আছে, প্রতিটি স্তরের কৃষ্টিও বিভিন্ন। এদেরও একটা পৃথক জগৎ আছে, সেইজন্য নির্বিচারে ধর-পাকড় করার সময় এটাও আপনাদের বিবেচনা করা উচিত হবে। আপনি একটি স্কুল এখানে করেছেন, ওতে আমি এক হাজার টাকা বেনামিতে পাঠিয়েছি, কিন্তু এ পাড়ার মেয়েদের পুনর্বাসন তাতে সম্ভব হবে কি? এরা তো কেউ না খেয়ে মরতে পারবে না"।

এই মেয়েটির এই উপদেশ কটা শুনে, কিন্তু আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলাম। ওখানকার মেয়েদের পক্ষে নিযুক্ত হয়ে ওর কি তাহলে, এখান হতে আমাকে তাড়াবার মতলব। কিন্তু তাহলে আমাকে পৃথিবী হতে বিদেয় করার সুযোগ তো দুদিন আগেই সে পেয়েছিল, তাহলে? এবার আমি নিজের মনেই নিজে লজ্জিত হয়ে উঠেছিলাম।

এইদিন বেশী রাত্রে খুশ মেজাজে উপরে উঠে বিছানাতে শুয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ব্রেনকে পরিস্কার রাখতে হলে আলগোছা ভাবে একজন নারীর সংস্পর্শে আসার বোধকরি প্রয়োজন থেকেছে, কিন্তু এর মাত্রাধিক্যে বিপদ থাকাতে, এ পথে না যাওয়াই ভালো।

সকাল আট'টা বেজেছে মাত্র। হঠাৎ-দরজার পাহারাদার সিপাহী উপরে উঠে কোয়ার্টাসের দরজাতে এসে কালিঙবেল টিপে বাজখাই গলাতে বলে উঠলো। হুজুর বাহাদুর। উতারিয়ে। আপকো ডিপুটি সাহেবকো রিপোর্টমে যানে হোগী। বড়বাবু দুসরা কামমে যায়ে। এরপর তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে য়ুনিফর্ম, অর্থাৎ পুলিশের উর্দী পরে আমাকে নিচের অফিসে নামতে হয়েছিল।

এই যুগে রিপোর্ট সিস্টেম কলকাতা পুলিশে একটি অতি চমৎকার রীতি ছিল। দুশো বছর আগে কলকাতা পুলিশের পত্তনের সময় হতে এটি অব্যাহত থেকেছে। প্রতিদিন সকাল দশটার মধ্যে প্রতিটি থানার ইনচার্জ কর্মীকে ঐ থানার গত দিনে ঘটা মামলার কাগজপত্র ও ধরা পড়া আসামীদের সঙ্গে নিয়ে একটি বিশেষ স্থানে থাকা ঐ রিপোর্ট রুমে, উপস্থিত হতে হতো। এই রিপোর্টরুম ছিল তৎ-তৎ বিভাগের ডেপুটি সাহেবদের নিজস্ব আদালত, কারণ ওই কালে ওদের বিচার ও দণ্ডদান ছাড়া হাকিমদের অন্য ক্ষমতা ওদের থেকেছে। এখানে ঐ ডেপুটি কমিশনার আসতেন, এবং তার দুই জন এ্যাসিসণ্টেট কমিশনারের সাহায্যে প্রতিটি থানার মামলাগুলি খুঁটিয়ে বুঝতেন ও আসামীদের বক্তব্য, এবং কোনও অভিযোগ থাকলে তাও শুনে সুবিচার করতেন।

এক এক থানার কর্মীদেরকে পর পর সেখানে ডাক পড়তো। ঐ কালে কোনও ইনচার্জ কর্মী নিজেরা ডেপুটি সাহেবের হুকুম ব্যতিরেকে, এই যুগের মত কোনও

মামলা সরাসরি আদালতে পাঠাবার অধিকারী ছিলেন না, ওঁরা উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে যদি বুঝতেন যে আসামী নির্দোষী, তাহলে তৎকালীন 'জাস্টিস অফ পিস' রূপে তাদের বিশেষ ক্ষমতা বলে, তাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। তাদেরকে আদালতে গিয়ে বৃথা স্ট্যাম্প ও উকিলের ফিজ দিয়ে, অর্থ নষ্ট, সময় নষ্ট ও মনোকষ্ট সহ্য করতে হয় নি। প্রায় ক্ষেত্রে কোনও তদন্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে বা সন্দেহ হলে ওরা ওই মামলা অন্য এক অফিসর দ্বারা কিংবা নিজেরা পুনঃতদন্ত করিয়েছেন, ও তা করেছেন কোনও পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে, কোনও অভিযোগ এলে তা উপেক্ষা না করে তখুনি তার তদন্ত হয়েছে এবং সেই জন দোষী বুঝলে তাকে দণ্ডিত হতেও হয়েছে।

[বিঃ দ্রঃ—পুলিশ কর্মীদের উৎপীড়ক বা উৎকোচগ্রাহী হওয়ার সুযোগ ঐ কালে ছিল খুব কম। প্রতিদিন সন্ধ্যাতে এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার তার অধীন প্রতিটি থানাতে ভিজিট করে খাতাপত্র ও ডাইরী চেক করতেন, এবং সেই সাথে প্রতিটি পাবলিক কমপ্লেন শুনে তার তদন্ত করতেন। প্রতিটি আসামীকে কেউ মেরেছে কি'না, তাকে তার জন্য বরাদ্দ খাদ্য খাওয়ানো ঠিক ভাবে হয়েছে কি'না, এবং তাকে অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি'না, তাঁরা তাদের মুখ হতে নিজেরা শুনে তার প্রতিকার করেছেন। উপরন্তু ঐকালে জামিনযোগ্য অপরাধের অপরাধীকে তখুনি প্রয়োজনে তার বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে কাউকে ডাকিয়ে আনিয়ে তাকে জামিন দেওয়া হতো।এটা না করে কাউকে হাজত ঘরে ঢুকালে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীরা দণ্ডিত হতেন।

এই প্রথম চেকিং এর পর, পরদিন সকালে, ডেপুটি সাহেবের রিপোর্ট রুমে দ্বিতীয় চেকিং হতো। বহু চুরি কেসের মামলায় তরুণ ভদ্র আসামীকে পরে ফরিয়াদীর অনুমতিতে তার সমগ্র জীবন নষ্ট না করে তাকে আদালতে না পাঠিয়ে, পুওর ফাণ্ডে কিছু রসিদ সহ চাঁদা দিয়ে, মৌখিক ভাবে তাকে সতর্ক করে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এইরূপ একজনকে পরে আমি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হতেও দেখেছি। আমারই সুপারিশে এই ভদ্র সন্তানকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই রূপ কাজ আমি বহুবার করেছি। পেটি কেসের মামলাতে ধনী ভদ্র সন্তানদের রিপোর্ট রুম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এরপর ঐসব মামলাদির শেষ, অর্থাৎ তৃতীয়বার চেকিং হতো আদালতে। প্রয়োজন মনে করলে হাকিমরা তাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন।

[বিঃ দ্রঃ—স্বাধীনতার পর ব্রিটিশদের প্রবর্তিত মন্দ রীতিগুলি বজায় রাখা হলেও, তাদের এই সব উত্তম নিয়ম ও প্রথাগুলো স্বাধীনতার পর উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।]

এই যুগে থানা কর্মীকেই সর্বেসর্বা করাতে পুলিশ আনপপুলার। তৎকালে রাজনৈতিক কারণে পুলিশ সমষ্টিগত ভাবে নিন্দনীয়, পরোক্ষভাবে থাকলেও ব্যক্তিগত ভাবে তাদের অনেকেই জনপ্রিয় থেকেছেন। আইননুরাগী ও রাজভক্ত প্রজাদেরকে ব্রিটিশরা কখনও উৎপীড়িত হতে দেয় নি। এই যুগের তুলনাতে তারা বহুগণে

ব্যক্তিগতভাবে নিরাপদ থেকেছে। এই জন্য তাদের সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। গান্ধীজীর রামরাজ্য বরং কিছু ক্ষেত্রে ঐ কালেই থেকেছে। ঐ কালে কঠোর তদারকীতে পুলিশকে ২৪ ঘণ্টা কার্যরত থাকতে হয়েছে। কেউ থানা হতে বেরুলে, সে কটার সময় কি কাজে বার হলো তা স্টেশন ডাইরীতে লিখে রাখতে হতো, এবং সেখানে ফিরে এসে কোথায় কোন কাজ করে কখন সে ফিরল তাও তাকে লিখতে হয়েছে। কাউকে উৎপীড়ন করার বা খুশমেজাজে উৎকোচ নেওয়ায় তাদের সময়ও এতো বেশী থাকে নি। অসীম ক্ষমতার অধিকারী পুলিশকে এই ভাবে সংযত করে তখন রাখা হয়েছে।]

এই দিনের রিপোর্ট রুমে মাত্র একজন অফিসারকে এক নির্দোষ ব্যক্তিকে নিষ্প্রোয়জনে ভেকেসসাম এ্যারেস্ট করার অপরাধে দণ্ডিত হতে হয়েছিল। খুউব প্রয়োজন না হলে কোনও ভদ্রব্যক্তিকে তখন গ্রেপ্তার করা নিষিদ্ধ থেকেছে। অন্য পুলিশ কর্মীরা আপাত-ভাবে রিপোর্ট রুম হতে সুস্থ মনে বেরুতে পেরেছিলেন। ওনাদের প্রতিটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর ও কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পেরেছিলাম।

ইংরাজ ডেপুটি সাহেব যেমন হন হন করে এসেছিলেন, সেই রকম সেলাম কুড়ুতে কুড়ুতে হন হন করে উনি ওর এই টাউন রিপোর্টের কাজ সেরে ওর সুবারবণ রিপোর্ট শুনতে দৌড়লেন। এই দুই রিপোর্ট হতে তথ্য সংগ্রহ করে ওকে লালবাজারে কমিশনার সাহেবের ঘরে ওর মত অন্য স্থানের ডেপুটিদের সঙ্গে গিয়ে স্বল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় সংবাদ জানাবেন। তাহলে কমিশনার সাহেব ওগুলির প্রয়োজনীর অংশ গভর্মেণ্টের সেক্রেটারিকে পাঠাবেন। এরপর ঐ সব ডেপুটিরা নিজেদের স্ব স্ব ডেরাতে ফিরে স্নান আহার সেরে, দুপুরে নিজ নিজ অফিসে বসে ফাইল দেখবেন ও তা সই করবেন ও হুকুম লিখতেন। এবং সেই সাথে সেরেস্তার একাউণ্ট চেক করবেন। ওঁদের পরিশ্রম করার ক্ষমতা ছিল অসীম। তখন একজন মাত্র বাঙালী তথা ভারতীয় ডেপুটি কমিশনার ছিলেন।

[বিঃ দ্রঃ—কিন্তু সন্ধ্যের পর হতে তাদের আরম্ভ হতো খানা পিনা, বলডান্স, ডিনার আদি ও ক্লাব লাইফ, এই ডিনার টেবিলে ওরা বহু রাষ্ট্রীয় পলিশিও ঠিক করেছেন। শ্রীপূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী প্রথম এবং শ্রীভূপেন ব্যানার্জি দ্বিতীয় ভারতীয় ডেপুটি পুলিশ কমিশনার হয়েছিলেন, ঐ কালে প্রায় অর্ধেক এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনারগণ, এবং ইনফাজ কর্মীগণ ইংরাজ বা এ্যাংলো হতেন, প্রতিজন সার্জেণ্ট মাত্রেই এ্যংলো বা ইংরাজ হতেন।]

ডেপুটি সাহেবের বড় রিপোর্ট শেষ হলে সেখানে এ্যাসিসটেণ্ট সাহেবের ছোট রিপোর্ট আরম্ভ হলো, একে আমরা বড় সাহেব বলে অভিহিত করতাম। হঠাৎ জনৈক এম. এ পাশ সদ্য নিযুক্ত এক কর্মীকে তিনি সকলের সমুখে অপমান করলেন। এবং বললেন। ইউ আর অ্যান এম এস সা [অর্থাৎ—M. S C] ইউ আর টু আনু—লার্ণ ; হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্ণড দেয়ার। এবং তারপর উনি গট গট করে বার হয়ে গেলেন।

এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ঐ তরুণ একটা ইস্তফা পত্র লিখলে তাকে নিরস্ত করতে তখন থানাগুলির প্রতিজন স্নেহপ্রবণ ইনচার্জ কর্মী সচেষ্ট। একজন ইনচার্জ বাবু তাঁকে বুঝিয়ে বললেন। 'আরে' শব্দ হচ্ছে একটা প্রশ্ন। দেশে দেশে এর অর্থ পৃথক! এখানে ড্যাম মানে গালাগালি। কিন্তু জাপানে ওটার মানে গোলাপ ফুল। ওটার যে কোন একটা মানে করে নাও। ওটা একরকম ডাক। গরু ডাকে, বাছুর ও গাধা ডাকে। মনে কর বড় সাহেব ঐ রকম একটা ডাক ডাকলেন। ছোটবেলাতে বাবা আমাকে বকলে আমি ভাবতাম যে একটা ষাঁড় ডাকছে। এরপর থেকে অন্য একজন দেশয়ালি প্রাচীন কর্মী তাকে অন্য একরূপ বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বলেছিলেন—আরে ক্য শোচো। হ্যাম লোক ভি থানামে লোটকে বিশঠো নীচে ওয়ালোকো আউর দশঠো পারলিকলো গালি দেগেঁ। ইসমে দিল হাল্কা হোগী আউর নিদভি আয়েতী। দশঠা গালি মিলা, বিশঠো গালি দিয়া, ইসমে তো মে লোকটো দশঠো গালি ফাউ, ইয়ে নাফা।

এই ভাবে তৎকালে কর্মীদের আত্মসম্মান জ্ঞান নষ্ট করার জন্য কিছু কিছু লোকের চরিত্রহানী হয়েছে। কারণ যারা নিজের আত্মসম্মান হারায়, তারা অন্যের আত্মসম্মানও রাখবে না! কিন্তু পরে শুনেছিলাম ভদ্রলোক ব্লাড পেশারের রোগীরা প্রভাত বাবুর জায়গায় ওর ছুটি নেওয়াতে এক মাসের জন্য এখানে এসেছেন, উপরন্তু উনিও ওর ঊর্ধতন ডেপুটি সাহেবের কাছে কিছু কড়া কথা ঐদিন শুনেছিলেন।

তবে আমি আমার সহকর্মীকে চাকুরী ছাড়বার পরেরকার আমার নিজের বিষয়ে অভিজ্ঞতার বুঝিয়ে বলে তাকে শান্ত করতে সেই দিন পেরেছিলাম।

থানাতে ফেরা মাত্র আমার টেবিলে রাখা টেলিফোনটার উপর নজর পড়া মাত্র খুকুরানীর মুখটা মনে পড়ে গেল। খুকুরানী তাহলে ঠিকই বলেছিল যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা করে শয়তান লুকিয়ে রয়েছে। তাই তার হতে সাবধান হয়ে থাকতে হয়। এটা যে অহেতুক তা তখুনি বুঝলাম ও লজ্জিত হলাম। এরপর নীচের অফিসে আর দেরী না করে স্নান আহার করতে উপরের কোয়াটার্সে উঠে গেলাম। একটু বিশ্রাম তখন আমার দরকার। আবার এক্ষুনি হয়তো একটা মামলা আসবে, আর তক্ষুনি ফের নীচে হতে কেউ আমাকে ডাকতে আসবে।

এই সময় খুকুরানীর একটি অনুরোধ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে, আমার মনে পড়ছিল। ওপাড়ার দুই জন বেশ্যা নারীর বিবাদের একটা দরখাস্ত হাকিমের হুকুমে ওখানে তদন্ত করার কালে ওদের একজন আমাকে বলেছিল, বাবু আমি ওর মতো অতো উপায় করতে পারিনা। ওর মত টাকা ব্যয়ের আমার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমি গতর দিয়ে আপনার সেবা করতে পারবো। মেয়েটি তার পূর্ব অভিজ্ঞতা হতে ওটা বলেছিল, তাই তার উপর বেশী রাগ করতে পারিনি। বরং তার প্রতি এজন্য আমার সমবেদনা ও কিছু করুণাই এসেছিল।

অষ্টম অধ্যায়

এক দিন বিকালে নীচের অফিসে নেমে নিজের ঘরে বসেছি। হঠাৎ একজন ভদ্রলোক, আমার কাছে এসে বসলেন। ঐকালে থানা ছিল একটি সত্যকার পাবলিক প্লেস। যে কোনও লোক বিনা অনুমতিতে, ইনচার্জ অফিসরের ঘরেতেও যেতে পারতেন।

এই ভদ্রলোকটির বাড়ি ছিল, ঐ বেশ্যা পল্লীরই সীমান্তে। তাই কোনও বাবুর ওঁর বাড়ীতে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা এড়াতে ওর বাড়ীর দুয়ারে মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা থেকেছে—'সাবধান' ভদ্রলোকের বাড়ী। এই রূপ দুয়ারে লেখা আরও কয়েকটি বাড়ী ও'পাড়াতে আমি দেখেছি। ঐ সব বাড়ীর পুত্ররা এ পাড়ার মেয়েদের দিদি বা মামী বলে ডাকতো। এ পাড়ার মেয়েরাও তাদের ভাই ভেবেছে, এবং এদের কোনও বেচাল দেখলে তা নিবারণ করেছে। এটি ছিল ওখানে এক অপূর্ব সহ-অবস্থান।

ভদ্রলোক একটু মুচকী হেসে, আমতা, আমতা, করে আমাকে বললেন। মশাই, স্যার, কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি, এ পাড়ার একটা মেয়ের এই একটু ইয়ে দেখছি। আপনি এ পাড়াতে টহলে এলে চিকের আড়াল হতে আপনাকে দেখে, এরপর আপনি মোড়ের ওপারে গেলে ও তার বাড়ীর ছাদে উঠে আপনাকে দেখে। ভদ্রলোকের এই কথাতে, ওর উপরই আমি রাগ করে বললাম 'মশাই এ সব কি আজে বাজে কথা বলছেন! আমি ওদের কাউকেই চিনি না'। তবে আমি বুঝেছিলাম বিনা দোষে, বদনামের সম্ভাবনা। ঐ একটি মেয়েরই বাড়ীর সামনে গাড়ী থাকলে, সেগুলো সরানো হয়নি। কিন্তু অন্যান্য মেয়েদের বাড়ীর সামনে গাড়ীর ভীড় গুলোকে তখুনি সরানো হয়েছে। এটাও তাহলে ওরা লক্ষ্য করেছে। এবার আমার মনে পড়লো যে সেদিন খুকুরাণীর বাড়ীর সুমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা-কালে, সুমুখের বাড়ীর চিকের আড়াল হতে ভেসে আসা একটা চাপা হাসি শুনে-ছিলাম। ওদিকে খুকুরাণীর বাড়ীর সম্মুখে গাড়ীর সংখ্যা বেড়েছে। ওগুলো নিশ্চয়ই সব সিনেমা কোম্পানীর নয়। অগত্যা আমার অধীন সিপাইদের, খুকুরাণীর বাড়ীর সামনে দাঁড়ানো গাড়িগুলোর বিরুদ্ধে রাস্তা বন্ধের অপরাধে মামলা দায়ের করতে বললাম। খুকুরাণীর সঙ্গে আমার এখনও মুখো-মুখি দেখা হয়নি। কিন্তু বহুবার সে টেলিফোনে আমাকে বলেছে—'হ্যাঁ দাদা, শীঘ্রই ঐ পাড়া আমি ত্যাগ করবো"। তাহলে এই সব ওদের একটা চিরচরিত বাহানা।

বহুদিন খুকুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা নেই। কিন্তু গুণ্ডা ও দালাল বিতাড়ন তখনও অব্যাহত। কিন্তু ঐ সব বদলোক ও তাদের সমর্থকরা যে কতো সাংঘাতিক তা, তখনও আমার ধারণার বাইরে। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে থানাতে অভিযোগ

করলে যে তার এক কন্যাকে গুণ্ডারা, অমুক স্থানে আটকে রেখেছে। নারীর উপর এই অত্যাচারের খবরে আমার তরুণ মন তখন ক্ষুব্ধ। একটা ঘরের তালা ভেঙ্গে মেয়েটিকে আমি উদ্ধার করলাম। কিন্তু-ওর অপহরনকারীরা তখন বে-পাত্তা। ওর বাবা একটা ঘোড়ার গাড়ী আনলেন। ওদের নিয়ে ওই গাড়ীতে করে থানায় ফিরছি। ভদ্রলোক কিছু কেনবার জন্য পথেতে নামলেন। কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও তাঁর দেখা নেই এদিকে মেয়েটি কাঁদতে থাকে, ও বলতে থাকে, 'দাদা, আমি আপনার বোন, এসব লোকে জানলে আমার স্বামী আমাকে ঘরে নেবে না। 'আপনি, আমায় থানাতে না নিয়ে, আমার মার কাছে আমাকে পেঁাছে দিন। এই কথা বলে, ও হিষ্টিরিয়া ফিটের মত তার মাথাটা আমার বুকের উ'পর ঠুকতে থাকে। ওদিকে ওর বাবারও দেখা নেই। মেয়েটার সন্দেহ তাকে গুণ্ডারা রাস্তাতে ধরেছে।

এরপর আর বেশীক্ষণ পথেতে অপেক্ষা না করে মেয়েটাকে নিয়ে থানাতে ফিরে দেখলাম, সেখানে বড় সাহেব স্বয়ং ও তার পিতা বসে রয়েছেন। তার ঐ পিতার আমার প্রতি অভিযোগ এই যে, পথে তাকে জোর করে নামিয়ে দিয়ে আমি তার মেয়ের বে-ইজ্জত করেছি। ঐ কন্যাটিরও তখন ঐ একই অভিযোগ। সেই ঘোড়া-গাড়ীর গাড়োয়ান হলো, তাদের সাক্ষী।

বড় সাহেবকে কিন্তু ওরা যখন বললে 'ঐ দেখুন স্যার, আমার মেয়েকে জাপটে ধরার ফলে ওঁর মাথার সিন্দুর, ওঁর সাদা পাঞ্জাবীর উপর লেগে রয়েছে। এতক্ষণে আমি নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে দেখি ওদের কথাটি সত্যি। এবার এতে বড়সাহেব ও ইনচার্জ অফিসার সত্যেন বাবুও অবাক। কিন্তু তখনও সত্যেন বাবু ঐ ফরিয়াদীকে জেরা করছেন ও বলছেন, 'বাবুহে! এই মেয়েটি তোমার নিজের তো, ওর মা এখন কোথায়? তোমার ঐ মেয়ে ওখানে গেল কি করে? বড়সাহেব প্রভাত বাবুর'ও আমার উপর ধারণা খুউব উচুঁ। এতো সাক্ষ্যসাবুতে তিনিও তখন খুউব অবাক ও হতভম্ব। উনি একটু ভেবে গম্ভীর ভাবে বললেন 'মাই ল্যাড! তোমার বা ওদের কার কথা সত্যি তাতো এখন বোঝা মুশ্কিল, কিন্তু আমার রিপোর্ট পেলে ডেপুটি সাহেব, তোমাকে সাসপেণ্ড করবে, এমন কি তুমি আদালতেও সোপর্দ হতে পারো। কথা কটা বেশ ব্যথা ভরা ক্লান্ত স্বরে উনি আমাকে বললেন, তারপর সত্যেন বাবুকে নিয়ে ওর নিজের অফিসে গেলেন।

ওঁরা বেরিয়ে গেলে, আমি টলতে টলতে নিজের টেবিলের সুমুখে চেয়ারে বসে পড়লাম। সিপাহী জমাদার ও কৌতুহলী বা দুঃখিত সহকর্মীদের দিকে তাকানও কষ্টকর। হঠাৎ টেবিলে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠলো। আমি বিরক্ত হয়ে ওর হ্যাণ্ডেলে একটা থাবা দিলাম, কিন্তু, তবু—ওটা সমানে বেজে চলেছে। একজন বললো 'স্যার, এটা আপনারই ফোন। একটু বিরক্ত হয়ে নিস্তব্ধ ভাবে ওটা কানে রেখে শুনলাম, খুকুরাণীর গলা। আমি বিরক্তির সঙ্গে ওটা নামাবো, হঠাৎ শুনলাম, খুকুরাণী বলেছে, 'দাদাভাই কিছু ভয় নেই। আমি সব শুনেছি। আপনাকে সাবধান করবার জন্যে ফোন করেছিলাম। কিন্তু ওরা বললো যে, আমার সঙ্গে

কথা কইবার আপনার সময় নেই। শুনুন দাদা। ওই মেয়েটি সোনা গাছির ১৩নং বাড়ীতে থাকা তিনপুরুষের বেশ্যা। এছাড়া ওই মেয়েটি হচ্ছে, ঐ ফরিয়াদীর রক্ষিতার মেয়ে। আর ঐ ঘোড়া গাড়ীটার মালিক ফরিয়াদীর শ্যালক শ্যামগুন্ডা। ভেহিক্যাল ডিপার্টের, নথিপত্রে ওই নামেই পাবেন। এতগুলো কথা ও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে, একসঙ্গে বললো। এরপর সে জানালো যে, সে আমার ইচ্ছামত ঐ দিন বিকালেই, এ পাড়া ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে। আমি যেন তাকে এবার আশীর্বাদ করি। ইচ্ছে করছিল যে, এখুনি, আমার ঐ বোনটিকে বুকে টেনেনি। কিন্তু টেলিফোনে তা সম্ভব নয়। উপরন্তু ঐ যুগে অটো ডায়াল হয়নি। উভয়ের মধ্যে ঐদিন টেলিফোন গার্ল'রা থেকেছে। ওদেরকে এড়িয়ে খুকুর কাছে পেঁছানো সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে আর দেরী করা একটুও উচিত নয়। তখনি একটা ট্যাক্সি করে বড় সাহেবের অফিসে পেঁছালাম!

ওরা ওখানে তখনও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে দোদুল্যমান। ঐ কালে জয়েন্ট রেসপনসিবিলিটি নামে একটা বস্তু থেকেছে। অধীনদের কুকর্মের জন্য উর্ধতনদেরও দায়ী করে তাদের স্ল্যাক সুপারভিসনের জন্য দায়ী করা হতো। এই ব্রথেল ডিউটির জন্য ওঁরাই আমাকে মনোনীত করেছেন। ওদের এই নির্বাচন ভুল প্রমাণ হলে ওদেরও বদনাম ও কৈফিয়ৎযোগ্য অপরাধ। আমার এই বার্তাকে ওই কড়া বিষ খন্ডনের ততোধিক কড়া ঔষধ বুঝে ওরা দুইজনেই পরপর উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার ইনফরমার নিশ্চয় কোন পুরানো পাপী। ওকে হাতছাড়া করো না। এরপর উনি হেড ক্লার্ককে ডেকে ঐজন্য আমাকে দু'শ টাকা সিক্রেট সার্ভিস ফান্ড হতে দিতে হুকুম দিয়ে আমাকে বললেন, ওর সবটাই তোমার ওই ইনফরমারকে এখুনি দিয়ে দিও। এই সিক্রেট সার্ভিসের টাকা হিসাব বহির্ভুত। ইনফরমারের নাম না জিজ্ঞেস করার রীতি। তাই এটা হতে আমি রক্ষা পেলাম। দু'দিন ব্যপী সত্যেন-বাবু নিজে তদন্ত করে তাদের সব কয়জনকে ধরে মিথ্যা মামলা দায়ের ও ষড়যন্ত্রের অপরাধ প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। আমাকে ওঁর সঙ্গে থেকে শুধু সাহায্য করতে হয়েছিল।

একটু বিশ্রাম পাওয়া মাত্র, দুইদিন পর সন্ধ্যেতে রামবাগানে ছুটলাম, যে যা ইচ্ছা মনে ভাবুক। কোনও ক্ষতি তাতে নেই। পুলিশের তার ইনফরমারের সঙ্গে দেখা করা স্বাভাবিক। এবার ওর বাড়ীতে গিয়েই ওর সঙ্গে দেখা করে ওকে ভুল বুঝার জন্য ক্ষমা চাইব।

কিন্তু—কিন্তু—ওখানে গিয়ে আবাক হয়ে দেখি ওর বাড়ীর দরজাতে তালা বন্ধ। ওপরের বারান্দা হতে একটা 'টুলেট' প্লাকার্ড ঝুলছে। একজন পাশের বাড়ী হতে আমার হাবভাব দেখে বলে উঠলো—'পাখী পাইলে গেছে'। মেয়েটা কোথায় গিয়েছে, তা ওখানকার কেউ বলতে পারে না।

আমি ভেবেছিলাম ওই দুশো টাকাতে এক জোড়া দুল কিনে তাকে উপহার দেবো। অগত্যা ওটা পরদিন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে একটা পাশ বই খুলে ওটা জমা

রাখলাম। মনে মনে ঠিক করলাম ওটা কোনও দিনই তুলবো না। ওটা সুদে বাড়তে থাকুক। উদ্দেশ্য, যদি কখনও তার দেখা পাই, তাহলে ওটার সদ্ব্যবহার হবে। জানিনা তার সঙ্গে আর কোন দিন দেখা হবে কিনা, হয়তো একদিন তাকে দেখতে পাব। কিন্তু বহু পরেতে তাকে খুঁজে পেলেও ততো দিনে দুশো টাকাতে দুল পাওয়া যাবে না। উপরন্তু ততো দিনে তার দুল পরার বয়েসও উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। তখন ঐ দিনের দুশোর স্থলে ওর দাম হবে দুহাজার টাকা। এরপর যখনই ওখানে গেছি, ওর ওই বাড়ির সমুখে এক মিনিট থমকে দাঁড়িয়েছি। এমনি-বহু জনকেই ওর খোঁজে আসতে ও কিছু পরে চোখের জল ফেলে ঐ স্থান ত্যাগ করতে দেখতাম। এদের মধ্যে এমন একজন তরুণকে আমি দেখেছি, যিনি পরবর্তী কালে মন্ত্রী হয়েছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হলেই উনি আমাকে চুপি চুপি বলতেন, 'ওকে কি কোথাও দেখেছেন, সে কি এখনও বেঁচে আছে।' ঐ মেয়েটার সুন্দর ব্যবহারে বহু লোকই মুগ্ধ থেকেছে ও মধ্যে মধ্যে ও্কে দেখতে একটি পুরনো সিনেমা ফিল্মও দেখতে গিয়েছি। অন্যেরা কি হারালো তা জানি না, কিন্তু আমার একটি বোনকে চিরতরে হয়তো আমি হারিয়ে ফেললাম। শুনেছি যে সে পরে একজন রাজবন্দীকে বিয়ে করে সুখে রয়েছে। আত্মপরিচয় গোপন করে পূর্বজীবন সে এখন ভূলে গিয়েছে।

এর কয়দিন পর আমি একটা ঠিকানাহীন পত্র পেলাম। তাতে খুকুরাণী লিখে ছিল। 'দাদা' তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমাকে আমার ঠিকানা জানালাম না। আমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। আশীর্বাদ চাই ইতি। বুঝা গেল যে—মেয়েরা যেমন অনেক কিছু গোপন করতে পারে, তেমনি তারা অনেক কিছুই জানাতেও পারে।]

আমার মন মেজাজ খুউবই তখন খারাপ। ওই মেয়েটির সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না, এবং তা থাকাও উচিৎ নয়। তবুও ওই পাড়াতে জন্মানো ছেলেমেয়েদের জন্যে গড়ে তোলা আমার স্কুলটির শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করতে ওখানে, একদিন আমি এলাম। ঐ পাড়া গুলো রাত্রে জেগে থাকে ও দিনে ঘুমোয়। দিন দুপুরে ওখানে পথেতে লোক থাকে না। খুকুদের বাড়ীর সুমুখ দিয়ে ওই স্কুলটিতে যেতে হয়। ওর ছেড়ে যাওয়া বাড়ীটার সুমুখে এসে একটুখানি থামলাম। তখন—রৌদ্রময়ী রাতি। সুমুখের বাড়ী হতে এক বাড়ীউলি বেরিয়ে এসে আমাকে বললো 'বাবু আমার মেয়ে খুকুর চাইতে সুন্দরী, সে আপনাকে খুউব ভক্তি করে। তার ইচ্ছে আপনাকে একটা নমস্কার করবে। আমি ভ্রূকুটি করে তার দিকে চাইতেই স্ত্রীলোকটি একটু একটু, করে পিছতে থাকে। এবার আমার সঙ্গের জমাদার তাকে ধমক দিয়ে বললো। 'ক্যা। তুলোক আদমি চিনতা নেহী'। এর পর থানাতে ফিরে ভাবলাম যে, কদিন ছুটি নেব। শুধু মনে হয়—আমি কেন, এমন ভাবে এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠছি। কিন্তু-থানাতে ফিরে শুনলাম যে সব ছুটি বাতিল। ইমারজেন্সী ডিক্লেয়ার্ড হয়েছে।

গান্ধী আরুইন চুক্তি বাতিল হয়েছে। কংগ্রেস এখন বেআইনী সংস্থা রূপে ঘোষিত। গান্ধীজী সমেত নেতারা এ্যারেষ্টেড্। এর কারণ আমি আমার অন্য দুটি

পুস্তকে বলেছি। এখানে ঐ সব এখন উহ্য থাক। পরদিন ভোর রাত্রে সাইমালটৌনিয়াস তল্লাসী করে দেশ ব্যাপী কংগ্রেস অফিস গুলি সিল করে দেওয়ার হুকুম এসেছে।

সেই রাত্রীর অভিযানের পর প্রতিটি কংগ্রেস অফিস হতে আনা, টেবিল, চেয়ার, ফ্যান, নথীপত্র, ও ফেস্টুনগুলি এনে থানাগুলির সম্মুখের ফুটপাত গুলো ভর্তি করে দেওয়া হলো। ঐ গুলো বহুকাল ওখানে পড়ে থেকে বৃষ্টিতে ভিজে পচে ছিল। এর মধ্যে সিমলা ব্যায়াম সমিতি হতে আনা বহু বারবেল ও মুগুর থেকেছে।

[বিঃ দ্রঃ এই সিমলা ব্যায়াম সমিতিই, ঐ সময় প্রথম সর্ব্বজনীন নাম দিয়ে সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব প্রচলন করেন। ওখানে আমি মুশ্লিমদেরও নিতে বলাতে ওঁরা তাতে রাজী হয়ে বলেছিলঃ ওতে ওদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু প্রতিটি শিক্ষার্থীকে, এখানে ভর্তি হতে হলে হনুমানজীকে প্রনামি দিতে হবে। তবে অন্য ভাবে এই সিমলা ব্যায়াম সমিতিকে আমি বহুরূপে সাহায্য করে ছিলাম]

হঠাৎ খবর এলো বেআইনী ঘোষিত হওয়া সত্বেও অন্য বছরের মত, আদেশ অমান্য করেই কংগ্রেসের ঐ বছরের বাৎসরিক সভার অধিবেশন হবে। উপরন্তু স্পেশাল ব্রাঞ্চের খবর এই যে, ওই অধিবেশন হবে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে।

প্রাদেশিক কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন যে রকম করেই হোক, ব্রিটিশ সরকার বন্ধ করবেনই। এজন্য—একটি অদ্ভূতপূর্ব্ব আইন বা অডিনেন্স জারী করাও হলো। এই আইনে সাব ইনেস্পেকটার ব্যাঙ্ক পর্যন্ত যে কোনও পুলিশ কর্মী সন্দেহ মাত্র যে কোনও কংগ্রেসীকে বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার তো করতে পারবেই, উপরন্তু সে তাকে অদালতে না পাঠিয়ে, সরাসরি, নিজেরাই কমিটমেণ্টের অর্ডার পত্রে সই করে তাকে, জেল খানাতে কুড়ি দিনের জন্য বন্ধ রাখতে পারবে। এই জন্য ওইরূপ প্রত্যেক পুলিশ কর্মীকে গোছা গোছা 'কমিটমেণ্ট অর্ডারের ছাপা ফর্ম' দেওয়া হয়েছিল। এই ক্ষমতা বলে খদ্দর ও গান্ধীটুপী পরা বহু জনকে পুলিশ থানা হতেই জেলে পাঠানো হলো।

[বিঃ দ্রঃ এই সময় আমি একটা অন্যায় কাজ করে ছিলাম। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের উপরে এক খাদি প্রতিষ্ঠানের দোকানে, ঐ সময় অচিন্ত্য সেনগুপ্ত [তখন উনি স্থায়ী মুনসেফ্ নন], পবিত্র পাঙ্গুলী, পরিমল গোস্বামী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সজনীকান্ত, প্রবোধ সান্যাল এবং ওদের কল্লোল গ্রুপের বহুজন এসে আড্ডা দিতেন। আমার উপর ওখানে হতে সকলকে ধরে আনতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ওখানে ঐ সব পরিচিত বন্ধুদেরকে দেখে আমি হতভম্ব। ওদেরকে সাবধান করে দিলে, ওদের মুখ হতেই, ওই খবরটা বাইরে বেরুবে। ওরা ওখান হতে বেরিয়ে যাবার পর আমি দোকানে গিয়ে বকাবকি করেছিলাম। উদ্দেশ্য—যাতে ওই দোকানীই ওদেরকে সাবধান করে দিতে পারেন। ঐ দিন, ঐসব খদ্দর ধারী সাহিত্যিকদের গ্রেপ্তার করলে অচিন্তদার মুন্সেফ পাকা হয়ে জজ হওয়া হতো না।

অন্য একদিন—আরও একটা অন্যায় কাজ আমাকে করতে হয়েছিল। এক উর্ধতনের সঙ্গে, এক গোপন তদন্তে ট্রামে, বসে যাচ্ছিলাম। এক ভদ্রলোক তখন বহু পরিচিত

সাহিত্যিকদের সঙ্গে ট্রামে বসে ওদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ঐ ভদ্রলোককে এর আগে দেখিনি। পরেতে—ওঁকে আজও পর্যন্ত দেখিনি। ওই উর্ধতনের মুখে শুনেলাম, উনি অন্নদা শঙ্কর রায় (I.C.S) এই কালে I.C.S. দের ট্রামে ভ্রমণ একটা অপরাধ থেকেছে। ওঁর ডিকটেশনে ও নির্দ্দেশে আমাকে ওঁর বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্টকে একটা গোপন রিপোর্ট পাঠাতে হয়েছিল। অভিযোগ (১) উনি খাদিপরা সাহিত্যিকদের সঙ্গে বেশী মেশেন (২) I.C.S. হয়েও মোটরে না চড়ে ট্রামে বসে সাধারণ লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন। শুনে ছিলাম ওই প্রতিবেদনে কমেণ্টকরে ওঁকে এক্সিকিউটিভ হতে জুডিসিয়ারীতে সরাবার সাজেসন দেওয়া হয়েছিল]

যাক। ওই সম্ভাব্য কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের তারিখ পাওয়া গেল, এবং এও জানা গেল যে ঐ সভা কলেজষ্ট্রীট মার্কেটেই বসবে।

কংগ্রেসের বহুনেতা ও কর্মীদের ওদিকে, তখন গভর্নমেণ্টের পক্ষে বেতনভূক গুপ্তচর রূপেও পাওয়া গিয়েছিল। এনাদের উপর ওনাদের সন্দেহ এড়াতে মধ্যে, মধ্যে, এদের মত নিয়ে, এদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে তৎকালে। কিছুক্ষেত্রে এরাই কর্ত্তৃপক্ষ কাউকে বলেছে। 'দাদা। ওরা আমাকে কিছুটা সন্দেহ করছে। কয়েক দিন ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। পরদিন ভোর রাত্রে তাদের বাড়ী তল্লাস করে, এদেরকে পুলিশের গাড়ীতে তুললে সমবেত জনতা চিৎকার করে বলেছে, বন্দেমাতরম।

এইরূপ এক ব্যক্তির মুখেরই খবর এই যে, ঐ কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে, ঐ বৎসরের অধিবেশন বসবে। ভোর ছটা হতে বিশজন উর্দ্দিধারি সিপাহী সমেত কলেজ স্ট্রিটের দুটো বাজারের মধ্যকার রাস্তার উপর আমি ঘাঁটি করলাম। প্রায় একটা বাজছে। কিন্তু কোথায় মিটিং বা কোথায় লোকজন। বুঝলাম যে ওরা ভয় পেয়ে মিটিং এর স্থান পরিবর্তন করেছে। কারণ কর্তৃপক্ষের তখন ওদের গ্রেপ্তারের পূর্বে পেটাবার হুকুম থেকেছে।

তাই আমি নিজের দায়িত্বে দুটি কনেস্টবলকে ঐখানে রেখে বাকি কয়জনকে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফের এখানে আসতে বললাম। ওরা চলে গেছে, ও আমরা কজন কিছু মিঠাই কিনে খাবো, হঠাৎ ঐ মার্কেটের দুই অংশ হতে চিৎকার এলো 'গান্ধী মহারাজ কি জয়' 'বন্দেমাতরম'। এ্যা, ব্যাপার কি? এর কিছুক্ষণ আগেও আমি ঐ দুই বাজারে ঢুকে মাত্র কজন নিরীহ ভদ্রলোককে থলি হাতে বাজার করতে দেখেছি। কিন্তু ওই থলে গুলোর মধ্যেই গান্ধীক্যাপ ও কংগ্রেস পতাকা ও ব্যাজ লুকানো ছিল। দেখতে, দেখতে ওরা গান্ধীক্যাপ ও কংগ্রেস ব্যাজ থলে হতে বার করে পরেছে, ও কংগ্রেস পতাকাও বার করেছে। ওদের চিৎকার শুনে আমি ব্যবস্থা নেবার পূর্বেই দৌড়তে দৌড়তে প্রায় একশ ডেলিগেট খাদি ক্যাপ মাথাতে সেখানে এসে পৌঁছালো। সিপাহী দুজনের একজন তখন আমার জন্য দুটো লেমনেড কিনতে গেছে।

আমরা দুজনা ওদের ভীড়েতে চাপা পড়ে গেলাম। আমি ঐ বৎসরের ওদের নির্বাচিত সভাপতির নিকট ভীড় ঠেলে পৌছবার আগেই উনি ওর ভাষণ পড়ে শেষ

করলেন। সৌভাগ্য এই যে ওরা উল্টে কাউকে আঘাত করেনা। ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে মার খায়।

[বিঃ দ্রঃ—কিন্তু যারা লাঠির তলায় নির্বিকার চিত্তে মাথা পেতে দিয়ে মার খায়। তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতি আঘাত করলে তা নিশ্চয়ই অতি ভয়ংকর হতো। সুবিধে এই যে, ওদেরকে থানার ঠিকানা বলে দিলেই ওরা নিজেরাই সেখানে পেঁছিবে]

আমাকে শুধু ওদের'কে বলতে হয়েছিল। 'ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট'। এখন আমাকে ফলো করে থানাতে চলুন। ব্যস, এর পরেই আমি বীরদর্পে, তবে কিছুটা সলজ্জ ভাবেও ওদের সুমুখে চললাম। ওরা আমার পিছনে, পিছনে দেশাত্মবোধক ধ্বনি দিতে, দিতে, আসতে থাকে। প্রায় এক শত লোককে আমি একাই গ্রেপ্তার করে থানায় আনলাম। এটা একটা বীরত্ব ও সাহসের পরিচয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন বর্তমান রবিবাসরের সভাপতি ডাঃ কালী কিঙ্কর সেনগুপ্ত। ওদের থানাতে এনে ইংরাজ ডেপুটি সাহেবকে তা ফোনে জানানো মাত্র, তিনি তখুনি থানাতে এলেন ও ওদের মধ্যে ডাঃ কালী কিঙ্কর সেনগুপ্তকে চিনে জিজ্ঞাসা করলেন 'আই সিন ইউ, এ্যাট বার্ডোয়ান। উত্তরে ডাঃ কালী কিঙ্কর সেনগুপ্ত বললেন "ইয়েস, আই এ্যাম দ্যাট নাটি বয় অফ্ বর্ধমান। এরপর ওই ডেপুটি সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওদেরকে ঠিক্ ঠিক পেটানো হয়েছে। এটা একটুও করা না হলেও, আমি উত্তরে বলেছিলাম, 'হ্যা স্যার, ঠেঙানো হয়েছে। আমার এই উত্তর শুনে কংগ্রেসীরা একটু হাসলেন।

কিন্তু ওদের বন্দেমাতরম ধ্বনি শুনে ততক্ষনে একটা বিরাট ভীড় থানার সুমুখে জমেছে। ইংরাজ ডেপুটি সাহেবকে ওদের মধ্য দিয়ে ওর গাড়ীতে তোলা তখন অসম্ভব। এর মধ্যে একজন বাঙালী উর্ধতন ওখানে এসে হুকুম দিলেন—চার্জ লাঠি। থানা কর্ম্মীদের লাঠি চার্জে এবং ওখানে আসা সাদা এ্যাঙলো সার্জেন্টদের ব্যাটনে বহু লোক আহত হল, কিন্তু এতে খুশী না হয়ে ঐ উর্ধতন বলে উঠলেন, এ্যা, এ কি রকম লাঠি চার্জ হচ্ছে। আমি রক্ত দেখতে পাচ্ছি কৈ ? হাসপাতালে পাঠাবার মত একটা কেস'ও হলো না, এরা সব দেখছি সিমপ্যাথেটিক হয়ে উঠছে। কিন্তু তবু ঐ লাঠি চার্জেই জনতা ইট ছুঁড়তে, ছুঁড়তে পাতলা হলো। কংগ্রেসী নেতারাও থানার ভিতর হতে ওদেরকে শান্ত ভাবে চলে যেতে অনুরোধ করেছিলেন।

কিন্তু—ওখানে ধরে আনা ওই সব কংগ্রেসী ডোলিগেটদের যে পেটানো হয়েছে, তা ওই ইংরাজ সাহেব বিশ্সাস করলেন না! উনি বাছাই করে বর্তমান রবিবাসরের সভাপতি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এবং বরিশালের সতীন সেন সমেতবয়স্ক কংগ্রেসীদেরকে ঠেলে ভ্যানে তুলে লাল বাজার সেন্ট্রাল লক-আপের হাজত ঘরেতে পাঠালেন। এরপর ভ্রূ কুঞ্চিত করে আমার দিকে একটু তাকালেন। এরপর ফিরে গিয়ে উনি একটি মারের এক্সপার্ট 'বিটিং স্কোয়াড" এই থানাতে পাঠালেন। এর এ্যাঙলো কর্মীরা সেখানে থাকা ছোকরা কংগ্রেসীদেরকে 'বডিলি' ট্রিটমেন্ট করবেন। এই বিনা কম্বল জড়িয়ে ধোলাই বিস্তারদের এজন্যই এখানে আগমন। পরপর মোটা বেতের ঘা ওদের উপর পড়লে ওদের একজন তার দেহটা

সবার আগে এগিয়ে গিয়ে একটা গান গাইতে থাকলো। 'মারো মারো। আরও মারো—রো—রো—। এরপর ওর সঙ্গে আরও একজন ওই একই গান ওর সুরে সুরে গাইতে লাগলো।

এই দুজনের গানের সুরে সুর মিলিয়ে এদের পিছনে থাকা মার খাওয়ার জন্য অপেক্ষারত তরুণরা ওদের পিছন থেকে গেয়ে উঠলেন, রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি গীত। এটি ছিল কবিগুরুর অমর সঙ্গীতের দারুন অপব্যাবহার। উপরন্তু ও'র ওই গীত দুটি ঐরূপ গানগুলি পরিবেশে ঠিক ফিট্-ইন'ও করে না। পাঠকরা অন্ততঃ এই বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে একমত হবেনা।

ভয় ভাঙ্গা এই নায়েরে
ভাই—
ভয় ভাঙ্গা এই নায়ে
মারের সাগর পাড়ী
দেবো—

এই রূপ সব উত্তেজক ও দেশাত্মবোধক গান শুনলে পুলিশের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করার অসুবিধে ঘটে। তাতে রাজভক্তি ও দেশপ্রেমের মধ্যে মনেতে বিরোধ বাধে। এতে দেশপ্রেম ও বিবেক হঠাৎ জেগে উঠে। এটা—ওদের ছিল নিশ্চয়ই এক প্রকার 'ইনসটিগেটিং দি পুলিশ এগেন্সেট হিজ ম্যাজেষ্টিস গভর্ণমেণ্ট' রূপ ওদের একটি বাড়তি অপরাধ

তবু আমাদের মধ্যে একজন লয়েল পুলিশ কর্ম্মী ওদের ওই গানের বহরে বিরক্ত হয়ে তাদেরকে একটু মনেতে জোর এনে বলে ছিলেন। 'বাবু। এতো একটা মারের 'ডোবা' মাত্র, এসব এখুনি বন্ধ করো। নইলে এবার সত্যি কারের মারের 'সাগর' আনবো ও তাতে তোমরা সত্যি সত্যি ডুববে।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এতো মারেও ওদের মুখে কোনও প্রতিবাদ বা কটুক্তি নেই। ওদের মুখেতে সেই একই রূপ হাসি লেগে রয়েছে। 'এখানে অসহায় গুলি ছোঁড়ে। আর অসহায় মরে। এই সব দেখে শুনে ও বুঝে অন্ততঃ আমার চোখে এইদিন জল এসেছিল।

[বর্ত্তমান রবিবাসরের প্রেসিডেণ্ট ডঃ কালিকিঙ্কর সেনগুপ্তের গৃহে ষষ্টি মধুর সম্পাদক কুমারেশ ঘোষ আমাকে মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে নিয়ে গিয়েছিলেন। উনি ওই দূর অতীতের সেই ভয়ঙ্কর নির্যাতন এখনও ভুলেননি। কিন্তু—তবুও উনি সাদরে আমাকে আহ্বান করে ছিলেন। ও'র সঙ্গে আমি একবার একত্রে টেলিভিসনে বক্তৃতাও দিয়েছিলাম।]

কংগ্রেসীদের ধর পাকড় করেও পিটিয়ে জেলগুলি ভর্ত্তি করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বিপ্লবীরা ফের মাথা চাড়া দিয়েছে। প্রতিটি অভিজ্ঞতা হতে দেখা গিয়েছে যে, যত বারেই প্রকাশ্য আন্দোলন নিস্পেষিত করা হয়েছে, ততো বারেই ওটা গোপন পথে মোড় নিয়েছে। প্রতি ভোর রাত্রেই ফের স্পেশাল ব্রাঞ্চ হতে কারুর

না কারুর গৃহ তল্লাস হয়েছে। স্পেশাল ব্রাঞ্চ বিভাগের লোকদেরই বিপদ বেশী, উর্দ্দিপরা থানা কর্মীরা ওদেরকে না চিনে ঠেঙায়, আর বিপ্লবী ও উগ্রপন্থীরাও তাদেরকে চিনে ঠেঙায়। কিন্তু মার খেয়েও তাদের এক্সপোজড হবার উপায় নেই।

শিব্রাম চক্রবর্ত্তি, এই হাস্য রসিক, শিশু সাহিত্যিক তখন এই থানার এলাকাতে থেকেছেন। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলো যে ওর ঘরেতে কংগ্রেসী বালকদের যাতায়াত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ওরা ওখানে ওর লেখা পড়ে ওঁকে দেখতে যেতো।

গোয়েন্দা বিভাগের অনুরোধে ওকে ফলো করে একদিন এক হোটেলে এলাম। ওর সঙ্গে যে এর পূর্বে মৌচাক অফিসে আমার আলাপ হয়েছে, এটা আমার স্মরণে না থাকলেও, ওঁর মনেতে তা থেকে গিয়েছে। উনি আমাকে চিনলেন ও হোটেলের ওঁর ও আমার খাওয়ার দুটো বিলই, আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে তা মেটাতে বললেন। পরে—উনি পাল্টে আমাকেই ফলো করে আমাদের থানাতে এলেন ও কিছু টাকা ধার চাইলেন।

আমি তাঁকে টাকা ধার দিতে অস্বীকৃত হয়ে বলেছিলাম, আপনি ভালো লেখেন ও তার বাবদে টাকা না নিয়ে বলেন আমি লেখারূপ বিক্রি করি না [ঐ কালে উনি ওতে টাকা নিতেন না] এ খবর আমরা পেয়েছি যে, আপনি একজন দুঃখ ও দারিদ্র বিলাসী। দরিদ্র থাকাই আপনার গর্ব। এবার হতে লিখুন ও প্রকাশকের নিকট হতে টাকা নিন''। আমি এ'ও শুনেছিলাম ওঁর পিতা একজন ধনী লোক।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমরাও বুঝলাম উনি একজন নিরীহ লোক। এরপর বেশ কিছুকাল কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন উনি দৌড়ে আমাদের থানাতে ঢুকলেন। তাঁর পিছনে ধাওয়া করে এক কাবুলিওয়ালাও থানাতে এসেছে। এই কাবুলিওয়ালার ধৃষ্টতা সহ্য না করে তাকে আটক করলাম। কিন্তু সে মেজাজে মারপিঠ শুরু করলো। সিপাহীদের সঙ্গে মারপিঠে সে জখম হলো। উপরন্তু তাকে হাজত ঘরে ঢুকতে হলো।

কিন্তু এই ঘটনাটি এই খানেই মিটলো না। সে আদালত হতে জামিনে বেরুলো। ওর অভিযোগ বিশ্বাস করে আফগান ভকিল, অর্থাৎ ওদের কনসলেট জেনারেল তথা রাষ্ট্রদূত দিল্লীতে বড়লাটের কাছে, আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকলো। আরম্ভ হলো দুই গভর্মেণ্টের মধ্যে লেখা লেখি। এখন এই বিষয়ে আমাকেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

আমি এবার আর একটা একশত পাতার দীর্ঘ থিসিস লিখলাম। ওতে ঐ আফগান মানি লেন্ডারদের অত্যাচারের, উৎপীড়নের বহু সাক্ষীর জবানী ছিল। ওতে আমি প্রমাণ করলাম যে, ওরা এক টাকাতে, এক টাকা সুদ নেয়। ওদের আসল কখনও, কারোর জীবনভর শোধ হয় না। ওরা দরিদ্র শ্রমিকদের ফ্যাক্টরীর হপ্তার দিনে ওর গেটেতে গিয়ে লাঠি উঁচিয়ে ওদের সব কটা টাকা কেড়ে নেয়। সেণ্ট পারসেণ্ট সুদের বিষয় শুনে ভারত গভর্মেণ্ট অবাক হলেন, এরপর অন্যান্য উৎপীড়িত ব্যক্তিদের

সঙ্গে শিব্রাম বাবুরও বক্তব্য কর্তৃপক্ষ শুনতে চাইলেন। কিন্তু শিব্রাম বাবু, কিছুতেই কমিশনারের রিপোর্টে যাবেন না। ওর বক্তব্য এই যে, ঐ কাবলিওয়ালা অসময়ে ওঁকে টাকা ধার দিয়েছে। এরকম বন্ধুর প্রতি সে অকৃতজ্ঞ হতে পারবে না। পুলিশও যখন তাঁকে ধার দিয়ে সাহায্য করলো না, তখন ওরা তাঁকে ধার দিয়ে রক্ষা করেছে। ওঁকে এবিষয়ে পীড়া-পীড়ি করা মাত্র উনি বেশ কিছু দিন বেপাত্তা হলেন। তবে—আমার খুঁজে বার করা অন্য বহু সাক্ষী ছিল। এর কিছুকাল পরেই গভর্মেণ্ট হতে আফগান মানিলেণ্ডিং এ্যাক্‌ট পাশ হয়ে এলো। নায্য সুদের বেশী ওরা চাইলে, ঐ আইনে পুলিশ, তাদের এ্যারেস্ট করার অধিকারী হলো। অর্থাৎ ওটাকে পুলিশ গ্রাহ্য (Cog) মামলা করা হলো।

আশ্চর্য লোক ছিলেন শিব্রাম বাবু। উনি ধনীর সন্তান। বাড়ী হতে টাকা আসতো, ও উনি লিখেও বহু টাকা পেতেন। তাতে বহু লোককে উনি বসিয়ে খাওয়াতে পারতেন। কিন্তু পর দিনই ঐ সব টাকা দরিদ্র ছাত্রদের পুস্তক কিনতে ও অভাবি লোকদেরকে ও ভিখারীদেরকে দান করে ফতুর হতেন। তাতে বাড়ী ভাড়া ও খাবার যোগাড়ের জন্য মাসের শেষে উনি ধার করতেন। এই কাবুলিওয়ালা সম্পর্কিত ঘটনাটি উনি নিজেই বসুমতী ও অনান্য পত্রিকাতে লিখে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

[বিঃ দ্রঃ—এই ডেনজারাস ড্রাগ এ্যাকট, ও আফগান মানি লেণ্ডিং এ্যাকট প্রবর্তিত হওয়ার জন্য পরোক্ষ ভাবে আমিই দায়ী। এটি আমার সমাজ সেবামূলক মনোবৃত্তির একটা অবদান।]

আমার কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো প্রথম প্রতিবেদন রূপ থিসিস ছিল 'ড্রাগ এণ্ড ক্রাইম' এবং তাদের নিকট পাঠানো দ্বিতীয় প্রতিবেদন রূপ, প্রমাণ ভিত্তিক থিসিস ছিল 'কাবুলিওয়ালাদের' উৎপীড়ন, এবং তাদের কাছে পাঠানো আমার তৃতীয় প্রতিবেদন রূপ থিসিস ছিল, কলকাতার অভিজাত বেশ্যা পল্লীর সমাজ ব্যবস্থার উপর। শুনেছি এটি কর্তৃপক্ষ হতে সারদা ট্রেনিং ও কলকাতা ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যালদের নিকট পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বড়সাহেব ওটা দেখে আমাকে বলেছিলেন তোমার ঐসব থিসিস কর্তৃপক্ষ পছন্দ করছেন না। তুমি মামলাগুলো অতো সহজে ডিটেকট করো বলে, ওরা এখনও তোমাকে কিছু না বললেও তোমাকে ওয়াচ করা হচ্ছে। তুমি সমাজ সেবা ও থিসিস লেখাতে ক্ষান্ত দাও।

এখানে আমার লেখা তৎকালীন উচ্চশ্রেণীর বেশ্যাগণের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কিত থিসিসের কিছু অংশের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

[বিঃ দ্রঃ—বড়সাহেব যাই বলুন না কেন ? আমি কমিশনারের একান্ত করণিকের কাছে শুনেছিলাম যে কমিশনার সাহেব ওর একাংশ হতে কিছু তথ্য চিফ সেক্রেটারীকে পৃথক ভাবে পাঠিয়েছেন। ওতে আমি বলেছিলাম যে, এ পাড়ার নাবালিকা মেয়েদের উদ্ধার করে হোমগুলিতে পাঠানো বৃথা। কারণ ওখানে ওরা লেখা পড়া শিখে পাকাপোক্ত হয় ও তারা সাবালিকা হওয়া মাত্র ওদের পালিতা মাতারা ঘোড়া

গাড়ী নিয়ে সেখানে গিয়ে পেশা করার জন্য এদেরকে বাড়ী নিয়ে আসে। এই ইংরাজী শিক্ষাতে আরও দক্ষতার সঙ্গে, ইংরাজী বাক্যতে এরা তরুণ ভিজিটারদের'কে মুগ্ধ করে তাদের ফিজ বাড়ায়, তাই ওদের পালিতা মাতারাই, ওই নাবালিকাদের পুলিশকে খবর দিয়ে হোমে পাঠিয়ে পাকা পোক্ত করছে। এতে সমস্যা না কমে তা বেড়েছে মাত্র।]

"এই বেশ্যা পাড়াতে তিন শ্রেণীর বেশ্যা বাস করে। যথা (১) বাঁধা ঃ এরা এক-জনের সঙ্গে থাকে তার সঙ্গে সে স্ত্রীর মত বাস করেছে। তাদের বাবুরা তাদের ত্যাগ না করা পর্যন্ত অন্য কাউকে তারা ঘরে আনে না। (২) টাইমের ঃ এরা মাত্র তিনজন বাবুকে আমল দেয়, এদের একজন আসে সোম ও মঙ্গলবার, ওদের একজন আসেন, বুধ ও বৃহস্পতিবার, এবং সেখানে রাত্রে থাকেন। ওদের তৃতীয় জন সেখানে রাত্রে আসেন ও থাকেন, শুক্রবার ও শনিবার। রবিবার দিন এদের সম্পূর্ণ রেস্ট। ওদের এই বাবু বদল কিছুটা 'ফার্জ টেক ওভার' এবং 'ফার্জ মেক ওভারে'র মত থেকেছে। ওঁরা পরস্পরের সহিত হ্যান্ড সেক ও পান বিনিময় করে ফিরে যান (৩) ছুটা ঃ এরা নির্বিচারে যাকে তাকে ঘরে স্থান দেয়। এবং তাদের কাছ হতে ঘণ্টা পিছু টাকা নেয়। কোনও বাবু এপাড়ায় এলে, দালালরা ছুটাছুটি করে কোন মেয়েটার ঘর তখন খালি তা জেনে তাদেরকে সেখানে নিয়ে যায়।

[কিন্তু এদের প্রত্যেকের ঘরে পর্দা ও বারান্দাতে চিক। এরা রাস্তাতে কখনও দাঁড়াবে না। এদের গদি ও তাকিয়া সজ্জিত, একটা বসবার ঘর থেকেছে। সেখানে তবলা ও হারমনিয়াম রাখা হয়। কিন্তু এদের শয়ন ঘরে খাট ও দেরাজাদি থেকেছে। বন্ধুরা দল বেঁধে, তাদের গান শুনলেও, ওরা ওদের একজনকে মাত্র ঘরে নেবে। এক সঙ্গে দুই জনকে তারা শোবার ঘরে নেবে না।]

এই পল্লীতে কয় শ্রেণীর মানুষ বসবাস করে যথা (১) বাবু যোগাড় করার দালাল ও পান বিক্রেতা। ওই দোকানের পাটাতনের তলাতে লুকানো থাকে মদের বোতল ও কোকেনের পুরিয়া (২) ঐ সকল স্ত্রীলোকদের বেতনভূক গুর্গা নামক ভৃত্য। এরা মনিবানীদের মায়ের মতনই সম্মান দেয়। এরা দৌড়ে সোডা ও মদের বোতল বা পুরিয়াদি বাবুদের জন্য রাত্রে কিনে আনে, ও ঘর পরিস্কার ও বাবুকে যত্ন আত্তি করে। (৩) এই সব মেয়েদের ভাই বর্গ ও আশ্রিতরা। এরা উপরে ছাদের কোনও ঘরেতে থেকেছে। (৪) এদের **P. N.** নামে একজন মনের মানুষ, এরা বেশ্যা হলেও নারী। তাই মধ্যে মধ্যে তারা, একজন মানুষকে ভালো-বেসে ফেলে। এদেরকে রাত বারোটার পুরুষমানুষ বলা হয়ে থাকে। ছুটা নারীরা রাত বারোটাতে বাবু গ্রহণ বন্ধ করে এদেরকে ঘরে আনে। এদের এরা প্রতিপালন তো করেই। উপরন্তু এরা, এদের অকথ্য অত্যাচারও সহ্য করে থাকে।

এদের নির্বিচারে যৌন সঙ্গমে বন্ধাত্ব আসাতে, এবং সন্তান না জন্মালেও, মধ্যে মধ্যে, হঠাৎ, এদের কারুর, কারুর প্রথম দিকে ছেলে, মেয়ে হয়েছে। মা হওয়াতে এদেরকেও এদের পালন করতে হয়েছে।

এদের জন্যই আমি একটা স্কুল ও বিবাহ ব্যবস্থা, ব্যবসা ও চাকুরী দ্বারা অন্ন-

সংস্থানাদির ব্যবস্থা করেছিলাম। নইলে যথারীতি এরা ক্রিমিন্যাল পথে এগুতো। এ পাড়ার ছেলের সংগে, এ পাড়ার মেয়ের বিয়েতে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন থাকেনি। এইরূপে জাত হওয়া পরিবারগুলিকে প্রথমে হাফ গেরস্থ বলা হলেও, পরেতে এদের সন্তানিরা তাদের জন্ম বৃত্তান্ত ভুলে গিয়েছে। এখন, এদের মধ্যে বহু উকিল, ব্যবসায়ী ও ডাক্তার দেখা যায়।

এদের সমাজ ব্যবস্থাও চমৎকার থেকেছে। এদের নিজস্ব পঞ্চায়েৎ আইন, বিচার ও পুলিশও থেকেছে। প্রত্যেক বাড়ীর প্রতিটি কক্ষে থাকা নারীকে, তৎ তৎ বাটির বাড়ীউলির রক্ষণাধীনে থাকতে হতো। ওখানে প্রাথমিক শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ওই বাড়ীউলির। দুর্ধর্ষ মাতাল বাবুদের ও গুণ্ডাদের হাতে এই মেয়েদেরকে ওরাই বাড়ীর চাকরদের সাহায্যে রক্ষা করে। গভীর রাত্রে ওই বাড়ীউলি চিৎকার করে বলেছে, 'ঔজীর ঘরে গোলমাল বুঝি? যাবো না কি লা।' নীচের ঘর হতে উত্তর এসেছে, 'না মাসী! ও তেমন কিছু নয়। তুমি ঘুমোও ইত্যাদি। কিন্তু অবস্থা বেসামাল ও গুরুতর হলে ওরা নিজেদের পুলিশী ব্যবস্থা আরোপ করেছে। এই পাড়ার নিকটেই, ওদের মাসিক বেতনভূক কয়েকজন গৃহস্থ মজবুত গুণ্ডা থেকেছে। বাড়ীউলির নির্দেশে, চাকর'রা তাকে খবর দিলে সে তার লোক সমেত এসে, এইসব লোককে ঘাড় ধরে, বার করে দিয়েছে।

এই পুলিশী ব্যবস্থা ছাড়া এদের পৃথক বিচার ব্যবস্থা ও আইনও থেকেছে। প্রতিদিন দুপুরে বাড়ীউলি পঞ্চায়েতের আসর বসে! এদের মধ্যে একজন, এদের সমাজনেত্রী নির্বাচিত থেকেছে। এই সংস্থা, এই সব মেয়েদের কলহ ও বিবাদ মেটাতে এবং কিছু ক্ষেত্রে এজন্য এদের দোষীদেরকে জরিমানা করেছে। গুরুতর অপরাধে, এদের পাড়া হতে তাড়িয়ে দেওয়াও হয়েছে। এদের আইনে নিম্নোক্ত কয়টা কঠোর দণ্ডযোগ্য অপরাধ থেকেছে।

(১) এক জনের বাবু অন্যজন ভাঙিয়ে নিলে, (২) বাপকে স্থান দিয়ে পুত্রকে, এবং পুত্রকে স্থান দিয়ে পিতাকে বাবু করলে, (৩) কোন বাবুর প্রতি অসদ্ব্যবহার করলে, এতে পাড়ার বদনাম, (৪) বাবুদের পকেট হতে অর্থ বা দ্রব্য অপহরণ, (৫) অর্থ নিয়েও বাবুকে তৃপ্ত না করা, (৬) নাবালক কাউকে ঘরে স্থান দিলে (৭) গৃহস্থ প্রতিবেশীদেরকে কোন পুত্রকে ঘরে নিলে এবং বিধর্মীদেরকে উপপতি করলে! ইত্যাদি।

এদের সংস্থা হতে প্রত্যেক বাড়ীউলির ও তাদের বাড়ীর মেয়েদের নিকট হতে মাসিক চাঁদা ওদের আয়মত নেওয়া হয়েছে। এই অর্থ দ্বারা, কেউ মরলে, তাকে মেয়েরা নিজেরাই খাটে করে শ্মশানে এনে দাহ করেছে। কোনও মেয়ে পুলিশে ধরা পড়লে, তাকে মুক্ত করতে, এই তহবিল হতে উকিলের ফিজ ও স্ট্যাম্প খরচাদিতে খরচ করা হয়েছে। কোনও দিন কারুর আয় না হলে তাকে শুধু হাতে বিনা সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়েছে। এই অর্থ হতে এই মেয়েদের চিকিৎসাতে খরচ করাও হয়েছে। এই অর্থ হতে এরা বারোয়ারী দুর্গোৎসবাদি করেছে ও মধ্যে মধ্যে পাড়াতে যাত্রাগানও বসিয়েছে।

[আমি আমার তৈরী স্কুল ওদেরকে চালাতে বললে ওরা বলেছিল ও সব ভদ্র-লোকদের কাজ]

এদের মধ্যে মধ্যে কোনও বাবুদের সঙ্গে বিবাহও হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বর কনের একপাশে ঐ মেয়ের ওল্ড প্যারামার'রা, এবং ওদের অন্য পাশে ওই মেয়ের নিউ প্যারামার'রা বসেছেন। ওদেরই জনৈক পুরোহিতের নির্দেশে কনে বলেছে, আজ হতে পূর্ব স্মৃতি সব ভূলে আমি একনিষ্ঠ হবো। তাতে বর বলেছে এই দিন হতে আমি অন্য নারী সংসর্গ হতে বিরত হলাম। এতে সমাগত সকলে সম্মতি দিয়ে বলছে বাঢ়ম, বাঢ়ম, অর্থাৎ তাই হউক, তাই হউক। তোমাদের নবজন্ম সার্থক হউক। এর পর উক্ত স্বামী, স্ত্রী পাড়া ছেড়ে রাসবিহারী এভিনিউতে বাসা ভাড়া করে সেখানে উঠে গেছে।

কিন্তু এত পাপের মধ্যেও, এই জোড়াসাঁকো থানার এলাকার ওই মরুভূমির মধ্যে দুইটি ওয়েসিস থেকেছে। ওই দুটির একটি রবীন্দ্রনাথের বাটি, এবং অন্যটি স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাটি। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখনও জীবিত, একটি চুরি ওখানে হওয়াতে, ঐ সুযোগে নিজেই তদন্তে যাই ও স্বামীজীর স্মৃতিপূত প্রতিটি ঘরের মেঝে ছুঁয়ে আসি। ওর এই জীবিত ভ্রাতার সঙ্গে ওদের বাড়ীর রোয়াকে বসে প্রায়ই ওঁর মুখ হতে স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়ে শুনতাম। ওর মতে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ওর কম বয়সে মৃত্যু ঘটে। ওঁর মুখ হতে স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নোক্ত একটি ইচ্ছার বিষয়ে আমি শুনেছিলাম।

"উনি একটি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে এমন একটি ধর্মস্থান সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যে, সৌধটির একদিকে মন্দিরের, একদিকে মসজিদের, একদিকে চার্চের ও একদিকে বৌদ্ধ ও একদিকে গুরুদ্বারের ও একদিকে সিনাগগের স্থাপত্য থাকবে। এই মন্দিরের ভিতরে একটি ঘূর্ণয়মান পুস্তক র‍্যাকেতে প্রতিটি ধর্মের পুস্তকগুলি রাখা থাকবে। উপরন্তু সর্ব ধর্মের সার দ্বারা একটি ধর্মীয় 'কমপ্যারোটিভ স্টাডি' মূলক গ্রন্থ লেখা হবে। এখানে ঐ সব গ্রন্থ হতে অংশ বিশেষ পাঠ করা হবে। প্রার্থনার প্রধান উপদান পাঠ করে সকল ধর্মের লোক এখানে এসে ধর্ম আলোচনা একত্রে করবে।"

এই সময় একদিন একটি সংবাদে আমি অকারণে মর্মাহত হলাম। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পূর্বে ও পরেতে আমার পৈতৃক গ্রাম মাদরালে, আমি কয়টি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে-ছিলাম। (১) এ্যাণ্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটি, (২) একটি মহিলা সমিতি ও (৩) একটি প্রাইমারী স্কুল। ওই স্কুল কয়টিরই আমি সেক্রেটারী থেকেছি, উপরন্তু ঐ স্কুলটিতে আমি সুবিধা ও সময়মত শিক্ষকতাও করেছি।

এই সব কাজে আমাদের গ্রামের আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাসম পরেশনাথ মুখার্জী, কালিদাস ঘোষাল ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌর ব্যানার্জি সাহায্য করেন ও আমাকে গ্রামের কাজে নামান। একদিন পরেশদা—উনি তখন হ্যারিসন রোডে, আমাদের এলাকাতেই, এক মার্চেণ্ট অফিসের অফিস মাস্টার। গ্রামে আমার স্থাপিত, ঐ স্কুলের আমার'ই মনোনীত রূপে রেখে আসা, ওর সেক্রেটারীর কাছ হতে উনি একটা পত্র এনে আমাকে দিলেন। ওতে লেখা ছিল—যেহেতু আমি বহুদিন ওর একটিও মিটিঙে

যোগ দিইনি, সেই হেতু ওর কমিটির প্রেসিডেন্ট-এর পদ হতে আমাকে বাতিল করা হলো ও ললিত ব্যানার্জি'কে সেই স্থানে আনা হলো। আমার পক্ষে গোর ব্যানার্জি তখন আমার ওই স্কুলটি চালাচ্ছিলেন।

এটাতে আমি ক্ষুন্ন হলে পরেশদা, আমাকে বলেছিলেন 'তোমাকে ক্ষুদ্রতর কার্য হতে ও ছোট গণ্ডি হতে মুক্ত করে তোমাকে আমরা দেশের ও সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কাজ করতে ছেড়ে দিলাম, পৃথিবীতে কারুর পক্ষে অপরিহার্য হওয়া অন্যায় ও ক্ষতিকর। এবার হতে আরও প্রয়োজনীয় পথেতে তোমার প্রতিভা তুমি নিয়োগ করবে।' কিন্তু এই পরেশদা পূর্বেতে একদিন আমাকে বলে ছিলেন যে, প্রত্যেকেই যদি নিজের, নিজের, গ্রাম গড়ে তোলে, তাহলে দেশ আপনা হতেই গড়ে উঠবে। এটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে, উনি আমাকে তখন বলেছিলেন। 'হ্যাঁ। ওকথা আমি সে সময় বলেছিলাম। কিন্তু—যেমন ক্ষমা কাউকে আধা-আধি করা যায় না, তাকে তা পুরোপুরি করতেই হয়, তেমনি একবার বারমুখী হলে তাকে সামনে এগুতেই হবে। ঈশ্বর চান যে, বৃহত্তর কাজে তুমি এখন এগুবে, এখন তোমার প্রয়োজন বাইরে সব চাইতে বেশী। মিলনে মানুষ একটা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে বাঁধা থাকে, কিন্তু বিচ্ছেদে সে কর্মময় প্রভাবে বিশ্বের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। তুমি এমন ভাবে সামনে এগিয়ে যাবে, যাতে একদিন আমরা তোমাকে আমাদের গ্রামের ছেলে বলে গর্ব করতে পারি। ওঁর ওই সান্তনার বাণী সেদিন আমার খুবই ভালো লাগেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও, ওটা আমার অবচেতন মনে রয়ে গিয়েছিল।

পরেশদাকে, খুকুরাণীর বিষয় একদিন বললাম। এতে উনি আমার ওই দুর্বলতা সমর্থন না করে বলেছিলেন 'দেখ ওকে যখন আমাদের ঘরে ঢুকতে দিতেও দ্বিধা, তখন ওকে ভালো পথে আনারও আমাদের কোনও অধিকার নেই। সকলের দ্বারা সব কাজ করা সম্ভব হলে পৃথিবীতে, এত শ্রম বিভাজন হতো না। তোমার বা আমার মানসিক গঠন, এইসব কাজের উপযুক্ত নয়। এর অভাবে মন্দকাজে মানুষ ধরা পড়ে ও ভালো কাজে তারা ব্যর্থ হয়ে থাকে, ওসব কাজ, ওর জন্য উপযুক্ত, অন্যেরা করুক। ওর জন্য সামাজিক ধ্যান ধারণা আগে বদলাক, উপরন্তু এখানে পুনর্বাসনের প্রশ্ন রয়েছে। ওই সব কাজের মতো প্রয়োজনীয় শক্তি আমাদের নেই। এদিকে এগুলে আমি তোমাকে বকবো। মেয়েটি একদিন তোমার প্রাণ ও অন্য একদিন তোমার মান বাঁচালো। তবু মনে রাখবে যে ছেলেতে ও ছেলেতে, এবং মেয়েতে ও মেয়েতে বন্ধুত্ব মাত্র হয়। কিন্তু ছেলেতে ও মেয়েতে বন্ধুত্ব হয় না, যে বয়সে তা হয়, সেই বয়সে তোমাদের দুজনেরই পেঁছতে অনেক দেরী।

এই পরেশদার অফিসে, দুপুর বেলাতে আমি প্রায় যেতাম। ওটা থানা হতে মাত্র পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে থেকেছে। উনি ওর থলে হতে কয়টা কৌটা ও একটা দুধের বোতল তুলে সেই গুলো খুলে খাবার বার করতেন। প্রথমে ওখানে উঠানে, ঐ সময় ওর জন্য জমা হওয়া পায়রাদের ও কাকদের খাওয়াতেন, ওই পাখীগুলোর ডাকেতে উনি বুঝতেন যে এবার তাঁর নিজেরও খাওয়ার সময় হয়েছে। মাদরাল গ্রাম হতে ডেলি

প্যাসেঞ্জারী ওকে করতে হতো বলে ওঁকে ঐ সব খাবার সমেত সকাল আটটায় বাড়ী হতে ঐ গুলো নিয়ে বেরুতে হতো। এরপর কাকদের ঐ পায়রাদের খাইয়ে অফিস ঘরে ফেরা মাত্র দেখতেন যে সেখানে থাকা চারটে বেড়ালও ঠিক ঐ সময়ে টেবিলের তলাতে অপেক্ষা করছে। এবার উনি ওর সঙ্গে আনা বোতল খুলে ওদেরকে দুধ খাওয়াবেন, এরপর নিজে সেখানে খেতে বসেছেন ও আমাকেও কিন্তু খাইয়েছেন। পরে খাবারের বাকিটুকু যথারীতি, ঐবাড়ীর সামনে বসে থাকা এক বৃদ্ধা ভিখারীনীকে দিয়ে এসেছেন। এই জন্য-তিনি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু মিষ্টি সঙ্গে রাখতেন।

পরেশদার স্ত্রী, অর্থাৎ আমাদের বৌদিকে এর জন্য বাড়তি পরিশ্রম করতে হতো। এই বাড়তি পরিশ্রম উনি ওঁকে খুশী করতে হাসি মুখেই সহ্য করেছেন। ভবিষ্যতে ওর পুত্রবধূরা এসে এটা জানলে ভাববে যে, উনি কতো কুসংস্কারমনা ও সেকেলে ছিলেন। ওঁর পুত্রেরা ওঁর এইসব গুণের হয়তো ছিটে ফোঁটা কিছু পাবে। কিন্তু ওঁর দৌহিত্র ও দৌহিত্রীরা ওর একটুকুও পাবে কি? কারণ নৈতিক অধঃপতন সমাজে তখনই শুরু হয়েছে। এখন তো মাত্র ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ চলছে। সামনের এগুবার পথ, তখনও তৈরী হতে বাকি।

পরেশদাকে আমি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আপনি এত জন্তু ভালোবাসেন কেন? এর উত্তরে উনি বলেছিলেন যে ওর কারণ এই যে মানুষের মত ওরা বেইমানি করেনা। এইদিন পর্যন্ত বেঁচে না থেকে পরেশদা বোধ হয় বেঁচে গেছেন। এই দিন পর্যন্ত জীবিত থাকলে এযুগের মানুষের মর্মমূল, ঐযুগের তুলনাতে ঢের বেশী বেইমানি দেখে উনি আরও বেশী ব্যথা পেতেন। পুণ্যবাণরা ঠিক সময় বিদায় নেন। কিন্তু পাপীরা শেষ দেখার জন্য থেকে যায়।

পরেশদার উপদেশ মত আমাদের গ্রামের কাজে বহু পরে ফের নেমেছিলাম। কিন্তু যে পথ, পরেশদা, কালিদা মানিকদা ও গৌরদারা তৈরী করে গিয়েছেন, সেই পথে আমরা আমাদের মাত্র শকট নিয়ে গিয়েছি।

পরেশদাকে খুকুরানীর বিষয় বলে খুউব ভাল করেছিলাম। কারণ উনি যে ওখানকার সব খবর পেতেন, ও উদ্বিগ্ন হতেন এটা তখনও আমার জানা ছিল না। ওদের ফার্মের ডিরেকটার বোর্ডের চেয়ারম্যানের ওখানে একটা পুরো বাড়ী ভাড়া করে রাখাছিল। ওইফার্ম হতে মাসিক মাহিনা পাওয়া, এক সুন্দরী গায়িকা ওখানে থেকেছে। বাহির হতে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনও মানী, গুনী, যাদের হাতে কনট্রাক্ট ও গ্র্যাণ্ট দেওয়ার ক্ষমতা থেকেছে, তাদের কেউ এই শহরে এলে তাদেরকে হাতে রাখবার জন্য ওখানে এনে এনটারটেন করা হতো। এইরূপ কায়দাকানুন এই যুগেও করা হয়ে থাকে। তবে এখন এটা বেশ্যা-পল্লীর বদলে ভদ্র পল্লীতেই করা হয়ে থাকে।

পরেশদা এটা ঘৃণা করতেন, এবং এসব এড়িয়ে চলতেন, কিন্তু ওদের ঐ ডিরেকটারের মুখে আমার কাজকর্মের খবর শুনতেন। পরে উনি ওদের ওই সব জানা মাত্র, এই সব কাজের প্রতিবাদ করে, কর্ম ত্যাগ করে অন্যত্র কর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এটি উনি যখন প্রথম জানতে পেরেছিলেন, তখন ওঁরা ওঁকে আমাকে অনুরোধ করতে

এতে সাহায্য করার জন্য বলতে বলেছিলেন। এইসব কাজ, ওর অজ্ঞাতে ওঁদের হেড অফিস হতে নিয়ন্ত্রিত হতো। এর প্রতিবাদে অতো টাকা মাসিক মাহিনার চাকুরী ছেড়ে ওঁকে বেশ কিছুটাকাল সে সময় স্ত্রী পুত্র সমেত অসুবিধাতে থাকতে হয়েছিল।

এই চাকুরি যেদিন উনি ছাড়লেন, সেই দিনই বিকালে ওর সঙ্গে আমার সেণ্ট্রাল এভিনিউতে দেখা হয়েছিল। উনি আমাদের থানাতে ঐ কথা বলে বিদায় জানাতে আসছিলেন।

এই সময়ে আমি ওখানে একটা কিউরিও সপে একটা ভাল জিনিসের খবর পেতে ঢুকছিলাম। উনিও আমার সঙ্গে ওই দোকানেতে এলেন। একটা বার্ম্মা টিক উডের একটা প্রাচীন হাতী আমার পছন্দ, কিন্তু অতো টাকা তখন আমার নেই। অতো সুন্দর ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য বিক্রী হয়ে গেলে পাব না, আমার বিমর্ষ মুখ দেখে আমার অবস্থা বুঝে ওর মূল্য উনি বার করে দিলেন। আমি তাকে বলেছিলাম দাদা, এটা আমি তিন মাস পরে শোধ দেব। উনি একটু হেসে বলেছিলেন। 'এর দরকার আছে কি?'

কিন্তু তখন জানতাম না, যে পরের মাসে উনি বেতন পাবেন না, ওর চাকুরী ছাড়ার ব্যাপারটা পরে ওঁকে ওখানে খুঁজতে গিয়ে জেনে ছিলাম।

এর পরই আমি শ্যামপুকুর থানাতে বদলি হই। এটা শুনে উনি বলেছিলেন যে, এ পাড়ার পরিবেশ হতে এক ভদ্রপাড়াতে আমি যাওয়াতে উনি নিশ্চিন্ত।

এক যুগ পরে হঠাৎ একদিন পুরানো দিনের ঐ হাতিটা বাড়ীতে দেখে মনে পড়ে গেল যে, আমি দেনদার। কিন্তু ঐ টাকা শোধ দেবার আগেই উনি আমাকে চির ঋণি করে রেখে পৃথিবীর ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। এই হাতিটা আমাদের খাবার টেবিলের সম্মুখে আজও রয়েছে। ওটা দেখলেই পরেশদার কথা মনে পড়ে। তখন ওর ছেলে মেয়েদের মধ্যে ওকে খুঁজতে ইচ্ছা হয়।

পরেশদার ঐ আর্থিক অসুবিধা কালে, আমার ইচ্ছা সত্বেও আমি ওঁকে কোনও সাহায্য করতে পারিনি। ছেলেদের কাছে সাহায্যও চাননি। তবে ঐ প্রস্তাব ওকে দিলে উনি তাতে রাজীও হবেন না। তবু কিছুদিন আগে পরেই ওর কর্ম্মদক্ষতার জন্য অন্য এক ফার্ম তাঁকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল।

[বিঃ দ্রঃ—যে নারী ঘটিত বিষয়টি নিয়ে পরেশদার পূর্ব নিয়োগকারীদের সঙ্গে বিরোধ। সেই রকম এনট্যরটেনমেণ্ট হাউস তখন, ও পাড়াতে একাধিক। ওরা সব গোপনে অন্য বাবু আনতো। কিন্তু টেলিফোনে ওদের আনবার সংবাদ বা দুয়ারে মোটরের পরিচিত হর্ণের আওয়াজে ওঁরা তাদের ঐ বাবুদের দ্রুত বার করে দিতেন। এতে ওরা অগ্রিম দেওয়া টাকার অর্দ্ধেক ফিরত দিতেন, কেউ বা কিছুটাও ফিরত পেতেন না, কিন্তু টাকা সম্পর্কিত বিষয় বাদেও এসব বসানো বাবুদের উঠিয়ে দেওয়াতে তাদের মানসিক ও দৈহিক অশান্তি হতো অসীম। ঐ স্থানের বাড়ীউলী পঞ্চায়েতদেরকে আমি এর একটা বিহিত করতে বলে ছিলাম]

পরেশদার মতে, ঐ পাড়ার মেয়েরা ছিল দুঃখী আর, ওদের বাবুরা ছিল বদ। কিন্তু আমার মতে ওরা ছিল নিশ্চয়ই দুঃখী। কিন্তু ওই বাবুরা ওখানে না এলে ওরা

না খেয়ে মরতো। পরেশদার আদরের কাক ও বেড়াল গুলোর চাইতে কি তাহলে ওরা অধম ? এটা ওঁকে বোঝাবার তখন আমার সাহস ছিল না।

এখানে উল্লেখ্য এই যে, ঐ সব এণ্টারটেনমেণ্ট হাউসের কয়েকটিতে, এমন কিছু সুন্দরীমহিলা ছিলেন, যারা ভদ্র পল্লীতে পুত্রকন্যা সমেত বাস করছেন। কিন্তু ওঁরা বেলা চারটে থেকে রাতি দশটা পর্যন্ত ঐ সব স্থানে হাজিরা দিয়েছেন। এদের পুত্র কন্যারা শুধু জেনেছে যে, তাদের মা, ঐ সময়টাতে নিয়মিত ওঁর চাকুরী স্থল অফিসে গিয়ে থাকেন।

[ওই সব বানানো ভদ্র সন্তানদের বসিয়ে পরে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের উপর পড়া মানসিক চাপের বিষয়ে আমি যেমন ভেবেছি, তেমনি এই সব ভদ্রমহিলা যারা, পুত্র কন্যাদের মাতা হয়ে তাদের নিজেদেরই পুত্রকন্যাদেরকে এই ভাবে ঠকানর জন্য তাদের মনেতে আসা অশান্তি সম্বন্ধেও আমি তখন ভেবেছি। স্বামীকে ঠকানোর চাইতে, সন্তানকে ঠকনো সম্ভবত আরও কষ্টকর। কারণস্বামী—স্ত্রীর সম্পর্ক প্রয়োজনের। ওটা একটা স্থায়ী পাতানো সম্পর্ক। কিন্তু মাতা, পুত্রের সম্পর্ক পুরোপুরি রক্তজ।

পরেশদা ও আমার মানসিক গঠনের মৌলিক প্রভেদ এই খানেই । ওর ওই প্রবণতা ছিল সহজাত, কিন্তু আমার এই প্রবণতা ছিল অর্জিত।

এর পরে মাত্র একদিন মাত্র একটি তদন্তের ব্যাপারে পরেশদার ওই পূর্বতন অফিসে গিয়ে ছিলাম। সেখানে দেখলাম যে, সেই কাকগুলো ওঁকে ঐ দিনও কা কা করে ওঁকে তেমনি ভাবেই ডাকছে এবং ওই বেরাল গুলো মিউ মিউ করে বৃথাই ওঁকে খুঁজছে।

[এই পরেশদার পিতা শ্রদ্ধেয় যদুনাথ ছিলেন একজন বৃটিশ বন্ধু জনপ্রিয় জামীন দার। কিন্তু পরেশদা ওরফে পরেশ মুখার্জি নিজে ছিলেন একজন ব্রিটিশ বিরোধী ও ঘোরতর কংগ্রেসী বা একজন বিজ্ঞানী এঁদের কয় পুরুষ যাবৎ পারিবারিক পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করে ছিলাম। কিন্তু—উত্তর কালে ওঁর ভ্রাতা পশুদা একজন মতবাদ হীন হলেও ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সুনীল ও অন্যেরাও ঘোরতর কংগ্রেসী। তবে সেই কংগ্রেস এখন আর নেই। দেখা গেল যে, তার পুত্র ঝড়ু ও খগেন স্বার্থ-বিহীন সমাজসেবী হলেও ঘোরতর কংগ্রেস বিরোধী কম্যুনিষ্ট। তাহলে কি বুঝতে হবে যে, হেরিডিটির সাধারণ নিয়ম মানুষের মানসিক ক্ষেত্রে পরাপুরি অচল এবং আত্মপ্রবঞ্চনা প্রবল। প্রকৃতি বোধ হয় এমনি করেই প্রতিশোধ নেয় তার বিরুদ্ধে কেউ গেলে। প্রতিটি এ্যাকসনেরই রি-এ্যাকসন থাকা স্বাভাবিক। তবু—এদের আরও দুই এক পুরুষের মানসিকতা না দেখলে কোন একটা সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। অন্ততঃ এখানে এনভারণমেণ্ট ওদের হেরিডিটিকে দাবাতে সক্ষম হয়ে থাকবে। কিন্তু ওই খগেন বাবুর কন্যা মুনমুন একটু বেশী উদার সাবধানী হলেও কংগ্রেসী ভাবাপন্না। কিন্তু ওঁরই পুত্র অমিতাভ অন্য বিষয়ে সৎ হলেও নিজে একজন কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক ও সুবিধাভোগী। তবে ওদের ওই স্বভাব বদলাবার বয়স এখনও অতিক্রম করে নি। কিন্তু ওদের মাতা ডলিদেবী ওই পরিবারে

দীর্ঘকাল থেকেও এখনও রাজনৈতিক মতবাদে নিরোপেক্ষ ও অসহায় নীরব দর্শক মাত্র।

এই পরিসংখ্যাটি কয় পুরুষের পারিবারিক ভিত্তিক সমীক্ষার হেরিডিটি বিষয়ক গবেষকদের কাজেতে লাগতে পারবে। চার পুরুষ একত্রে দেখার সুযোগ কম। পরে—এইরূপ আরও কয়েকটি পরিবারের সমীক্ষার বিষয়ে আমি বলবো]।

[এঁদের পরিবারে S. U. C আদি অন্য পার্টীর লোকও থেকেছেন। এটি একই বাড়ীতে বিভিন্ন পার্টীর সহ-অবস্থানের একটি দৃষ্টান্ত। এঁদের বাড়ি রাজনৈতিক কারণে কোনও দিনই আক্রান্ত হবে না। ব্যালেন্স অফ পাওয়ার হেতু এঁরা একে অন্যকে রক্ষা করবেন। এঁদের চক্ষে এঁদের সৎ জামীনদার পিতামহ একজন বুর্জোয়া কিনা তা আমার জানা নেই। তবে তাঁরই রেখে যাওয়া বাড়িতে এঁরা বাস করেন। ওঁদের কয়জন মার্কসবাদী হওয়া সত্বেও একত্রে কংগ্রেসী সরীকীদের সঙ্গে দুর্গা পূজাও করে থাকেন! তবে ব্যক্তিগত ভাবে হয়তো ওঁরা সবাই ঈশ্বর যদুনাথের সম্পত্তির মত তাঁর সৎ গুনেরও উত্তরাধীকারী। তাই ওঁরা কন্যাদের বিবাহে বুর্জোয়া প্রাপ্ত খোঁজেন।]

[এনাদের বাটীতে ওই বাড়ির প্রকৃত ও একদা মালিক ও ওঁদের পিতামহ যদুনাথের পুত্র পরেশদার ও পাশুপতিদার কোনও ফটো-চিত্র আমি দেখিনি। তবে—ওঁদের বাটীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে ইন্দিরা গান্ধীর ও কার্লমার্কসের ফটো নিশ্চয়ই থেকেছে। তবে—ওই ফটোগুলো ওদের ঘরের দিয়ালে থাকলেও ওদের ওই সব ফটো তাদের বুকেতে কতটুকু আছে। সেই বিষয়ে সময়ের অভাবে এখনও আমি কোনও সমীক্ষা করতে পারি নি। তবে—যদুনাথ আজ পর্যন্ত জীবিত থাকলে ওঁর পৌত্র ও প্রপৌত্রদের এই সব মতবাদ গত বিভক্তিতে বিরক্ত হয়ে ওদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকতেন। কিংবা সন্ন্যাসী হয়ে গৃহ ত্যাগ করতেন।

[অন্যত্র—এইরূপ কলিকাতার ও অন্যান্য স্থানের কয়েকটি পরিবারের চার পুরুষের খানসিক সমীক্ষা অন্যত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে।]

নবম অধ্যায়

হঠাৎ শুনলাম আমাকে এই থানা থেকে অন্য থানাতে বদলি করা হবে। এটা চৌকা গেজেটের খবর। থানার সিপাহীদের রসুই ঘরকে বলে চৌকা। ওখানে ডেপুটি সাহেবের আর্দ্দালীরা এসে ওয়াকিবহালরূপে বহু খবর বলে যায়। এগুলি প্রায় ঘোড়ার মুখের খবরের মত থেকেছে। এটা সরকারী গেজেটে পরে বার হবে। সমগ্র এলাকার লেকেরা জেনেছে যে আমি বদলী হয়েছি। এলাকাতে কিছু লোক মনে প্রাণে চায় যে আমি যেন শীঘ্রই বদলি হয়ে যাই। আমার জন্য তাদের আমদানী বন্ধ। এদের মধ্যে একজন হঠাৎ পথেতে আমাকে দেখে বললেন—কি মশাই আপনি এ থানা হতে তাহলে বদলি হলেন। ওদের কাছে "ইয়েসটারডেজ গড ইজ টুডেজ ডগ, আর টুডেস ডগ ইজ টুমরোজ গড"। তবু তখনও আমি এই থানাতেই রয়েছি।

এই দিন আমি কোয়ার্টার্স হতে নিচের অফিসে নেমে টেবিলের ড্রয়ারে রাখা কাগজ পত্র খুঁটিয়ে দেখছিলাম এবং প্রয়োজন মত ঐ গুলো বেছে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলছিলাম। কারণ এমন বহু কাগজ ও চিঠি পত্র ওতে ছিল যে গুলো আমার বদলিতে আসা অফিসারটির হাতে পড়া আমার পক্ষে ক্ষতিকর।

ঠিক এই সময় একটি বালক আমাদের থানাতে এসে উপস্থিত হল। এই ছেলেটিকে চিনতে আমার দেরী হয় নি। এই বালকটি ছিল সেই গীতা রানী নামক মেয়েটির ছেট ভাই—যে মেয়েটি আমাকে প্রত্যাখান করে বলেছিলেন যে, সে আমাকে বিয়ে করবে না। এই ছেলেটি আমাকে সহজ ভাবেই বললো, 'দিদি মোটরে বসে আছেন বাইরে। উনি তো এই থানার ভিতরে আসতে পারেন না। আপনার সঙ্গে মাত্র দুমিনিটের জন্য কথা বলবেন। এতে আমি অবাক হয়ে ভাবলাম যে তাহলে ঐ মেয়িটি তার পূর্ব ব্যবহারের জন্য নিশ্চয় অনুতপ্ত হয়ে তার পূর্ব মত বদলে থাকবে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে জোর কদমে বাইরে বেরিয়ে সপ্রতিভ ভাবে ওর মোটরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

এই মেয়েটিকে এই দিন আগের চাইতে আরও বেশী সুন্দরী দেখাচ্ছিল। লজ্জাতে ওর গাল দুটি আরও রাঙা হয়ে গিয়েছে। আমি বুঝলাম যে মেয়েটি এখন তবে ভুল বুঝে মত বদলে থাকবে। আমি ভাবলাম আমিও তাকে প্রত্যাক্ষান করবো। কিন্তু তাতে কার কি লাভ বা লোকসান হবে। ওকে তাহলে এখন ক্ষমা করে গ্রহন করাই আমার উচিৎ হবে।

মেয়েটি তার গাড়ীতে বসে থেকে ও আমাকে রাস্তাতেই দাঁড় করিয়ে রেখে বললেন। -শুনলাম দাদা, আপনি কাল এই থানা থেকে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। আমার কিন্তু ওইদিন আপনাকে ঐ ভাবে কিছু বলা উচিৎ হয়নি। এখন ভিতরের প্রকৃত ঘটনা যাই

হোক না কেন ? ঐ গহনাগুলো তো আপনার চেষ্টাতেই উদ্ধার হয়েছে। বাবা এই সব তো কিছুই জানেন না। শুধু আমিই আমার এক আত্মীয়ের, যিনি আপনারও এক বিশ্বস্ত বন্ধু, তাঁর নিকট হতে ওটা জেনেছিলাম। বাবা আপনাকে দেবার জন্য পুলিশ কমিশনারকে পাঁচশত টাকা পাঠিয়েওছেন। দাদা, আমি আপনার প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল, কিন্তু কোনও একটা কারনে আমি নিরুপায়। সেই দিনের ঐ ভুল আমি সুধরাতে পারছি না। তাহলে দাদা। আমি এখন যাই। আমি এখানে বেশীক্ষন থাকলে কথা উঠবে।

ওঁনার ইসারাতে এবার ওঁর ড্রাইভার ওঁর গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। গাড়ীটা ওখানে আর নেই—তবু আমি ঐ স্থানে তখনও রয়েছি।

হুঁ! দা—দা! ওর বারে বারে ঐ দাদা উচ্চারন আমি লক্ষ্য করেছিলাম। ওদের গাড়ীটা চলে গেলে আমি মনে মনে আত্তড়ালাম "তাহলে দিদি ভাই। তোমার এত কষ্ট করে এখানে আসবার কি দরকার ছিল ?

[এইরূপ বাক্য—অর্থাৎ 'আপনাকে আমি বিয়ে করব না' আমাকে আরও একবার শুনতে হয়েছিল অন্য একটি মেয়ের মুখে। আমি তখন বালিগঞ্জ থানাতে। তবে ঐ মেয়েটি আমাকে বুঝাতে পেরেছিল যে, ছেলেদের যেমন একটা পছন্দাপছন্দ আছে, তেমনি মেয়েদেরও একটা পছন্দাপছন্দ আছে। যতদূর মনে পড়ে ঐ মেয়েটির ডাক নাম ছিল ডাকু। ওদের দুই বোনের সঙ্গে আমার দেখা হয় আমারই স্থাপিত এক মেটারনিটি হোমে। ওরা ওখানে রানাঘাট হতে এসেছিল। কিন্তু তাতে সে নিজেই ঠকে ছিল। আমার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি এতে। পরে ওদের বাড়ীর একটি মেয়ের সঙ্গে আমাদেরই পরিবারের একজনের বিয়ে হয়েছিল। সে মেয়েটির তাতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। সে খুব সুখেই ঘর সংসার করছে।]

এখানে উল্লেখ্য এই যে আমার কোনও মেয়ের সঙ্গে ভাব করার এক মাত্র উদ্দেশ্য বিবাহ করা—কিন্তু ওদের ব্যবহারে আমি শুধু অন্যায়ভাবে আঘাতই পেয়েছি।

সে যাই হোক। তখনও আমি সম্বিত হারা হয়ে থানার সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা মোটর গাড়ী সেখানে এসে থামল। ওটি কিন্তু সেই মেয়েটির গাড়ী নয়। না। সে ওখানে ফিরে আসেনি। আমাদের বড় সাহেব প্রভাত মুখার্জী তাঁর গাড়ী থেকে ওখানে নামলেন। ভাগ্যিস উনি এখানে আসবার আগে ঐ মেয়েটির গাড়ী চলে গিয়েছিল। বড় সাহেব আমাকে জিগ্যেস করলেন—কি খবর ? তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে। আমি প্রত্যুত্তরে যথারীতি তাঁকে স্যালুট দিয়ে বললাম, 'স্যার। দূর হতে আপনার গাড়ীটা দেখলাম তাই।

কিন্তু তখনও ঐ মেয়েটির ষ্টোভের মত জ্বল জ্বলে মুখটা আমার চোখ হতে মিলিয়ে যায়নি। পরে অবশ্য আমি বুঝে ছিলাম যে, দেহের সৌন্দর্যের থেকে মনের সৌন্দর্যের প্রয়োজন বেশী। গোক্ষুরা ও কেউটে সাপগুলোও তো কতো সুন্দর।

কারুর রূপ বেশী দিন থাকে না। কিন্তু গুনটি বহুকাল থাকবে। হোয়াইট লেপ্রসি নিশ্চয় কাম্য নয়। আমাদের এই দেশ শ্যামলা—তাই আমরাও শ্যামলা।

শ্যামলারও একটা পৃথক রূপ থেকেছে। সে যাই হোক। মেয়েদের রঙের ওপর আমার মোহ। তখন আমার মধ্যে একটা মনোজট অর্থাৎ কমপ্লেক্স্এর রূপ নিয়েছে। ওটা ত্যাগ করা শক্ত।

[তবে—ঐ বারে বারে ব্যর্থতা আমাকে "ভাব করে বিয়ে করার" রীতির উপর একটা বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছিল। এইরূপ ঘটনা শুনামাত্র 'আমি ক্ষেপে উঠেছি এবং এর প্রতিরোধে আমি অভিভাবকদের সাহায্য করেছি। প্রতিটি ভাব প্রসূত "ইলোপ-মেন্ট" মামলা নিজের হাতে রেখে ঐ তরুণ তরুণীদের পৃথক করেছি। মেয়েটিকে বাড়ী পাঠিয়ে সেই প্রেমিক ছেলেটিকে জেলে পাঠিয়েছি। এইরূপ একটি মামলাতেও আমি ফেলিওর হইনি। সাক্ষী সাবুদ ঠিকই খাড়া করেছি।

আমি ইন্টার কাস্ট বিয়ে পুরোপুরি সমর্থন করি। কিন্তু ওটি ভাব করে সমাধা হলে আজও ক্ষেপে উঠি। কিন্তু আমার এই মতবাদ বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষ হতে বোধ হয় উত্তর কালের বিষয় ভেবে মনে মনে বেশ একটু হেসেছিলেন। আর উনি বলেছিলেন যে, যা এতকাল তুমি রোধ করে এসেছো, তাই একদিন তোমাকে একাধিক ক্ষেত্রে খুশী মনে মেনে নিতে হবে। অতোগুলি মেয়ের চোখের জল ও এতগুলি ছেলের অভিশাপ ব্যর্থ হতে পারে না। তবে তোমার অন্য ভালো কাজের জন্য তুমি তাতে লাভবান ও শেষ জীবনে সুখী হবে।

[বিঃ দ্রঃ ঃ—পরবর্তীকালে আমি গবেষণা করে এই প্রেম রোগ সারাবার একটা ঔষধও বার করেছি। দেখা গিয়েছে যে মিষ্টি বেশী খেলে এই রোগ বাড়ে, কিন্তু তেঁতো বেশী খেলে এই রোগ কমে।]

এর পর হঠাৎ শুনলাম এই যে, আমার বদলির হুকুম রদ হয়ে গিয়েছে। কারণ আমার বদলে কাজ করার মত উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়নি। আরও কিছু দিন এমনি চলে গেল। বন্ধুদের বিয়েতে বৌভাত খেতে যাই। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখি যে ওদের বৌ সুন্দরী। এখন সুন্দর মেয়ের সংখ্যা এদেশে কম—তাই শীঘ্রই ওরা ফুরিয়ে যাবে। আর দেরী করা যায় না। আমার এক বাল্যবন্ধু তো বলেই বসলেন "আর কত দেরী করবি। আমার মেয়ে হবার পর কি তাকে তুই বিয়ে করবি? আমার এই সুবুদ্ধি এত দিনে হওয়াতে আত্মীয়েরা খুশী এলেন। আমার জ্যেষ্ঠতাত কালিসদয় ঘোষাল এটি জেনে এর ব্যবস্থাও করলেন। ঠিক যেমনটি চেয়ে ছিলাম, ঠিক তেমনটিই পেলাম। এতে নেগোসিয়েটেড বিবাহের উপর আমার আস্থা অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, এই থানাতে থাকা কালেই আমার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু এতে শীঘ্রই বুঝলাম যে বাহিরে তো একজন বড় সাহেব ছিলেনই, কিন্তু ঘরেতেও হুকম চালাবার জন্য অন্য একজন হলেন। তবে এতে সমস্যা না কমে বরং বেড়ে গেল। তাতে বার মুখী না থেকে পুরোপুরি ঘর মুখী হলাম। মুহূর্তে মুহূর্তে এঁকে বহু কৈফিয়ৎ দিতেহবে। যেমন "আজ ঘরে ফিরতে এত দেরী কেন? আজ বেশী খাবে না কেন? কোথায় কি করেছো—কি খেয়েছো? আজ বারান্দা থেকে দেখলাম তুমি ফুটপাথে একটা মেয়ের সাথে পুরো তিন মিনিট ছয় সেকেণ্ড কথা বলেছিলে। কেন? মেয়েটা

মাত্র তোমার থেকে দু ফুট আট ইঞ্চি দূরে দাঁড়িয়েছিল। ঐ নির্লজ্জ মেয়েটা কে? কি কথা ওর সঙ্গে বলেছিলে? যতসব বাজে ঝামেলা। পুলিশের কাজে, মামলার জন্য কত মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হয়। কারণ জনগণের মধ্যে অর্দ্ধেক তো মেয়ে। এসব উনি বুঝেও বুঝবেন না। যাক্। শেষে বরাত জোরে ঐগুলি সহনশীল হয়ে গিয়েছিল। তবু ভাল ওঁদের দৃষ্টির দূরত্বের একটা সীমা থেকেছে। অন্য দিকে পুলিশেরও সময়ের চাইতে অসময়ে এবং স্থানের চাইতে অস্থানেতে বেশী ডাক পড়ে। এটি আমাকে বহু কষ্টে ওঁনাকে বুঝাতে হয়েছিল।

এখন আমি আর বাস গাড়ীর আরোহী নই। তাই ইচ্ছামত অলি গলিতে ঢুকতে পারি না। ট্রাম গাড়ীর মত লাইন ধরে নির্দ্দিষ্ট পথে চলতে হয়। ওঁর চেনা নয় এমন কাউকে দিদি, বৌদি বা বোন ডাকার উপায় নেই। ব্যক্তি স্বাধীনতা পুরোপুরি বাতিল। এই একটি বিষয়ে শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতায় প্রভেদ নাই। কেউ তা মুখে বলেন বা কেউবা তা মনে চেপে রাখেন।

[এতে আমি বুঝলাম যে এক বুড়োর সঙ্গে যেমন অন্য এক বুড়োর বনে না, তেমনি একজন মেয়ে অন্য মেয়েকে সইতে পারে না। উপরন্তু নেগোসিয়েটেড ম্যারেজেরই যখন এই অবস্থা, তখন লাভ ম্যারেজে এর থেকে খারাপ অবস্থা হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষই ভাবে যে ওদের একজনের বা অন্যজনের—তাদের পূর্বের অভ্যাস হয়তো ফের এসেছে। এতে এক জন অন্যজনকে সন্দেহ করে সন্দেহ বাতিক রোগগ্রস্থ হয়।]

'ভাব' করে বিয়ে করার বিপজ্জনক পথেতে আর আমি পা বাড়াই নি। যেমনটি চেয়েছিলাম, তেমনটিই তো পেয়েছি। এবং সেই সঙ্গে বুঝেছি যে একমাত্র হিসটিরিয়া রোগীরাই এই পথে গিয়ে থাকে।

আমি ততোদিনে বুঝেছিলাম যে, ছেলেদের এমন একটা বয়েস থাকে, যে সময় প্রতিটি তরুণী মেয়েকেই তার পছন্দ হয়। 'অল দ্যাট গ্লিটার্স আর নট গোল্ড'। প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অভাবই এর জন্য দায়ী। সেই সাথে ততোদিনে আমি মত বদল করে এও বুঝেছিলাম যে, ডাক্তাররা যেমন ঔষধের উপকরণগুলি প্রেসক্রিপসনে লিখে দেন এবং সেই মত দোকানের কমপাউন্ডাররা ওই ঔষধ তৈরি করে দেয়। ঠিক সেইমত আমাদের চাহিদা অভিভাবকদের জানাতে হবে। তাহলে সেই চাহিদামত অভিভাবকেরা বাকী কাজটুকু ঠিকভাবে করে দিতে পারবেন। এই বিষয়ে পোড় খাওয়া, অভিজ্ঞ, শুভাকাঙ্খীরাই শুধুমাত্র সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

এই সব ব্যক্তিগত বিষয় এখন মুলতবী রেখে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফেরা যাক।

হঠাৎ একদিন এলাকাতে এক দুর্ঘটনা ঘটল। থানার এক সিপাহী এলাকার রাজপথের ফুটপাতে খুন হল। এটি একটি সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে ছিল। কিন্তু এতে অফিসারদের সঙ্গে তাদের গৃহিণীরাও জড়িয়ে পড়েছিলেন। এজন্য ঘটনাটি এখানে বিষদভাবে ব্যাখ্যা সহ বিবৃত করছি।

প্রায়ই দেখা যেত যে কোনও স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হবার উপক্রম হওয়া মাত্র একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ করা হতো। এটি আরম্ভ হওয়া মাত্র আর কংগ্রেসীদের দেখা পাওয়া যেত না। কারণ অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস তখন অসহায়। হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে, হ্যালিডে পার্কে মুসলিমরা এবং গিরিশ পার্কে হিন্দুরা আবার সরগরম। এটা যেন একটা অদৃশ্য হস্তের কায়দা বা ভেল্কি খেলা।

এতকাল শুধুমাত্র মসজিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করা বা বন্ধ না করার বা প্রকাশ্যে গো-বধ বা গো-মাংস বিক্রয় করা বা না করবার ব্যতীরেকে অন্য কোনওসাম্প্রদায়িক সমস্যা এদেশেতে থাকে নি। এইটুকুর জন্যেই হিন্দু-মুসলীম নির্বিশেষে পুলিস কর্মীদের তাদের প্রধান পর্ব মহরম, ঈদ এবং দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে অন্যদের মতন আনন্দ হিল্লোলে যোগ না দিয়ে ঐ কটা দিম রাস্তার মোড়ে মোড়ে বা মসজিদগুলির সামনে লাঠি হাতে সিপাহীদের নিয়ে ভোর রাত হতে রাত বারোটা পর্যন্ত বাজনা বাজানো বন্ধ করতে, গো-বধ বন্ধ করতে বসে থাকতে হতো। ঐ পরবের দিনকটার পর ফের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে।

কিন্তু এই এলাকাতে হঠাৎ আবার শান্তি বিঘ্নিত হতে লাগলো। কোনও এক অদৃশ্য আঙ্গুলীর হেলনে আবার এখানে ওখানে হঠাৎ সাম্প্রদায়িক জিগির আরম্ভ হলো, তাতে আমাদেরও কাজকর্ম বেড়ে গেলো। একদিক হতে ওরা সাপ ছাড়বেন এবং ঐ একই সাথে ওদের রুখতে নেউলও পাঠাবেন। এজন্য কিন্তু ওরা বদনামের ভাগীদার নিজেরা হবেন না। এটা ছিল এক অপূর্ব রাজনীতির খেলা। পরে অবশ্য ওই অদৃশ্য মানুষরাই এটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ তখন ওর আর কোনও প্রয়োজন থাকে নি। ফের কংগ্রেসীআন্দোলন হলে ওটা ব্যবহার করা হবে। ঐগুলো কিছুটা রিহার্সেলের মতন। এর আগেও কয়েকবার এরূপ ঘটনা ঘটেছে। উদ্দেশ্য —এটার জন্য মেটিরিয়াল মজুত করে রাখা।

একদিন খবর এলো যে, হ্যালিডে পার্কে সুরাবাদী সাহেবের সভাপতিত্বে একটি মিটিং হবে। এটি শুধুমাত্র মুসলীমদের জন্য আহূত সাম্প্রদায়িক মিটিং। ঐ সময় হ্যালিডে পার্ক ঘিরে সব কটি বাড়ীই মাড়োয়ারী হিন্দুদের দখলে। ঐ সভার আলোচ্য বিষয় এই যে—বেশী টাকা কবলে ওখানকার মুসলীমদের বাড়ীগুলি হিন্দুরা কিনে নিয়ে ঐ মুসলীম প্রধান অঞ্চলটি মুসলীম শূন্য করেছে।

এতে শান্তি ভঙ্গে আশঙ্কা থাকাতে আমি ও আমার সহকর্মী মহম্মদ মহসীন একদল পুলিস সিপাহী নিয়ে ওখানে হল্লা ডিউটিতে মোতায়েন হলাম। কিন্তু সুরাবাদী সাহেব আমাদের ওখান থেকে পুলিসকে উইথড্র করতে বললেন। তাতে আমরা যথারীতি অস্বীকৃত হয়েছিলাম।

এরই মধ্যে কমিশনার কলসন সাহেবের গাড়ী ঐ পার্কের গেটের সামনে থামলে আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। সুরাবাদী সাহেবও সেখানে এসে আমাদের বিরুদ্ধে কমপ্লেন করলে কমিশনার সাহেব বললেন, 'বাট দে হ্যাভ দেয়ার ওন অর্ডার্স'। আপনি লোক্যাল এসিসটেণ্ট কমিশনারের নিকট গিয়ে আপনার বক্তব্য রাখুন।

এটা ছিল একটা প্রশাসনিক কায়দা। অর্থাৎ উভয়েই জানেন যে, এই ক্ষেত্রে ওই এ্যাসিসটেণ্ট সাহেব কি করবেন বা কি বলবেন ও এই বিষয়ে ডিসিসন নেবার তাঁর ক্ষমতাই বা কতটুকু।

হঠাৎ এই মিটিঙে এক মুসলীম ভদ্রলোক সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করে তাঁর বক্তব্য রেখে বললেন, যে ঐ ব্যক্তি "আয়েষাকে" জগৎ সিংহের অনুরক্ত করে মুসলীমদের মনেতে আঘাত দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ ভদ্রলোকের ওই বই কেন বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে না। ওদের একজন বলেছিলেন যে, ওকে এখনও গ্রেপ্তার করাই বা হয়নি কেন? বুঝা গেল যে, ওঁর ধারণাতে বঙ্কিমবাবু আজও জীবীত।

এইসব কথা শুনে সভার মধ্য থেকে একজন উঠে বললেন, মশাই, এটা তো একটা কাহিনী মাত্র। কিন্তু আলাউদ্দীন খিলজীর গুজরাটের রাণীকে জবরদস্তিতে বিবাহ করা, আকবরের যোধবাঈকে বেগম করার বিষয় ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না কেন? সভাপতি সেই ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞাসা করাতে উনি বলেছিলেন যে, উনি ফরিদপুরের এক বাঙ্গালী মুসলমান।

এতে শ্রোতারা চিৎকার করে উঠলেন—আল্লা হো আকবর। পার্কের বাইরে হতো তৎক্ষণাৎ উত্তর এলো "বন্দেমাতরম"। তখনও পুলিসের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকত বোধ ছিল না। আমার সহকর্মী মহম্মদ মহসীন সাহেব এই সব দেখে শুনে আমাকে বললেন। 'ভাইসব, এই লোকগুলিকে জেলে না পাঠিয়ে মেণ্টাল হসপিটালে পাঠানো উচিত। এটী হতে আমরা বুঝেছিলাম যে, উসকানী দাতারা ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে। একটা কিছু শীঘ্রই ওখানে ঘটবে।

সত্যেনবাবু তখন ছুটিতে। আমি তাঁর স্থলে থানা ইনচার্জ। উর্ধতনদের হুকুম নেবার সময় নেই। অগত্যা আমাকেই এ বিষয়ে একটা ডিসিসন নিতে হয়েছিল। আমি এবার এগিয়ে এসে তাদের বলেছিলাম, 'আমি ল্যোকাল থানার ইনচার্জ রূপে হুকুম দিচ্ছি যে, এই মিটিং বে-আইনী। সুতরাং আমি হুকুম দিচ্ছি আপনারা এই স্থান ত্যাগ করুন। এরপর কিছু কনস্টেবলকে সেখানে পাহারায় রেখে আমরা থানায় ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু সেই রাত্রে জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটে টহলরত এক মুসলীম সিপাহী মুসলীম জনতার দ্বারা খুন হলো। সে সময় সমগ্র পুলিস বাহিনী নিজেদেরকে হিন্দু বা মুসলীম না ভেবে একটি পুলিসরূপ পৃথক সম্প্রদায় ভেবেছে। উপরন্তু সমগ্র থানাটা তখন একটা একান্নবর্তী পরিবারের মতন। এই খবর যখন থানাতে পেঁছিলো, তখন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সিপাহীরা ক্রোধে অন্ধ হয়ে থানা হতে বেরিয়ে ঐ স্থানেতে গিয়ে একটি বিশ্রী কান্ড ঘটালো। আমরা, বাঙ্গালী অফিসাররা, তখন নিজ নিজ কোয়ার্টার্সে ঘুমুচ্ছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি বিশ্রী ও মিথ্যে অভিযেগে আমাদের বিরুদ্ধে ওঁদের নেতারা নিয়ে এসে-ছিলেন। ওখানে নাকি লুটপাঠ হয়েছে এবং লুটের দ্রব্য থানাতে প্রতিটি অফিসারের ঘরেতে মজুত রয়েছে।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবীণ অভিজ্ঞ ইংরাজ ডেপুটিকমিশনার সাহেব তখন ছুটিতে। তাঁর স্থলে এক সপ্তাহের জন্যে একজন তরুণ অনভিজ্ঞ ইংরেজ ডেপুটি অফিসিয়েট করছিলেন। আমাদের এ্যাসিসটেন্ট সাহেবের অনুরোধ অবজ্ঞা করে উনি নিজে কয়েকজন মুসলীম ক্ষতিগ্রস্থ ফরিয়াদীকে সঙ্গে নিয়ে থানাতে আসবেন। উনি নিজে ওঁর অফিসারদের ত্রিতলে থাকা ঘরগুলি তল্লাসী করে লুঠের মাল উদ্ধার করবেন।

এই কালে থানাগুলির হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিটি সিপাহীদের ধারনা ছিল যে-তারা প্রতিদিন বহু পাপ কর্ম করে। কিন্তু থানার উপরের কোয়ার্টাস গুলিতে থাকা নিষ্পাপমনা গৃহীনীদের পুন্যের জন্য তারা তা হতে রক্ষা পায়। এইসব গৃহীনীদের প্রতি তাদের অঢেল ভক্তি ছিল। তারা সব অবস্থাতেই উপরে ওঁনাদের ঘরে যেত এবং তাদের ঐ মা' জীদের কিছু কাজ ওঁনাদের স্বামীদের অজ্ঞাতেই করে দিত। এই বিষয়ে ওঁরা চাকরদের মারফৎ নিচের হাবিলদারদের একটা খবর পাঠালেই হলো।

[একবার এই থনার এক অফিসার রহমন সাহেবের স্ত্রী জুবেদা বেগম তাঁর স্বামীর দেওয়া একটা ফ্রি পাশ নিয়ে ঐ এলাকার এক সিনেমাতে যায়। কিন্তু এক নূতন অজ্ঞ কর্মী সেই পাশ ডিস অনার্ড করে ও তাতে ওঁকে ফিরে আসতে হয়। খবরটা থানাতে রটে যাওয়া মাত্র সীপাহীরা ক্ষেপে উঠেছিল। থানার এক মাজীর অপমান তারা সহ্য করেনি। সেই রাত্রেই এলাকার গুন্ডারা এই সিনেমা হাউস তজনছ করে দেয়। ডেপুটি সাহেব নিজে এর তদন্ত করে ছিলেন। কিন্তু তাকে বলা হল ঐ দিন সাধনা দেবীর নাটক ওখানে ছিল। তার জন্য ওরা ব্ল্যাকে টিকিট বিক্রি করারজন্য এইঅঘটন। পরের সপ্তাহে ঐ সিনেমার মালিক নিজে থানাতে এসে একটা মিটমাট করে গিয়েছিলেন।

এই একটি ঘটনা হতেই থানার মাজীদের উপর সিপাহীদের ভক্তির মাত্রা বোঝা যাবে। ওদের দাবী এই যে ওরা দিনরাত গুন্ডাদের কবল থেকে সিনেমা হল গুলো রক্ষা করে। তার পরিবর্তে মাজীদের দু এক বার সিনেমা দেখতে বাধা কোথায়। এর জন্য টিকিট বাবদ টাকা দিতে ওরা প্রস্তুত।]

এই সিপাহীদের মনেবৃত্তি ছিল সুদূর প্রসারী—তাই ঐ ছেকরা ডেপুটির ঐমতলব জানামাত্র ওর আর্দালী থানাতে এসে আমাদেরকে ব্যাপারটা আগেই জানিয়ে গেল। সত্যেন বাবু ছুটিতে থাকাতে তখন আমি থানা ইনচার্জ। থানার ইতিহাসে এটি ছিল একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এই তল্লাসীতে সিপাহীদের ও অফিসারদের এবং তাদের ওই সব মাজীদের অপমান। এই সংবাদে ওরা ক্ষেপে উঠেছে।

আমি ওদেরকে আপাততঃ শান্ত করে উপরে এসে স্ত্রীকে সব বললাম ও আমার পরিকল্পনা তাকে বুঝলাম। আমার তরুন সহকর্মীরাও তাদের স্ত্রীদের ব্রিফড করলেন। আমরা সকলে জেনারেল ডাইরিতে একটা করে ডিপারচার লিখে এক এক দিকে তদন্তে বার হয়ে গেলাম।

ঐ তরুন অনভিজ্ঞ ইংরাজ সাহেবের ধারনা, এই সংবাদ গোপন থাকবে। তার তখনও ধারনা যে তাঁর অধিনস্ত কর্মীদের ঘর তল্লাস করার অধিকার তাঁর আছে। এটি ছিল তাঁর গৃহীত এক বিপজ্জনক প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

এই সাহেব তরতর করে কয়েক জন গোরা সার্জেন্ট সহ সিঁড়ী বেয়ে উপরে উঠে দেখলেন যে, আমার স্ত্রীর নেতৃত্বে অফিসাদের স্ত্রীরা একত্রে কোয়ার্টার্স গুলি থেকে বেরিয়ে সিঁড়ীর চাতালে এসে ওঁদের পথ অবরোধ করেছেন। পরে উনি অভিযোগ করছিলেন যে মহসীনের স্ত্রী রিজীয়া বেগমের হাতে একটা ডাবকাটা দা, এবং অন্য এক অফিসারের স্ত্রী সুষমার হাতে একটা কয়লা ভাঙা হাতুড়ী ছিল। তবে ওদের একজনের হাতে একটা মুড়ো ঝ্যাটা থাকার অভিযোগ মিথ্যে থেকেছে।

ওদের নেতৃরূপে আমার স্ত্রী এই সাহেবকে তীব্রস্বরে ইংরাজীতে বলেছিলেন — স্যাহেব! এখানে যেমন আমাদের স্বামীরা থাকেন, তেমনি আমরাও থাকি। এটা আমাদের প্রাইভেট কোয়ার্টার্স। আমাদের স্বামীরা আপনাদের সারর্ভেন্টস হতে পারেন, কিন্তু আমরা কেউ আপনাদের নোকর নই। এখানে আমরা সাধারণ নাগরিক। আদালতে তল্লাসীর পরোয়ানা না দেখানো পর্যন্ত আমাদের সেল্ফ ডিফেন্সের অধিকার আছে। আমাদের স্বামীদের পিস্তল আমাদেরই হেফাজতে রয়েছে। দরকার হলে ওগুলোও বেরুবে। তবে আপনার ওয়াইফ যদি এখানে আসেন, তাহলে তাঁকে আমাদের ঘর গুল্লা দেখাতে পারি। তাঁকে এখানে ডাকুন।

তাতে ঐ সাহেব ভড়কে গিয়ে আমার স্ত্রীকে বললেন, ম্যাডাম। আপনাদের ঘরে কি কিছু লুটের মাল আছে? ওঁর এই উক্তিতে ঐ সব মহিলারা ফের ক্রোধে ফেটে পড়ছিলেন। ওঁনারা সব অনেকেই ম্যাট্রিকুলেট। এমনকি কেউ কেউ গ্রেজুয়েট। ভাগ্য দোষে ওঁরা দারোগাদের স্ত্রী হয়েছেন। ওদেরকে শান্ত করে আমার স্ত্রী এবার শান্তভাবে সাহেবকে বলেছিলেন। এই 'সব নোংরা কাজ ইংরেজ মেয়েরা করলেও ভারতীয় মেয়েরা জীবনে করবে না।'

এর মধ্যে বাঙালী এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার খবর পেয়ে থানাতে ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে ঐ ইংরেজ তরুণ রংরুট অনভিজ্ঞ ডেপুটি নিচে নেমে গেছেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও থানার কোনও অফিসারকে ধারে কাছে পাওয়া গেল না। আমরা ইচ্ছে করেই বহুক্ষণ কেউ থানায় ফিরিনি।

ঐ ইংরেজ ডেপুটি এবার থানা থেকে ফোন করে পুলিশ কমিশনারের ইনস্ট্রাকশান চাইলে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ কমিশনার অবাক হয়ে তাকে ধমক দিয়ে তক্ষুণি তাঁর অফিসে আসতে বললে তিনি দ্রুত গতিতে সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন। এদিকে আমরা থানায় ফিরে সব শুনলাম, কিন্তু তাতে বেশ একটু ভীত হয়েছিলাম। আমাদের এক বন্ধু উকিল পশুপতি ভট্টাচার্য্যকে ফোন করে তার পরামর্শ চাইলাম এবং বললাম যে ওঁরা ঠিক ঠিক মত আমাদের রিহার্সাল দেওয়ার বাইরে একটু বাড়াবাড়ী করে ফেলেছেন। উনি এজন্য তক্ষুনি একটা সুপরামর্শ আমাদেরকে দিলে আমরা সেইমত এগুলাম।

আমি তখুনি একটা জয়েণ্ট পিটিশন ড্রাফট্ করে দিলাম। অফিসারদের পক্ষে জয়েন্ট পিটিশন পাঠান অপরাধ, কিন্তু তাদের স্ত্রীরা এর আওতার বাইরে। স্ত্রীদের দিয়ে সই করিয়ে পিটিশনটি পুলিস কমিশনারের নিকট পাঠানো হল। এবং একটা কপি বাংলা গভর্ণমেণ্টের চীপ সেক্রেটারীর কাছে পাঠানো হলো। ওতে ঐ তরণ ডেপুটি কমিশনারের নামে ওঁরা "ট্রেস্পাসের" ও মান হানির অভিযোগ এনে এর জন্য বিচার প্রার্থী হয়েছিলেন।

ওরা ঠিক করেছিলেন যে আমাদের প্রত্যেককেই দলছুট করতে দূর দূরের স্থানে বদলি করা হবে। কিন্তু তখুনি ফের কমোসন এড়াতে সেটা বাতিলও করা হল। ওঁরা তখন পুরাপুরি এই নজীরহীন ঘটনাতে দিশে হারা। ততোক্ষণে এই থানার ওই সব বধূরা কিরূপ পরিবার হতে এসেছেন, সেই সম্বন্ধে স্পেশাল ব্রাঞ্চের গোপন তদন্ত আরম্ভ হয়ে গেল। ঐ গোপন তদন্তে জানা গেল যে এরা কেউ কোনও এক ডিষ্ট্রিক্ট জর্জ বা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কন্যা। কেবল আমরই স্ত্রী ছিলেন বিহার গভর্ণমেণ্টের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের কন্যা। এরা প্রত্যেকেই লয়েল পরিবারের মেয়ে বা ভগিনী। কোনও কংগ্রেসী পরিবারের সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্কই নেই।

ঐ ইংরাজ তরুণ সাহেব তার ঐ অবিমিশ্রকারিতার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলেছিলেন যে, লন্ডনে পুলিস ট্রেনিং কলেজে ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান (sociology) পড়ানো হয়েছে। ও থেকে তিনি জেনেছিলেন যে এদেশের মেয়েরা খুব এ্যাকোমোটিভ, ডোসাইল, কোঅপারেটিভ ও শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু ওরা যে কিরূপ ভয়ংকরী হতে পারেন তা ওই কেতাবে লেখা থাকলে উনি ঐ কাজে ঠিক ঐ ভাবে এগুতেন না।

তবু ঐ সাহেবকে ঐ দিনই কলকাতার বাইরে বদলি করা হয়েছিল। টেলিগ্রাম পেয়ে আমাদের প্রবীন অভিজ্ঞ স্থায়ী ইংরাজ ডেপুটি সাহেব ছুটি বাতিল করে ফিরে এসেছিলেন। এই সব জেনে ও শুনে চীফ সেক্রেটারী তাঁর ডিসপ্লেজার জানিয়ে ছিলেন। সেই সাথে খোদ কমিশনার সাহেব দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিষয়ে পাবলিক প্রসিকিউটরের এই বিষয়ে একটি ওপিনিয়নও চাওয়া হয়েছিল। সরকারী উকিল তারক সাধু ওতে আমাদের স্ত্রীদের ঐ কাজ সমর্থন করে বলেছিলেন যে, একটা নেবুলাস অসমর্থিত অভিযোগে ঐ রূপ বিনা ওয়ারেন্টে তল্লাসীর চেষ্টা করা ঐ ডেপুটির পক্ষে মূঢ়তা ও বে-আইনী। এক্ষেত্রে ঐ হাউজ ওয়াইফেদের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। পরন্তু যখন থানাতে তখন কোনও কগ-মামলা কেউ রেকর্ড করায় নি।

এই খানেই কিন্তু ঐ ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। কয় দিন পর আমাদের কয়জনের কমিশনার সাহেবের দরবারে ডাক পড়ল। আমরা সেখানে গেলে উনি আমাকে বললেন। এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা। এতে আমিও দুঃখিত। তোমাকে আমরা স্থায়ীভাবে একটা থানার চার্জ দেবো ভাবছিলাম। কিন্তু তোমরা নিজেদের স্ত্রীদেরকেই কন্ট্রোল করতে পারো না। তাহলে অতো বড় থানা তুমি কি করে কণ্ট্রোল করবে?

যাক। এইসব যেন কোনক্রমে বাইরে বের না হয়। কোনও প্রেসে না যায়। তোমাদের স্ত্রীদেরকে ওই জয়েণ্ট পিটিসন উইথড্র করতে বলবে।

এতে আমি চুপ করে ও'র এইসব কথা শুনছিলাম। ও'র ওই অনুরোধে মহীসীন তাঁকে বললেন। 'স্যার। ওটা আপনি ফাইল করে দিন'। এর এই কথাতে কমিশনার বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে তাকে বললেন—'সাট্ আপ।'

এর পর কমিশনার সাহেব ভ্রু কুঁচকে আমামে বললেন। ওহে। একথা কি সত্যি যে তোমাদের ওয়াইফরা খদ্দরের শাড়ী পরে থাকেন। ওটা ব্যবহার করা বে-আইনি নয়। তবে ওটা এখন, যখন, কংগ্রেসের একটা প্রতীক, তখন ওগুলো না ব্যবহার করাই ভালো। ওয়েল। দেন, গুড ডে। মাই বয়েজ। এবার হতে মন দিয়ে কাজ কর্ম্ম করবে।

ওখান হতে অক্ষত শরীরে থানাতে ফিরে কোয়াটারে উঠে দেখলাম যে, আমার স্ত্রীর পরনে খদ্দরের শাড়ী। আশ্চর্য্য এই যে, এ খবর ওনারাও ঠিক পেয়ে যান। উপরন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, জানলাতে খাদির পর্দ্দা টাঙানো। আমি ওই শাড়ী বাতিল করতে ও ওই পর্দ্দা দিয়ে ঘর মোছা লেতা করতে বলাতে উনি খেঁচিয়ে উঠে বলে ছিলেন, 'ও'রা যদি আমাদের উপর হুকুম চালাতে চান, তাহলে আমরা তোমাদের পোশাকের ও হাউস এলাউন্সের সঙ্গে আমাদের জন্য শাড়ী এলাউন্স চাইব। এবার ও'রা হয়তো বলে বসবেন যে, শাড়ী ত্যাগের মত বউ ত্যাগ করো, তাহলে।

হোম-রুল যে কি সাঘাতিক তা এই দিন আমি বুঝে ছিলাম। মেয়েদের তাদের অধিকার-বোধ জাগানও ভীষন ক্ষতিকর। এটাও এই সময় আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ও'দের ক্ষমতার বিষয়ে ও'দেরকে সচেতন করার কার্য্য এখন আমাদের পক্ষে একটা বুমেরাঙ। চাকুরী যাবার বিষয় বললে উনি বলেছিলেন। 'ঠিক আছে, আমরাই চাকুরী করে তাহলে তোমাদের খাওয়াব।

এঁকে আর না ঘেঁটিয়ে এবং আর কোনও এড়ো তর্ক না করে নীচের অফিসে নেমে দেখলাম, সত্যেন বাবুও টেলিগ্রাম পেয়ে তাঁর ছুটি ক্যানসেল করে থানাতে ফিরেছেন। উনি আমাকে দেখে একটু কিছু ভাবলেন ও তারপর আমাকে বললেন। "কি হে। কয় দিন ছুটি নিয়ে ছিলাম। এই কয় দিনও তোমরা থানাটা সামলাতে পারলে না। যাক। এখানে আমি ঐ সময় থাকলে আমাকেও তোমাদের সঙ্গে তাহলে জড়িয়ে পড়তে হতো।

দশম অধ্যায়

গান্ধী মহারাজ তখনও জেলেতে। অতএব সমস্ত আন্দোলন এখন বন্ধ। এটা যেন কিছুটা "ওয়ান ম্যান শো"—এর মতন। ব্রিটিশরা যেমন রাশ আলগা করতে জানে, তেমন আবার রাশ টেনে ধরতেও জানে। কংগ্রেসী আন্দোলন এখন আর নেই। তারা পুলিশ কর্মীদের আর একটুও আস্কারা দেয় না। জনগণের প্রতি দুর্ব্যাবহারে আর কর্তব্যের অবহেলাতে তারা পূর্বের মতন ফের দন্ডিত হতে থাকে। আইনের শাসন আবার ফিরে এসেছে।

এতকাল বলা হয়েছে যে, নরম্যাল ওয়ার্ক সাসপেন্ডেড। এখন নরম্যাল ওয়ার্ক এ্যাটেন্ড করতে একটু দেরী হলে আর ক্ষমা নেই। কিন্তু বে-আইনী কাজ এবং মারকুটে স্বভাব, যা তারা কংগ্রেসী আন্দোলন দমনে অর্জন করছিল, তা তাদের ত্যাগ করানোতে বহুজনকে ডিসমিস করতে হয়েছিল। এখন আবার আমাদের মতন অফিসারদের আদর বেড়ে গিয়েছে।

পার্শ্ববর্তী সুখিয়া স্ট্রীট থানার ইনচার্জবাবু মমতাজ সাহেব ছুটি নিয়েছেন। হঠাৎ ডেপুটি সাহেব আমাকে ওর স্থলে থানা ইনচার্জ করলেন। এতে এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার সাহেব আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন। 'স্যার। হি ইস্ টু ইয়ং ফর ইট। কিন্তু ডেপুটি সাহেব তাঁর সঙ্গে একমত না হয়ে বলেছিলেন। 'হু ইজ্ হিই? আই অ্যাস ইনচার্জ অফ্ অল মাই স্টেশন। লেট হিম গো দেয়ার।' তাঁর মতে কাউকে দায়িত্ব দিলেই সে দায়িত্বশীল হয়ে থাকে। একবার হুকুম দিলে ওঁরা তা বদলাবে না।

মাত্র কয়েকমাসের চাকুরিতে আমি একটি থানায়-ইনচার্জ হলাম। তখন আমি কলকাতার সর্বকনিষ্ঠ থানা ইনচার্য।

জোড়াসাঁকো থানার কোয়ার্টার্স হতে আমি সুখিয়া স্ট্রিট থানাতে যাতায়াত করেছিলাম। সকালে থানার কাজেতে ব্যস্ত—হঠাৎ ডেপুটি সাহেবের বাড়ী থেকে একটা টেলিফোন এলো। ডেপুটিসাহেবের এক আর্দালী ফোনে আমাকে বললো—কেঁও আপ সাহেবকো মুর্গী আভিতক নেহী ভেজা? তার এই ধৃষ্টতাতে আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বললাম, তুম কোন উল্লু হ্যায়, মুর্গী কেঁও ভেজেগে।

কলকাতা পুলিসে আর্দালীরা একটি পৃথক শ্রেণীর জীব। কনস্টেবলদের মধ্যে থেকে বাছাই করে কয়েকজনকে বা একজনকে এই আর্দালী করা হতো। একমাত্র ডেপুটি সাহেবের ও তার অ্যাসিসটেন্ট সাহেবের এই আর্দালী রাখার আইনী অধিকার থেকেছে। তবে, থানার বড়বাবুরা'ও বে-আইনীভাবে ম্যানেজ করে তাঁদের নিজস্ব আর্দালী রাখতেন।

এই আর্দালীদের পরোক্ষ ক্ষমতা অসীম। এরা সাহেবদের মন যুগিয়ে চলে। উপরন্তু তাদের অন্তপুরেও এদের অবাধ যাতায়াত। সাহেবদের গৃহিনীদেরও এরা ফাই ফরমাজ খাটে। সেই সময়ে তাদের মাধ্যমে তাদের স্বামীদেরও তারা আয়ত্তে রাখে।

এরা প্রয়োজনে ওঁদের অধীন অফিসার ও সিপাহী জমাদারদের বিরুদ্ধে চুকলী করেও থাকে। সাহেবরা এদের মাধ্যমে অফিসারদের বহু গোপন খবর সংগ্রহ করেন। এ জন্য থানার সিপাহী জমাদাররা এদেরকে সন্তুষ্ট করতে তাদের বে-আইনী আমদানীর হিস্যা দিতে বাধ্য হয়ে থাকে। অফিসাররা এদের মুখ হতে সাহেবদের ঐ দিনের মেজাজ সম্বন্ধে বুঝে শুনে তাদের কর্তব্য ঠিক করেন।

এহেন এক খোদ ডেপুটিসাহেবের আর্দালীকে আমি তোয়াজ না করে ধমকেছি। সে সাহেবকে নিশ্চয়ই কিছু বলে থাকবে। কিন্তু আমার সুনাম থাকাতে সে নিশ্চয়ই খুব বেশী কিছু তাঁকে বলেনি।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই দেখি ঐ ইংরেজ ডেপুটিসাহেব এই থানাতে সারপ্রাইজ ভিজিট দিতে এলেন। এখানে এসে উনি মমতাজ সাহেবের বদলে আমাকে দেখে অবাক হলেন ও তারপর বললেন—আই হ্যাভ ফরগটন, তুমি এখানে এসেছো। গুড। মমতাজ ছুটিতে, দেখ আমার কিচেনের জন্যে মমতাজ কোথা থেকে মুর্গী পাঠাতো, তুমি একটু খোঁজ খবর করে এর একটু ব্যবস্থা করে দিও।

সাহেব এবার গার্ডরুমে ঢুকলেন। কিন্তু কোথাও কোন নোংরা নেই, আমি যথারীতি বললাম—গার্ড। এ্যাটেনশন। সিপাহীরা তাদের চারপাইয়া হতে উঠে দাঁড়িয়ে যুক্ত পদে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। চমৎকার ডিসিপ্লীন দেখে সাহেব মহাখুশী।

সাহেব চলে গেলে আমি থানার হাবিলদারকে ডেকে বললাম—দেখ, বাজারসে একঠো মুর্গী মুলকে সাহেবকে ভেজো। আউর উনকো আর্দালীসে দাম-উম মাঙ লেও।

এতে হাবিলদার একটু আশ্চর্য হয়ে আমাকে বললো, 'হুজুর। আপ কি লেড়কা হ্যায়? উনে দাম দেবে তো উনকো আর্দালী খুদ মুর্গী মুল লেতা। দাম-উম আপকোই দেনে হোগী। নেই তো হুকুম দিজিয়ে হামে ইনকো বন্দোবস্ত করে।

কিন্তু এইরূপ হুকুম আমি তাকে দিলে সে পরদিন জুয়া টুয়া চালিয়ে বা চোর গুন্ডাদের মদত দিয়ে ওর দশগুণ মূল্য উশুল করে নেবেই। আমি একজন নিরামিষী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আমার নাম হবে 'খানেওয়ালা'। খানদানী আদমী-রূপে বদনামের ভাগী হতে আমি রাজী হলাম না। দুপুর বেলায় আমার পূর্বের থানার কোয়ার্টার্সে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য গেলাম। সেই সুযোগে ঐ থানার ইনচার্য সত্যেনবাবুর পরামর্শ নিলাম। এই বিপদ হতে উদ্ধার পাবার জন্য উনি আমাকে একটি ভাল পরামর্শই দিয়েছিলেন। বুঝলাম যে উনি অন্য থানাগুলির বিষয়েও বহু গোপন খবর রেখে থাকেন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সুখিয়া স্ট্রীট থানাতে এসে দেখলাম যে, থানা এলাকাতে একটি তারের জাল দেওয়া ঘেরা খোঁয়াড়। তার মধ্যে গোটা কুড়ি লেগহর্ন, রোড আইল্যান্ড

মুর্গী। ঐ কালে ঐসব দুষ্প্রাপ্য মুর্গী ইতালি হতে আসতো। এক একটি মুর্গীর দাম ছিল পঁচাত্তর টাকা।

প্রতিটি থানাতে গ্রুপিং অর্থাৎ দলাদলি থেকেছে। এদের মধ্যে একদল থাকে ইনচার্জ বাবুদের পেয়ারের। থানার এলাকাতে নোংরা জমতে দিলে হিস্যার ব্যাপারে রেষারেষি হবেই। আমি ওদের বিরোধী গোষ্ঠীর একজনকে ডেকে বললাম, এই দেখ ভাই। হুঁহাসে একঠো মুর্গী পাকড়ো, আউর উঠো ডেপুটি সাহেবকো ভেজো।

লোকটি আনন্দের সঙ্গে একবার মুচকী হাসলো, তারপর হুকুম তামিল করতে ছুটলো। পরদিন ওই একইরূপে আর একটি মুর্গী তুলে সে আমাকে বললো—এহী ঠিক হ্যায় সাব। আপতো খাতা-পিতা নেই। তব-আপ ইসমে কাহে গিরে।

মমতাজ সাহেব তখন লাহোরে। কিন্তু তাঁর বিবি থানার কোয়াটার্সেই ছিলেন। ভদ্রমহিলা পরের দিন তাঁর লোক নিয়ে মুর্গীর খোঁয়াড়ে তালাচাবি দেওয়ালেন। এতে আমি ফের আমার লোককে হুকুম দিলাম, ঠিক হ্যায়। তুম ভিতরমে কুঁদো, আউর একঠো পাকড়ো। ফের মুর্গীর ক্যাঁ-ক্যাঁ আওয়াজ। বেগম সাহেবা বোরখা খুলে জানলাতে মুখ বার করলেন এবং সব কিছু দেখলেন। পরে উনি সেই রাত্রেই মমতাজ সাহেবকে লাহোরে টেলিগ্রাম করলেন। ওদিকে—ওই দিনও সাহেবের কিচেনে আরও একটি মুর্গী পাচার করা হয়েছে। পরদিনও রিপোর্ট রুমে ডেপুটিসাহেব যথারীতি আমাকে ভালো ষ্টাফ পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

এরপর আরও তিনটি মুর্গী যথারীতি জবাই হয়েছিল। কিন্তু চতুর্থদিনে বিকেলে ওই থানার ইনচার্জবাবু থানাতে এসে আমার উপর মহাখাপ্যা। তাঁর ঐ একটিই অভিযোগ। এ আপ ক্যা কিয়া। ঘোষালবাবু? ইনে মুর্গী মেকো লেড়কাকা মাফিক। ইনে আপ জবাই কর দিয়া। ও দিকে, থানার প্রাঙ্গনে পোলট্রি খোলা বে-আইনী। উপরন্তু খোদ বড়কর্তার কিচেন এতে সংশ্লিষ্ট। ভদ্রলোক রেগে উঠে জেনারেল ডাইরি টেনে তাতে ওঁর 'লিভ ক্যানসেল করে জয়েন করার বারতা লিখলেন ও তারপর মুখ বেঁকিয়ে আমাকে বললেন—আপ যাইয়ে আভি। এতে আমি তাঁকে গোঁসা করতে বারণ করে কৈফিয়তের সুরে বলেছিলাম। 'আপ থানাকো চার্জে মেজো দিয়া, লেকিন মুর্গীকো চার্জ মে কেঁও নেহী দিয়া। এরপর আর কোন কলহ না করে আমি নিজেরে পূর্বের থানার দিকে পা বাড়ালাম।

কিন্তু পরের দিন সত্যেনবাবুর সঙ্গে ডেপুটি সাহেবের রিপোর্টে আমিও গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি ও শুনি যে ডেপুটি সাহেব মমতাজ আলিকে ধমকাচ্ছেন এবং বলছেন। "ঘোষাল একজন অনেষ্ট অফিসার। তবু সে কেমন নাইস ষ্টাফ পাঠাইয়াছেন। ইউ আর এ ডিজঅনেষ্ট ম্যান। কিন্তু তুমি কি রকম ব্যাড ও স্মল ষ্টাফ পাঠিয়েছ। আই উইল সোল্ড ইউ টু এ ডার্টি কর্ণার অফ্ ক্যালকাটা।

আমরা বুঝলাম যে বড় মুর্গীতে এই কয়দিনে অভ্যস্ত হয়ে ওনার আর ছোট মুর্গী পছন্দ নয়। এর পরই দেখলাম যে উনি ওই মুর্গীর দাম বাবদ ত্রিশ টাকা মমতাজের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। পরে ফের উনি পকেটে হাত পুরে একটা একশ টাকার নোট বার

করে ওটা মমতাজকে দিয়ে বললেন, "গত দেড় মাসের মুর্গীর বাবদ টাকা তুমি রেখে বাকী টাকা ও একটা বিল আমাকে পাঠাবে। কিন্তু ওই মুর্গীর দোকানদার যেন ঠিক ঠিক ভাবে টাকাটা পায়।

এর পর রিপোর্টরুম হতে বেরিয়ে মমতাজ সাহেব কেঁউ কেঁউ করে আমাকে বলেছিলেন, "ঘোষাল বাবু। আপ মেকো সব্বোনাশ কর দিয়া ভাই। হররোজ সত্তর রুপেয়া কো চীজ মে কেইসন দে' সেকথা ?

পরদিন ডেপুটিসাহেব আমাকে 'মুর্কীত' ডিউটি দিলেন। এই ডিউটির অর্থ এই যে, এক থানার অফিসর অন্য থানার এলাকাতে গিয়ে সিপাহীদের উৎকোচ গ্রহণ ধরবে এবং তা রুকবে। সেই সময়ে ওখানকার দুর্নীতিরও খবর তাঁকে জানাবে।

পরদিন আমি ছদ্মবেশে মমতাজ সাহেবের এলাকাতেই ফের গেলাম। হঠাৎ দেখি একজন সিপাহী মোড়েতে ডিউটি দেবার সময় এক গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে তার গাড়ী গরুশুদ্ধ রুখে বলছে—এ গাড়োয়ান। এক পাশমে সাদা বয়াল, আউর এক পাশমে কাল বয়াল। এ' না চলি। গাড়োয়ান বিপদ বুঝে একটা আধুলি বার করে তার হাতে দিল। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে, প্রস্থনোদ্যত গাড়ীটা থামিয়ে সে চার আনা পয়সা গাড়োয়ানকে ফেরত দিল। কারণ তার রেট চার আনা মাত্র। তার বেশী সে নেবে না। এরপর ঐ প্রাপ্য চার আনা সে তার পাগড়ীর মধ্যে রেখে দিল।

সে যুগে অফিসাররা তাদের ইউনিফর্মে পাঁচটাকার বেশী রাখবার অধিকার ছিল না। ওটার আইন ছিল বাধা। কিন্তু সিপাহীদের উর্দীতে এক পয়সা জমা রাখাও বে-আইনী। সেইজন্য তারা পানওয়ালাদের কাছে পয়সা জমা রাখতো। এই যুগে ওই লাল পাগড়ী বাতিল। সে যুগে পাগড়ীর উপর দাঙ্গাকালে কারুর লাঠি পড়লে তার মাথা বাঁচত। আহত হলে ক্ষত তাড়াতাড়ি ঐ পগড়ীর সাহায্যে ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হতো। তা ছাড়াও পাগড়ীর সাহায্যে দড়ির মতন করে বহু চোর গুন্ডাদের বেঁধে থানায় আনা হতো। আবার প্রয়োজনে তার খাঁজগুলি কিছু রাখার জন্য পকেটেরও কাজ করেছে। তদোপরি পাগড়ীর লাল রঙ বদ লোকেদের মনে একটা ভীতিরও সঞ্চার করেছে।

আমি এই সিপাহীটিকে পাকড়াও করে থানায় আনলাম এবং একটা রিপোর্ট ওর বিরুদ্ধে লেখালাম। পরদিন রিপোর্ট রুমে এনে সাহেবের হুকমে তার কোমরের বেল্ট কেড়ে নেওয়া হলো। এই ঘটনাতে মমতাজ সাহেবের একটা নূতন বিপদ বাড়লো। এবার তাঁর অপরাধ স্ল্যাক্ সুপারভিসন্।

এইখানে দেখা যেত যে, যে যতোই তোষামোদ করুক না কেন বা যে যতই প্রিয় ও উপকারী হোক না কেন, ইংরেজ সাহেবরা কখনও কাউকে কম বেশী ফেবার করে নি। তাঁরা উপকারী বন্ধুদেরকেও দোষেতে একইরূপ কঠোর দন্ড দিয়েছে। বকশিশ দিতে বা প্রমোশন দেওয়াতে তারা চুলচেরা বিচার করেছে। মুর্গী দেওয়া তাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর থেকেছে। প্রায়ই আমি লক্ষ্য করতাম যে—একজন মেথরের বালক থানায় অভিযোগ জানাতে এসে একজন লাল মুখ সার্জেন্ট এর কাছে তার বক্তব্য রেখেছে।

কিন্তু আমরা তার ঊর্ধতন অফিসার হলেও আমাদের কাছে আসেনি। কারন ওই লালমুখের কাছে সে উচিত বিচার পাওয়ার বিশ্বাস তার থেকেছে। আমি এক ইংরেজ পুলিশ অফিসরের বিষয় শুনেছিলাম তিনি একজন দেশীয় অফিসারের নিকট হতে ঘোড়ার রেশেতে ট্রিপ সংগ্রহ করতেন। কিন্তু প্রতি বৎসর তার গোপন নথীতে (C. C' Rool) লিখতেন, ব্লাডি গ্যাম্বলার। এর ফলে ভদ্রলোক জীবনে কোনও প্রমোশন পান নি বাল্যকালে নিজের গ্রামেতেও দেখতাম এবং শুনতাম, পুরুষানুক্রমে শিক্ষানত বালকেরা কলহকালে একে অন্যকে বলছে। 'আমরা ইংরেজ রাজত্বে বা কোম্পানীর রাজত্বে বাস করি, তাই কাউকে ভয় করি না। এটা মগেরমুল্লুক নয়। এটা কোম্পানীর রাজত্ব। ইংরেজ হাকিমরা একজন ইংরাজ অপরাধীকে কম দন্ড দিলেও তাকে কখনও বেকসুর খালাস দেন নি। কিন্তু দেশীয়জনদের মধ্যে তারা চুলচেরা বিচার করছেন।

একজন য়ুরোপীয় সার্জেন্ট প্রায়ই কিছু কিছু ঘুষ নিতেন। তাঁর রেট ছিল দশ টাকা। কিন্তু কেউ তাকে পাঁচ টাকা দিলে উনি অপমানিত বোধ করতেন এবং তার নামে উৎকোচ অফার করার জন্য মামলা আনতেন।

একদিন একটা টোপ ফেলে এ ব্যাপারে তাকে আমি হাতে নাতে ধরলাম। কিন্তু ওই মামলা প্রমাণ করা যায়নি। এই সুযোগে সে আমার অবাধ্য হয়ে বারে বারে আমার আদেশ অমান্য করতে লাগল।

আমি এর বিরুদ্ধে সাক্ষী সাবুদ সংগ্রহ করে তার বিরুদ্ধে ইংরেজ ডেপুটিসাহেবের নিকট অভিযোগ এনেছিলেম। এই মামলা প্রমাণিত হওয়াতে ঐ ইংরেজ ডেপুটি সাহেব ডান হাতে কলম তুলে তাকে ডিসমিস করলেন, কিন্তু তখুনি বাম হাতে ফোন তুলে রেল কোম্পানীর এক সাহেবকে বলে তাকে আরও একটু বেশী মাহিনার চাকরী করে দিয়ে একটা স্লিপ লিখে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, পুলিসের চাকরীতে সে উপযুক্ত না হলেও সে রেল কোম্পানীর চাকরীতে উপযুক্ত হবে।

এটা উনি না করলে ওই বিদেশী ভদ্রলোকটি ইন্ডিয়াতে স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যেতো। ওঁকে এইভাবে 'স্ব-জাতিত্ব বোধ ও কর্তব্যবোধ' এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে দেখে সেদিন আমি ও আমার সহকর্মীরা মুগ্ধ হয়েছিলাম।

শীঘ্রই আমি বুঝলাম যে আমার সংযত হবার সময় এসেছে। এখানে নিজে সৎ থাকা গেলেও অন্যকে সৎ করা একটা দুরূহ কাজ। এতে এক শ্রেণীর জন সাধারণ, একশ্রেণীর সহকর্মী বিরূপ হবেই। তাই সত্যেনবাবু, আমি এবং আমাদের মতন সৎ অফিসরদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়েছে। ইতিমধ্যে যথেষ্ট শত্রুবৃদ্ধি হয়েছে। এটা বুঝতে আমার একটুও দেরী হয় নি।

গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মীকে এক দোকান তল্লাসীতে সাহায্য করতে আমি ও আমার সহকর্মী অনিল গিয়েছিলাম। ওই মামলা প্রমাণ করার মত যথেষ্ট প্রামাণ্য দ্রব্য ওখানে পাওয়া গিয়েছিল। আমরা সার্চ রিপোর্ট লিখছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে ঐ অফিসর তার পকেট থেকে একটা সিল মোহর নিষ্প্রয়োজনে ওই দ্রব্যগুলির

মধ্যে ফেললেন। আমরা লেখালেখি বন্ধ করে এতে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠি। পরে ঐস্থান ত্যাগ করে থানায় ফিরে আসি।

কিন্তু পরে প্রধান হাকিম সুশীল সিংহের আদালতে এই মামলার বিচার হয়েছিল। হাকিম বাহাদুর ওই অফিসারটিকে বিশ্বাস করে আমাদেরকে ওই ব্যাপারে একটা দারুন স্ট্রিকফার দিয়ে তা পুলিশ কমিশনারের কাছে পাঠালেন। এতে আমাদের দু'জনেরই বিরুদ্ধে প্রোসিডিংস ড্র করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আসামীরা হাইকোর্ট আপীল করেছিল। এতে পুনর্বিচার হয় এবং তাতে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ পেলে আমরা হলাম মুক্ত ও প্রশংসিত। কিন্তু ওই অফিসারটি চাকরী হারিয়েছিলেন। এই ঘটনাতে আমরা বুঝেছিলাম যে, এই বিষয়ে এগুতে গেলে জনপ্রিয় হয়ে সৎ পাবলিকদের সাহায্য নিতে হবে। এই পথেতে এর পর হতে আমরা এগুতে থাকি। জন সাধারণ আমাদের সাহায্যের জন্য এগিরে এলে আমরা নির্ভয়ে এলাকাগুলি থেকে দুর্নীতি দূর করতে আরম্ভ করি।

এই সময় হতে আমি এলাকার বাড়ী বাড়ী ঘুরে প্রতিজনের নিকট হতে তাদের অভাব অভিযোগ শুনতাম। সেই সাথে ওইগুলি বন্ধ করতেও তাদের সক্রিয় সাহায্যও চাইতাম। এরপর হতে পাড়ায় পাড়ায় জনগণকে মুখর করে তুলে প্রতিটি পুলিসি অভিযোগে তাদের বহুজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম। আমরা একটুকুও বিপদে পড়লে সমগ্র জনতা আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এদেশের সাক্ষী নির্ভর বিচার প্রথাতে মিথ্যা সাক্ষীতে কাউকে ফাঁসানো সহজ। ঐসব মিথ্যাবাদীরা এতো লোকের সত্য সাক্ষ্যে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়ার ভয়ে তখন মহাভীত। ততদিনে আমরা বুঝেছিলাম যে, মিথ্যাকে মিথ্যা দিয়েই প্রতিরোধ করা সম্ভব। সত্য সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর। উপরন্তু তারা জেরার চোটে সহজে ভাঙ্গে। কিন্তু রিহার্সেলপ্রাপ্ত মিথ্যা সাক্ষীদেরকে ভাঙানো দুঃসাধ্য। সেক্ষেত্রে মানুষকে এই দলবাজির যুগে বিনাদোষে জেলে যেতে হয়।

এটি ছিল আমাদের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। এখানে আত্মরক্ষার প্রশ্নটাই সর্বাগ্রে থেকেছে। এই জন্য মিথ্যা কথা বলবে না। এইরূপ কোন লোককেই আমরা বন্ধু করতাম না। কারণ প্রয়োজনে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে উপকারতো করেনই না, উপরন্তু সত্য কথা বলে আমাদের বিপদের কারণ হবেন।

একদিন ফের যথারীতি রাত্রে রামবাগান বেশ্যাপল্লীতে গিয়েছিলাম। খুকুরাণী ওখান থেকে চলে যাবার পর বহুদিন ওখানে যাইনি। সেখানে খুকুদের তালাবন্ধ বাড়ীটার সামনে থমকে দাঁড়ালাম। হঠাৎ শুনলাম—একটা অদ্ভুদ আকাশবানীর মত একটা বানী—পাখী পাইলে গ্যাছে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তার কথককে খুঁজে পেলাম না। একজন প্রৌঢ়া মহিলা "বাড়ীউলী" সামনে এসে আমাকে বলেছিল। বাবু, বহুদিন এখানে আর আসেন না। আপনার হুদোতে আমরা ভালই থেকেছি। বাবু, আমার মেয়ে গোপালী আপনাকে প্রমাণ করতে চায়। সে খুকুর চাইতে ঢের বেশী সুন্দরী।' মহিলাটি ধমক খেয়ে ছুটে তার বাড়ীতে ঢুকে গেলে আমি ফের খুকুর বাড়ীর দিকে তাকালাম। কয়েকজন তরুণ ওর বাড়ীর বারন্দায় নীচে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছিল। খুকুর ঠিকানার জন্য তারা বৃথাই চেষ্টা করছিল। এদের মধ্যেকার একজন তরুণ ভক্ত ভবিষ্যতে মন্ত্রী হয়েছিলেন। ভদ্রলোক মন্ত্রী হবার পর আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিতেন।

এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে আমারও আর ভাল লাগছিল না। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সেণ্ট্রাল এভিনিউতে এক ল্যাম্পপোস্টের পাশে এসে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে একজন টহলদার সিপাই আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। আমি তার পকেট বুকে এবার সময় লিখে দস্তখত দেব। তাই সময় দেখার জন্য হাত ঘড়িটা মুখের কাছে উঁচিয়ে এনেছি। শীতের রাত, আমার দীর্ঘ দেহটা পুরু বনাতের গ্রেট কোট অর্থাৎ ওভার কোট দিয়ে ঢাকা।

হঠাৎ বামহাতে জলের ফোঁটা পড়লো। শীতকাল, বৃষ্টি হবে না, ওপরে তাকিয়ে দেখলাম যে কোনও বাড়ী থেকে কেউ জল ফেলেছে কিনা? না! বন্ধ জানালা, বাড়ীগুলো বড় বড় দৈত্যের মতন নীরব, নিথর। আবার হাতে জলের ফোঁটা লাগামাত্র আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, এক মাতাল ভদ্রলোক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে মূত্র ত্যাগ করছে ও তাতে আমার ওভার কোটের পেছনটা জবজবে ভিজে গেছে।

এবার আমি ক্ষেপে উঠে তাকে বললাম—এ্যাঁ. উজবুক কাহাকো, এ আপনি কি করছেন মশাই। তাতে সেই মাতাল ভদ্রলোক সবিস্ময়ে বলেছিলেন, এ্যাঁ, তুমি বাবা মানুষ, আমি মনে করেছিলাম একটা গ্যাসপোস্ট।

ভদ্রলোক বড়লোকের বাড়ীর ছেলে। হাতে দামী হীরার আঙ্টি ও কব্জিতে সোনার ঘড়ি। শুনলাম, নিচেই লোকটি থাকেন। ওর ঘড়ি ছিনতাই হলে থানাতে আর একটা মামলা অযথা বাড়বে। অগত্যা বাধ্য হয়ে সেই সিপাইটির সাহায্যে তাকে ধরে তার বাড়ী নিয়ে গেলাম। দুয়ারে ধাক্কা দিতেই প্রথমে তার স্ত্রীই বেরিয়ে এলেন। অতো রাত্রেও তাঁর সাধ্বী স্ত্রী ওঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ভদ্রমহিলা সত্যই সুন্দরী। তাঁর ভয় পাছে ঘটনাটা লোক জানাজানি হয়ে যায়। তাই চুপি চুপি উনি আমাদের ধন্যবাদ জানালেন। তারপর পরম যত্নে স্বামীকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন।

এই এলাকাতে তিনশ পুরোনো পাপী, সাতশ বেশ্যা, বিয়াল্লিশটি মাতাল ছিল। কিন্তু অভিজাত ধনী মাতালরা এখানকার একটি সমস্যা থেকেছে।

আমি বহুবার এমন বহু মাতাল স্বামীদের তাদের বাড়ীতে পোঁছিয়ে দিয়ে এসেছি। শুধু তাদের স্ত্রীদের নিকট হতে ধন্যবাদ পাবার জন্য। আশ্চর্য এই যে এইসব মাতালদের স্ত্রীরা সুন্দরী, সাধ্বী ও ভক্তিমতি হয়ে থাকেন। ধরিত্রীর মতন তারা সহনশীল ও সেবাপরায়ণ। এর ব্যতিক্রম একটি ক্ষেত্রেও আমি দেখিনি। শুনেছি তাঁরা এইসব স্বামীদের নিয়ে খুব সুখী। মাতালের স্ত্রী-ভাগ্য সত্যই ঈর্ষার কারণ হয়ে থাকে।

রাত বারোটার সময় ক্লান্তদেহে থানায় ফিরে এলাম। মন-মেজাজ একটুও ভাল নেই। উপরে কোয়ার্টারে যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না। রাউণ্ড রিপোর্ট স্টেশন ডাইরীতে লেখা শেষ হয়েছে। তবু তখনও চেয়ারে বসে ঘুমের আমেজে ঢুলছিলাম।

হঠাৎ যুগ্মপদ হবার একটা খটাস শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইলাম। একজন টহলদারী সিপাহী স্যালুট করে সামনে দাঁড়াল। তার সঙ্গে গামছা দিয়ে হাতে হাত বাঁধা দু'জন ভদ্রলোক। ওদের সে পুরাণো চোর সন্দেহে ধরে এনেছে।

থানাতে তখন আমিই একমাত্র অফিসার উপস্থিত। অগত্যা সিপাহীর বয়ান লিখে মামলাটি আমাকেই তদন্ত কয়তে হবে।

'হুজুর-বাহাদুর', সিপাহিজী বললো, 'রাত বার সে দো বাজে তক মেকো বিট ডিউটি থে, দো নম্বর বিটকো মোড়মে। আন্দাজ এক বাজে হাম দেখাকি, এহী দো পুরাণো চোর উত্তর সে দক্ষিণ তরফ যাতে থি। দেখা কি, এই এক নম্বর আসামী তুরণ ফুটপর গিরগিয়া, যাঁহা ভিখারী লোক শুয়ে থি, উ লোককো বীচমে। আউর এহী দো নম্বর আসামী ক্যা কিয়া কি, এহী গামছা সে মুখ ছিপাকে বালি কো অন্দর ঘুস গিয়া। হাম তুরণ দোনোকে পাকাড়কে ওহী গামছাসে বাঁধ লিখা। নেহী তো আজ এলাকামে একঠো বড়ী কাম উম হো যাতে থি।

আমার কিন্তু সেই ভদ্রলোক দু'জনকে মানী-গুনি মনে হলো। তাই সন্দিগ্ধ হয়ে আমি সিপাহীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুকো কেইসেন মালুম পড়া ইনে লোক পুরাণো চোর হ্যায়! এর উত্তরে সিপাহীজী জানালো, 'হুজুর, মে ঝুটা নেহী বোলেগা। দো-নম্বর আসামীকো মে নেহী চিনতা। লেকিন এহী এক নম্বর আসামী মেকো হাতেসে জেল খাটা হি ছয় মাহিনা, বেলিয়াঘাটাসে অর্থাৎ বেলেঘাটা থানায়!

এর পর আমি এদের পুরানো চোরত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি। তাই সিপাহীজীকে বললাম—তব তো ঠিক হ্যায়, ইনাম তুকো মিলেগা। আভি ইসকো লাগাও এক মোক্কা, আউর উনকো লাগাও দো মোক্কা।

এইবার প্রমাদ গুণে ও'রা মেজাজ নরম করে বললেন যে, ও'দের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর অন্যজন হলেন একজন মুন্সেফ।

এতে আমি ঘাবড়ালেও ওই সিপাহীজীটি একটুও না ঘাবড়ে বললো—হুজুর, এহী দোনোই মাতায়োলা। দেখিয়ে না উনেকে মু সে বঁুদ নিকালতা। এহী আদমীকো হাসপাতাল ভেজনে চাহী।

প্রকৃত ঘটনাটি ছিল এইরূপ—এরা দুজনেই একই স্টেশনে পোস্টেড ছিলেন। দু'জনে একত্রে ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে যাইতে ছিলেন। ট্রেন লেট করাতে রাত্রে কোন ট্যাক্সি পান নি। তাই একটা রিক্সা করে যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য এক "কমন" বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রিটা কাটানো। এই সময় সিপাহী তাদের রিক্সা চালককে আটকালে রিক্সা চালক আট আনা পয়সা সিপাহীর হাতে গুঁজে দিচ্ছিল। কারণ, সে ছিল একজন বে-লাইসেন্সী রিক্সা চালক। এতে ওই হাকিমদ্বয় প্রতিবাদ করাতে ও সিপাহীকে তদোপরি গালমন্দ করাতে তাঁদের এই বিপাক।

সিপাহীজী ওই গালমন্দ শুনে রেগে উঠে বলেছিল, তব তো তু লোক মজা দেখিলবা। ও'রা ওর পয়সা নেওয়াতে বাধা তো দিয়েই ছিলেন, উপরন্তু তাকে ত'রা গালাগালি দিয়ে তার বাপান্ত করেছিলেন।

মোক্কা খাওয়া থেকে অব্যাহতি পেতে ওঁরা তাঁদের পকেট থেকে কয়েকটি কাগজপত্র বার করে তা আমাকে দেখালে সকল সন্দেহের অবসান হলো। ট্রেন জার্নিতে তাদের জামা-কাপড় মলিন হওয়াতে এবং ঐ দিন তারা দাড়ি না কামানোতে এই যা কিছু ভুল বোঝাবুঝি।

এবার আমি ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাদেরকে চেয়ার অফার করে বলেছিলাম, বসুন! বসুন!! স্যার। আমরা সত্যই দুঃখিত এবং লজ্জিত। এরপর চিৎকার করে দুয়ায়ের পাহারাদারকে বললাম, এই কাঁহা হো। কুরসী লে আও, লসি্য লে আও, পাংখা খুল দেও।

কিন্তু মোক্কা হতে রক্ষা পাওয়া এবং এতো খাতির পাবার পর ওঁরা কৃতজ্ঞ না থেকে অন্য মূর্তি ধরলেন এবং বললেন যে, ওঁরা সমগ্র থানাটাকেই সাসপেণ্ড করাবেন। বিপাক বুঝে আমি পরামর্শ করবার জন্য উপরে সত্যেনবাবুর কাছে তার কোয়ার্টার্সে ছুটে উঠে গিয়ে কলিঙ্ বেল্ টিপলাম।

এই ইনচার্জবাবু সত্যেন মুখার্জীকে পুলিস মহলে অভিমন্যু বলা হতো। তাঁর পিতা রায় সাহেব বদ্যিনাথ মুখার্জী ছিলেন এই কলিকাতা পুলিসেরই প্রথম ব্যাচের একজন এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার। এই সত্যেন মুখার্জীর জন্ম থানার উপরেই এক কোয়ার্টারে। তাই অভিমন্যুর মাতৃগর্ভে থেকে যুদ্ধ শেখার মতন ইনিও মাতৃগর্ভে থেকে থানার কাজকর্ম শিখেছিলেন। এই জাত-পুলিস কর্মীটিকে ওঁর পিতৃ বন্ধুরা আড়ালে বলতেন, "বৈদ্যিনাথের এঁড়ে।"

সত্যেন বাবু সব শুনে আমাকে বললেন, কিন্তু ওঁরাই বা কেন ওঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী ট্যাক্সি-আদি যানবাহনে না নিয়ে রিক্সাতে উঠেছিলেন? ওদের বিরুদ্ধে ঐ বিষয়ে একটা স্পেশাল রিপোর্ট গভর্মেণ্টকে পাঠাবো। এখন, ওদের বিরুদ্ধে একটি সন্দেহের মামলা রুজু করে ব্যক্তিগত মুচলেখাতে ওদেরকে এখনই মুক্তি দাও। আর ওদের একটা বিবৃতি লিখে সিপাহীজীকে ডিফল্ট করে আগামীকাল তাকে ডেপুটির রিপোর্টে নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে ওদেরকেও আগামীকাল ডেপুটির রিপোর্টে যেতে বলে দাও। ওঁরা বুঝুন—থানা ওঁদের আদালতের এজলাস নয়।

পরের দিন সিপাহীজীকে ডেপুটি সাহেব দশ টাকা জরিমানা করে দশদিন স্পেশাল ড্রিল দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে আমাদের পাঠানো প্রতিবেদনে গভর্মেণ্ট হতেও ওদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে এই ঘটনার জন্য তাঁরা দু'জনেই ঘোরতর পুলিস বিরোধী হাকিম হয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ কেসের বিচারে ওঁরা ভাবতেন যে, পুলিসের ওই অভিযোগ নিশ্চয়ই মিথ্যা ও বানানো।

[পুলিসের বিরুদ্ধে এইরূপ ধারণা বরাবর তাঁদের মনে রাখা অত্যন্ত অন্যায় একথা পাঠকরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।]

এইবার উপরে উঠবার জন্যে পা বাড়িয়েছি। কিন্তু ফের আমাকে দাঁড়াতে হলো। এই রাতটাকে যেন ভুতে পেয়েছে। খুকুর মনে ব্যাথা দিয়ে তাকে তাড়ানোর এটি বোধহয় একটি অভিশাপ।

জোড়াসাঁকো মোড়েতে ডিউটিরত একজন বিট কনস্টেবল একটি ষোল বছরের কিশোরকে আমার সামনে আনলো। ছেলেটির একপায়ে নূতন ও আর একপায়ে পুরানো চটিজুতা। গায়ে একটা ফিনফিনে পাতলা দামী সিল্কের পাঞ্জাবী। ওর ছেঁড়া গেঞ্জিটা তার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে। তার হাতে একটা খাতা ও পেন্সিল। ওই খাতার পাতাতে চাঁদের একটা অপূর্ব পেন্সিল স্কেচ।

এই ছেলেটিকে আগে আমি ঠাকুর বাড়ীতে দেখেছিলাম। তাই তাকে আমি এবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি ঠাকুরবাড়ীর ছেলে না?' এতে সে উত্তর দিল—আজ্ঞে, অস্বীকার করতে পারলাম না।

তাকে থানায় ধরে আনার কারণ তাকে জিজ্ঞাসা করলে, সে জানায়—দেখুন, চাঁদ উঠেছিল, চাঁদের আলো আমার বুকে ও মুখে লুটিয়ে পড়েছিল। চাঁদ বললেঃ ওরে অমৃতের সন্তান—আয়—আয়। আমি তাতে বললাম—যাই—যাই। এরপর খাতা ও পেনসিল নিলাম। চাঁদ আর আমাতে এলাম জোড়াসাঁকোর মোড়ে। চাঁদ আমাকে দেখে আর আমি চাঁদকে দেখি। আমি চাঁদের রূপ খাতার পাতাতে ধরে নিই। এই সময় ঐ সিপাই এসে জিজ্ঞাসা করলো-যে, আমি কি করছি? আমি সত্য কথাই বললাম। সে বুঝতে চাইলো না, আমাকে ধরে থানায় নিয়ে এলো।

হ্যাঁ, বুঝলাম। এই বলে তাকে আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বললো, "আমার নাম 'দক্ষিণ হাওয়া।' এরপর তার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছিল আমি তো বলেইছি, আমার পিতা নেই, মাতা নেই, আমি অমৃতের সন্তান।

আমি এবার সিপাহীজীকে একে ধরে আনার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিল—হুজুর সাহেব, এ চোর গুন্ডা থোড়াই আছে। ইনে তো 'বড়ী ঘরকো" লেড়কা হৈ। লেকেন ইনকো শির বিলকুল বিগড়া। ইনকো ঘর পোঁছানে চাহী। আভি সব লোক ওনকো ঢুড়নে আয়েগা।

সিপাহীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এর যে শির বিগড়েছে তা সে বুঝলো কেমন করে?' 'এতে ওই' সিপাহীজী বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলো, কেয়া বোলে সাব। ইনে কোভি চাঁদকো বাত বোলত। কোভি বোলত তসবিরকো বাত। উসকো শির নেহী বিগড়া তো, কি মোরি শির বিগড়া।

এই ছেলেটি কিন্তু সেই হাকিমদ্বয়ের মতন খ্যাপা নেকড়ের মতন এজন্য পুলিস বিরোধী হয় নি। সে সিপাহীটিকে তার কর্তব্য করবার জন্যে কুড়ি টাকা বকশিশ দিতে চাইল। কিন্তু কর্তব্য-কার্য করার জন্য কোন জনগণের নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ বরখাস্তযোগ্য অপরাধ। তবে ঐ পুরস্কার পুলিস কমিশনারের মাধ্যমে গ্রহণ করা যায়। আমি টাকাটা গ্রহণ করে জেনারেল ডাইরীতে লিখে লালবাজারে ঐ টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

সেই ছেলেটির মাধ্যমে আমি ঠাকুরবাড়ীতে যাতায়াত করতে পেরেছিলাম। ওখানে চিত্রশিল্পী ও কথাশিল্পী বাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রতীন ঠাকুর ও শুভো ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। এঁরা ছাড়াও অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। তাঁদের

'ভবিষ্যৎ' নামে একটি সদ্যপ্রকাশিত আধুনিকতম প্রত্রিকা প্রকাশিত হতো। সেই পত্রিকাতে আমি কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছিলাম।

কবি জশীমুদ্দিন তখন ঠাকুর বাড়ীর বারবাড়ীতে একটি ঘরে ওঁদের কর্মচারীদের সঙ্গে থাকতেন; এঁদের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গেও ঘনিষ্টতা অর্জন করেছিলাম। উনি আমাকে পূর্ব-বাঙলায় প্রচলিত চোরদের বিরুদ্ধে বাড়ীবাঁধার কয়েকটি স্থানীয় সংস্কারজাত মন্ত্র বলে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে অপরাধ বিজ্ঞান সম্পর্কিত কিছু তথ্য থেকেছে। উপরন্তু তাঁর লেখা এক কপি 'নক্সাখাতার মাঠ' পুস্তকটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

কবি জসীমুদ্দিনের সঙ্গে কথা বার্তাতে বুঝেছিলাম যে তিনি ওঁর হিন্দু পূর্ব-পুরুষদের সম্বন্ধে বেশ সচেতন এবং সেই সঙ্গে উনি তাতে গর্বিত। তাঁর মতে-ভারতীয় মুশলীম ও ভারতীয় খৃষ্টানগণ বিদেশী মুশলীম ও বিদেশী খৃষ্টানদের কেহই নন। তাঁরা ভারতীয় হিন্দুদেরই একটি ভাতৃবংশ মাত্র। তাই তারা ধর্মে বিভিন্ন হলেও তারা সকলেই একটি জাতি। ভারতের হিন্দু মুশলীম ও খৃষ্টান নির্বিশেষে একই ভারতীয় সংস্কৃতির অধিকারী। ধর্ম একটি পরিবর্তনযোগ্য ব্যক্তিগত বা পরিবারগত আচার-বিচার মাত্র। তাঁর এই অভিমতটি আমার খুব ভাল লেগেছিল।

তবে তার দুঃখ এই যে বাঙালী মুশলীমরা হিন্দুদের ধর্মের প্রতিটি বিষয় জানলেও হিন্দুরা কিন্তু ইসলাম ধর্মের ভাল দিকগুলির কোন খবরই রাখে না। তাঁর মতে গ্রামাঞ্চলে বাঙ্গালী মুশলীমরাও হিন্দুধর্ম বুঝলেও ইসলাম বিষয়ে খু-উ-ব কম খবরই রেখেছে। এর জন্যে দায়ী নিরক্ষতা এবং তাদের অজ্ঞতা ও দারিদ্রতা।

উনি ধর্মীয় মতের আদান প্রদান দ্বারা একটি সার্বজনীন ধর্ম সৃষ্টির পক্ষপাতি ছিলেন।

[যে সময় উনি এইসব বলেছিলেন, সে সময় ওই উভয় সম্প্রদায়ের গ্রামীন মানুষ ধর্মকে সম্প্রদায়িক স্তরে নিয়ে যায় নি। ওটি তখনও তাদের নিকট ব্যক্তিগত ও পরিবারগত ব্যাপার ছিল। ওদের কাছে তখনও বৈষ্ণব শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ, জৈন্য ও শিখ ধর্মের মত ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম এক একটি ভারতীয় ব্যক্তিগত ধর্ম।]

কবি জসীমুদ্দীনের সঙ্গে আমার সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা হতো। কারণ ঐ সময়ে কলিকাতাতে কিছু উত্তর প্রদেশী ও বিহারী মুস্লীম নেতা এবং সেইসাথে দু একজন বাঙালী মুস্লীম নেতাও সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে বলেছিলেন যে, হিন্দুরা মুস্লীমদের দাবিয়ে রাখবার জন্যেই তারা দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ। এই বিষয়ে একদিন আলোচনাতে কবি জসীমুদ্দীন আমাকে বলেছিলেন, এটা ঐসব ব্যক্তির ভুল ধারণা এবং মিথ্যে ভাষণ। সাতশত বৎসর মুস্লীম অধিকার কালেতে হিন্দুদেরই "জিজিয়া কর" আদির চাপে দাবানো হয়েছিল। কিন্তু হিন্দুরা তা সত্বেও ভালো-ভাবেই টিকে রয়েছে। আর দেশীয় মুস্লীমরা তখনও যেমন দরিদ্র ছিল এখনও তেমনি ওরা পশ্চাৎপদ আছে।

বিদেশী মুস্লীম শাসকেরা তাদের সাম্রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করতে হিন্দুদের তোয়াজ করলেও দেশীয় মুস্লীমদের জন্য কিছু করেন নি। এর কারণ এই যে এখনকার মুশলীমরা

তখনকার দরিদ্র হিন্দুদের বা বৌদ্ধদের বংশধর মাত্র। এ যুক্তির প্রমানে উনি মুস্লীম বাঙালীদের মধ্যে বহু বৌদ্ধ সামাজিক আচার বিচার খুঁজে বার করেছিলেন। উনি ঐ মতবাদ তাঁর গুরু ও পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ডঃ দিনেন্দ্র চন্দ্র সেনকে বলেছিলেন। জসীমুদ্দীন সাহেব মোগল ও পাঠানদেরকে এ যুগের বিদেশী ব্রিটিশদের মতনই জবর-দখলকারী, পরদেশী এবং আক্রমনকারী বলে বুঝেছিলেন।

এরপর তাঁর সঙ্গে আমরা একদিনও দেখা হয় নি। পরে উনি ওঁর সেইসব মত বদলিয়েছিলেন কি না' তাও আমার জানা নেই।

এরপরও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকবার তাঁর কলিকাতাতে থাকাকালে তাঁর বাড়ীতে দেখা হয়েছিল। উনি আমাকে প্রতিবারেই অপরাধ বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণাতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ওঁদের বাড়ীর পিছনের বস্তী গুলিতে প্রায়ই চেঁচামেচি হতো। ওইটে বন্ধ করতে ওখানে যেতাম ও সেই সুযোগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম।

জবরদস্ত পুলিশ অফিসর সত্যেনবাবু ঠেঙিয়ে দুর্ধষ খুনে ও রেপকারী অপরাধী সায়েস্তা করতেন। এটা আইনী ছিল। কিন্তু তাদের উৎপাতে বহু হাকিমরাও পথে ঘাটে হৃত সর্বস্ব হতেন তাই এই সব অভিযোগ তারা প্রায়ই উপেক্ষা করেছেন। এই সময় আমি প্রথম লক্ষ্য করি যে, পুরণো পাপীরা মার ধরে আরাম বোধ করে। কারণ তাদের দেহেতে পেইন স্পটস কম বা তানিষ্ক্রিয় হওয়াতে তাদের কষ্টবোধ কম। এতে তারা সায়েস্তা না হওয়াতে সত্যেনবাবু চৌবাচ্ছাতে বরফের চাঙড়া ফেলে শীতের রাত্রে তাদেরকে চুবোলে তারা কাবু হয়ে পড়তো। আমি তখন এই সব অপরাধীদের সায়েন্স কলেজে ডঃ গিরীন্দ্র শেখর বসুর নিকট উপস্থিত করে তাদের উপর যান্ত্রিক পরীক্ষা করিয়ে বুঝি যে, এদের পেইন ও হিট স্পট কম এবং টাচ ও কোল্ড স্পট বেশী। এর ফলে বিজ্ঞানের কয়েকটি নূতন তথ্য পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়েছিল। আমার অপরাধ বিজ্ঞান পুস্তকে এইগুলির বিষয় আমি বলেছি।

এই সময় দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করেছিলাম। একদা ধনী ব্যবসায়ী ও তখনকার ধনী আয়েষী কয়েকটি নামী বাঙ্গালী পরিবারের পতনও এই সময় আরম্ভ হয়।

[বিঃ দ্রঃ—কলিকাতার ব্যবসাগুলি প্রথম দিকে এদের দখলে ছিল। তারা ইংরেজদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ভারতে ব্যবসা করতেন। কিন্তু পরে এদের দখল থেকে সেটা ক্ষেত্রীদের দখলে চলে যায়। এখন দ্রুতগতিতে সেটা মাড়োয়াড়ি ও ভাটিয়াদের কুক্ষিগত। আমি এই সময়েই অনুধাবন করতে পারি ও বুঝি যে একদিন ঐ একই কারণে ভাটিয়ারাও একদিন মাড়োয়ারীদেরকে হটাবে। এর কারণ অমিতব্যয়িতা, মদ্যপান, নারী লোলুপতা ও দানবীর হওয়ার জন্যে অযাচিত দান ধ্যান।

একদিন এক বাঙ্গালী ধনীর প্রাসাদোপম বাটির নাচ ঘরে রাত্রি কালীন উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। ঐ সব রাত্রিকালীন উৎসবে আমাদের উর্ধতনরা আসতেন এবং থাকতেন। তাঁরা আড়চোখে চারদিকে চেয়ে দেখতেন এবং বুঝতেন যে, তাঁদের সেখানে আসার খবর জেনেও আমরা তাঁদের সম্মানার্থে বা রক্ষণার্থে ওখানে না গিয়ে তাঁদের

উপেক্ষা করলাম। পরে নানা ছুতায়-নাতায় এজন্য তাঁরা অধীন কর্মচারীদের শিক্ষাও দিয়ে থাকতেন।

[পরের দিন অফিসে এসে অধীন কর্মচারীদের ভুলচুক ধরবার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ভুলচুক ধরা খুবই সহজ। এরূপ ভুলচুক তাঁদের নিজেদের অফিসের কাজের মধ্যেও থাকতো। কিন্তু, দেবতাদের বেলায় কোন দোষই দোষ নয়। ভুলচুক মানুষ মাত্রেরই হয়ে থাকে। অনিচ্ছাকৃত দোষত্রুটি উপেক্ষার বিষয়। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে সেটাই তাঁরা বড় করে দেখতেন।]

এইসব বুঝে শুনেই ওখানে আমাকে যেতে হয়েছিল। লক্ষ্মৌ হতে আনা বাঈজীর নাচ আরম্ভ হয়েছে। বাবু সাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, একটা সোনার আঙটি তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বাঈজী তেমনি নাচতে নাচতে গেয়ে উঠেছিল। তার গানের ভাবার্থ এই যে—উনি বহু খানদানি লোকের আসরে গিয়েছেন। কিন্তু এতো অপমান তাকে কেউ করেননি। তাঁরা তাকে দশ আঙুলে দশটি হীরার আঙটি দিয়েছে। এরপর সে নাচতে নাচতে ও গাইতে গাইতে অবজ্ঞা ভরে ঐ আঙটি বাবু সাহেবের কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এতে অপমানিত হয়ে ঐ বাবুসাহেব তাঁর দেওয়ানজীকে ডেকে বললেন—কি! বাঈজীর এতবড় আস্পর্ধা, ও কি না আমাকে ভিখারী বলে। নাও এই বিশ হাজার টাকার চেক। রাত্রেই জহুরীদের দোকান খুলিয়ে দশটা হীরার আঙটি আনো। সেগুলো এখুনি বাঈজীর মুখের উপর ছুঁড়ে দেব।

[বিঃ দ্রঃ—পরের দিনই এইজন্য সেই বাবুসাহেব শা'দের বাড়ী গিয়ে একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে পঁচাত্তর হাজার টাকা কর্জ নিয়েছিলেন। ওদের মহাজনবাবু সেই হ্যাণ্ডনোটটি ঠিক লেখা হয় নি, এই অজুহাতে সেটা দুমড়ে বাইরের বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। পরে নূতন হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে তাতে তাঁর দস্তখত করিয়ে নিয়েছিলেন। ওদিকে ওঁদের বাড়ীর মেয়েরা তখুনি ওই ফেলে দেওয়া হ্যাণ্ডনোটটি উঠিয়ে নিয়ে ঘরে তুলেছেন। ওই ধনীবাবু নেশার ঘোরে তা বুঝতে পারলেন না। এর কয়েক বৎসর পর ওঁরা দুইখানি হ্যাণ্ডনোট-এর বাবদ নালিশ ঠুকে ওঁর আরও চারখানা বাড়ী আত্মসাৎ করেছিলেন।]

অন্য আর একটি ঘটনার বিষয় এবার এখানে বলা যেতে পারে। প্রৌঢ় অবস্থায় এঁরা উপনীত হলে, অতি ব্যবহারে যৌন ক্ষমতা আর থাকে না। কিন্তু অভ্যাসের বশে তাদের যৌন স্পৃহা থেকেছে। এই সুযোগে একজন মো-সাহেব এসে বললে যে—হুজুর। একটি খাসা স্ত্রীলোকের সন্ধান পেলাম। বেটি আপনাকে প্রণাম করতে চায়। কিন্তু গায়ে তার একটিও গহনা নেই। তাই তার আপনার সামনে আসতে লজ্জা করছে। এই ঘটনা শুনে বাবুসাহেব বললেন—এঁ্যা, তাই নাকি! যাচা কন্যা ও সাজা পান ফেরৎ দিতে নাই। এই দু'হাজার টাকার চেক লিখে দিলাম। মেয়েটাকে সাজিয়ে নিয়ে আয়। মো-সাহেব এর থেকে যথারীতি তার পাওনা কেটে নিয়ে মেয়েটিকে গয়না কিনে সাজিয়ে দিয়েছিল।

বাবুসাহেব তার বাড়ীতে যথারীতি এলেন এবং বললেন—সুন্দরী একটা পান দাও। এর পর উনি পান খেয়ে উঠে পড়লে মেয়েটি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল—বাবু। আবার পায়ের ধুলো দেবেন তো। এতে বাবু প্রচণ্ড রেগে তাকে উত্তর দিয়েছিলেন—তোর এতো বড় স্পর্ধা। আমি অমুক শীল। আমি এক মেয়ে মানুষের বাড়ীতে দু'বার যাই না।

অন্যদিকে আর একটি বিষয় দেখে ও বুঝে আমি অবাক হতাম। এক বড় সাহেব ও এক ইনচার্জবাবু এক বাড়ীতে পার্টিতে দূরে দূরে বসে ড্রিঙ্ক করেছেন। উভয়ে উভয়কে আড় চোখে চেয়ে দেখেওছেন।

কিন্তু পরদিন উভয়েই পুরোপুরি ফিট। তবু চক্ষু দুটো একটু উভয়েরই লাল। বেলা দশটার সময় কাগজপত্র পুট আপ করবার জন্য ইনচার্জ ওই বড়সাহেবের রিপোর্ট রুমে এলেন এবং যুগ্মপদ হয়ে স্যালুঠ দিলেন। এতে বড়সাহেব খিঁচিয়ে উঠে ইনচার্জবাবুকে বলে উঠলেন—ইয়েস আই নো ওয়েল। হোয়ার ইউ হ্যাড বিন লাস্ট নাইট। আই অ্যাম ফাইনালি ওয়ার্নিং ইউ।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন পুলিসে মদ্যপান ও ব্যাডকোম্পানী রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ। কোনও ফরিয়াদী থানায় এলে দশ মিনিটের মধ্যে তাঁর অভিযোগ শুনে ব্যবস্থা নিতে হতো! এখন সময় নেই বা একটু দাঁড়ান মশাই। কিংবা আমরা ঘুষ খাই না যে, এত তাড়াতাড়ি আপনার কায করবো। এই ধরণের কথাবার্তা বললে তখন তাদেরকে ডিসমিস করা বা পানিশমেণ্ট দেওয়া হয়েছে। তখন স্মাগলারদের এবং জুয়াড়ীদের কাজ থেকে কেউ কেউ অর্থ নিলেও ভদ্রলোকদের থেকে অর্থ নেওয়া অকল্পনীয় থেকেছে। তখন পুলিশ মাত্রই আইনানুরাগী নাগরিকদের ভয় করেছে ও সর্বতোভাবে তাদের সেবাও করেছে।

চারিদিকে তখন শুধু সামাজিব, অর্থনৈতিক সীমাহীন অবক্ষয় ও অপচয়। এইসব উম্মাদদের পূর্বপুরুষেরা ভারতে ব্যবসাগুলি ইংরেজদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ভোগ-দখল করেছে। আজ পর্যন্ত তারা জীবিত থাকলে তাদের গড়া ঐ বিপুল সম্পত্তির অপচয় দেখে এদেরকে নিশ্চয়ই ত্যাজ্যপুত্র করতেন।

কেনারামের পুত্র বাবুরাম, বাবুরামের পুত্র বেচারাম। এই প্রবাদ বাক্যটির এরা যেন সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। ইংরেজীতে এদের বিষয়ে বলা যায়—গ্যালপিং হেড লঙ টু দেয়ার ডেসটিনড এন্ড।

একটী বেশ্যা পল্লী উঠাতে এক ধনী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করতে বলাতে তিনি আঁতকে উঠে বলেছিলেন—না, না, এমন কাজ করতে বলবেন না। মশাই। ছেলেপুলে হারিয়ে গেলে টপ করে ওখান থেকে খুঁজে আনা যায়। শেষে কি ওরা বে পাড়াতে গিয়ে প্রাণ হারাবে।

অন্য আর এক স্নেহময়ী মাতাকে তার বিপথগামী পুত্রকে উদ্দেশ করে বলতে শুনেছি—তুই বাবা ওটাকে বাড়ীর কাছে এনে রাখ। রাত দুপুরে বাড়ী ফিরিস। আমার খুব ভয় করে। বাবা।

ওদের অন্য এক বর্ষীয়ান গিন্নী-স্থানীয়া এক মহিলা আমাকে একদিন এমন বলেছিলেন, 'আমাদের কি সেই বোল-বোলা আর আছে। আমার দাদাশশুরের থেকেছে ছয়টি। আমার পূজ্যপাদ শশুর মশাই-এর ছিল চারিটি। উনি জুড়ী গাড়ীতে উঠলে—এক পাশে দু'জন এবং অন্য পাশে দু'জন বসে থেকেছে। এখন এই পড়তি দশাতে আমার উনি দুটির বেশী রাখতে পারেন নি।

এদের এখানে ওখানে অমন একাধিক রক্ষিতা। তবুও বাড়ীতে একটি স্ত্রী রাখা চাই-ই। এতো সত্বেও ওই অন্ধকারের মধ্যে আলোকের ঝিকিমিকি দেখা যেতো। এদের প্রবীণরা একটি অসীম গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা তাদের নিজের রক্ষিতাদের স্ত্রীর মর্যাদা দিতেন। তাদের সন্তানদের পুত্রবৎ উচ্চশিক্ষা দিয়ে জ্ঞানীগুনি করতেন। তাঁদের বিবাহিত স্ত্রীদের মতন ওদের রক্ষিতাদেরও বাড়ী-গাড়ী কিনে দিয়েছেন। এইভাবে তাঁরা বহু অসহায় নারীকে ঘৃণ্য পতিতাবৃত্তি হতে রক্ষা করে সমাজের উপকারই করেছেন। তাদের দানের অপব্যয় ও অন্যান্য অপচয় না থাকলে তাঁরা নমস্য ব্যক্তি। ও'রা ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াতেন না। বরঞ্চ বহুক্ষেত্রে একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। স্ত্রী ও রক্ষিতার মধ্যে কোন মুখ দেখাদেখি নেই অথচ উভয় বাড়ীর মধ্যে তত্ত্বের আদান প্রদান হয়েছে। এইটি ছিল মন্দের মধ্যে এক একটি উঁচু মানসিকতার পরিচয়।

কিন্তু অপচয় হতো নানা দিকে। যেমন আমারই এক বন্ধু তার বাড়ীর, মোটর গাড়ীর ও টেলিফোনের নম্বর ১২১ করবার জন্য বহু অর্থব্যয় করেছিল।

জনৈক ধনী ব্যক্তির হঠাৎ খেয়াল হলো—এ্যাঁ, আমার মাথার উপর বৈদ্যুতিক অসলার কোম্পানীর পাখা ঘুরবে, আবার অন্য সাধারণ লোকদের মাথার উপরেও অসলার কোম্পানীর পাখা ঘুরবে। তা-কখনও হওয়া উচিত নয়। সুতরাং তৎক্ষণাৎ উনি অসলার কোম্পানীর সমস্ত পাখা কিনে নিয়ে এলেন। পাখার ড্রাম অর্থাৎ মুণ্ডগুলি দিয়ে বাড়ীর উঠানে চারটি পাহাড় তৈরী করালেন। ও'র একশ একটা মোটর গাড়ীও থেকেছে। ইনিও তাঁর বাড়ীর নম্বর, মোটর গাড়ীর নম্বর, টেলিফোনের নম্বর একই রকম করবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছিলেন। সুদূরে অস্ট্রেলিয়া হতে প্লেনে করে সাহেব রঙ মিস্ত্রী আনিয়ে বাড়ীর দেওয়ালের রঙ বদলে ছিলেন। শেষে দেউলিয়া হয়ে বাঙলার বাইরে এক উদ্যান বাটীতে একটি চেয়ারে সেজেগুজে বসে এবং তাঁর স্ত্রীকেও পাশের চেয়ারে গা-ভরা গয়না পরিয়ে বসিয়ে বন্দুকের গুলিতে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করেছিলেন। তবু দেউলিয়া বা দেনাদার তাঁরা হন নি।

একবার প্রাসাদোপম একটি বাড়ী বিক্রয় হলো। একজন ধনী ব্যক্তি সেটা কিনে তখুনি ভেঙে ফেলে একটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রাসাদ তৈরী করালেন। এই ঘটনায় তাঁর শুভকাংখীরা মানা করলে উনি উত্তরে বলেছিলেন—হুম, যদি না ভাঙি তাহলে ওটাকে লোকে বলবে আগের মত "অমুক বাবুর বাড়ি।" সেটা যে আমার বাড়ি তখন লোকে তো তা বল'বে না।

সেই সময় আমি মারবেল প্যালেস ও টেগোর ক্যাসেলের কাছাকাছি বহু ধনীদের প্রাসাদ দেখেছিলাম। সবগুলোর মালিকই ছিলেন বাঙালী। প্যারীচাঁদের ইংরেজী ফার্স্ট বুক-এ পড়েছিলাম—শ্যাম ইজ এ বিগ ম্যান। সেই শ্যাম শীলের বাড়ী ছিল হরেন শীলের বাড়ীর পাশে। এখন সেখানে এক মাড়োয়ারীর ফ্ল্যাট বাড়ী উঠেছে। হরেন শীলের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ওই দানবীরকে চোখের জল ফেলে গৃহত্যাগ করতেও দেখেছি। সেই বাড়ী এখন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের দখলে। সম্প্রতি টেগোর ক্যাসেলের অবস্থাও তদনুরূপ হয়েছে। যাদের কিছু সম্পত্তি দেবোত্তর করা ছিল তারাই মাত্র তার আয় থেকে দিন গুজরান করেছেন।

লালাবাবুর বাড়ীর অবস্থাও আজ ঐরূপ। তবুও বৃন্দাবনে তার সোনার তাল গাছটি আজও রয়েছে।

সেদিনের সেই বাঙালী পট্টী আজ মাড়োয়ারী পট্টী। এজন্য এদেরই ভোটে জয়ী হয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যরাও দায়ী। সেদিনের জমির ও বাড়ীর দাম আজ বহুগুণ বেড়েছে। ওয়েলথ ট্যাক্স দেওয়ার পর কর্পোরেশনের প্রতিবার বৃদ্ধি পাওয়া ট্যাক্স দিতে ওরা অপারগ। ঐ পরিমাণ ট্যাক্স মাত্র কালোবাজারে উপার্জিত টাকা থেকেই দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এসব কায়দা কানুন এরা সব এখন ভুলে গেছে। কারণ কলিকাতার ব্যবসা এখন আর এদের অধিকারে নেই। ওদিকে জমিদারী এ্যাবলসিনের পর জমিদাব পরিবার গুলি আজ নীরব, নিথর। শুধু বুর্জোয়া নামটাই তাদের ভাগ্যে আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে।

একাদশ অধ্যায়

এখানে আমার সব চাইতে ভালো লাগতো ইংরাজদের নিয়ম তান্ত্রিকতা বোধ। তাঁদের নিকট ডিসিপ্লিন ফার্স্ট, ডিসিপ্লিন সেকেন্ড, ডিসিপ্লিন লাস্ট। এই সাথে তাদের থেকেছে। অপূর্ব সেন্স অফ জাস্টিস। এইগুলো রক্ষার জন্য তারা কামান দাসতেও প্রস্তুত থেকেছে। এজন্য প্রয়োজনে অবাধ্য বাহিনীকে তখুনি ডিসব্যান্ড করে দিয়ে তারা নূতন বাহিনীর জন্য লোক রিক্রুট করেছে। উপরন্তু তারা অধীনস্থ কর্মীদের যেমন অনুগত থাকতে বাধ্য করেছে, তেমনি তারা অধীনস্থ কর্মচারীদের উর্ধতনদের অন্যায় উৎপীড়ন হতেও রক্ষা করেছেন।

উপরন্তু তারা কোন ক্ষমতাসীন গভর্নমেণ্ট সার্ভেণ্টদের লয়্যাল পাবলিকদের প্রতি এতটুকু অসৎ ব্যবহার করতে দেন নি। কোনও এক উর্ধতন কর্মীর'ও বিরুদ্ধে প্রতিটি অভিযোগ তাঁরা তখুনি খতিয়ে দেখে তদন্ত করে তার প্রতিকার করেছেন। এইজন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জনপ্রিয় ও দীর্ঘস্থায়ী এবং শান্তিপূর্ণ থেকেছে। পাঠানদের ও মোগলদের মতন তাদেরকে জনপ্রতিরোধে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয় নি।

যেহেতু তারা সংখ্যায় অল্প সেহেতু তারা একদল **I. C. S.** এবং **I. P.** কে তাদের ভাবধারাতে তাদের মতনই পাকাপোক্ত করে তুলেছিল। কারুর উপর অবিচার হয়েছে। এরূপ কোন বোধও তাঁরা কারুর মনেতে থাকতে দেন নি। কাউকে দণ্ড দিতে হলে তার কারণ তাকে তারা সর্বাগ্রে বুঝিয়েছেন। কোন অধীনস্থ কর্মী তখন ফিল (Feel) করতে পারে এমন কাজ তারা করতেন না।

এদের ভাবধারাতে অভ্যস্ত দেশীয় উর্ধতনদের তাদের নিজেদের স্বার্থে কোনও কাজ কোনও অধীনস্থদের দ্বারা করাতে হলে এমন 'ট্যাকট ফুলি' করাতেন যাতে অধীনস্থরা তার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে। এই সম্বন্ধে নীচে একটামাত্র উদাহরণ দিলাম—

"সেই উর্ধতন বিভাগীয় প্রধান হঠাৎ আমাকে বললেন, 'হুঁ' এটা তোমার ঠিক রিপোর্ট নয়, আমি অফিসে বসে যে খবর রাখি তোমরা সরেজমিন তদন্তেও তা রাখ না। আমার এ-বিষয়ে ঠিক খবর জানা আছে।' আমি বুঝলাম যে তিনি ডাইরী বদলিয়ে সেই ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে চাইছেন। আমি এও বুঝলাম যে উনি ভুল বুঝার জন্যে এইহুকুম দিচ্ছেন। এতে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নেই। অন্যদিকে উনি যদি বুঝতেন যে, ওঁর ইচ্ছামত আমি কাজ করতে অক্ষম। তাহলে এর জন্য তিনি নিম্নোক্তরূপ একটি ভিন্ন বক্তব্য রাখতেন। এজন্য উনি কখনও সরাসরি আমাকে আমার ডাইরী বা রিপোর্ট বদলাতে বলতেন না।"

"হুম, ঐ বিভাগীয় প্রধান আমার লেখা ডাইরিটা নিবিস্ট মনে পড়লেন এবং তার পর আমাকে বললেন, "আচ্ছা, তুমি ঐ বাড়ীটার দক্ষিণ দিকে একটা শিমুল গাছ

দেখেছ। এর উত্তরে—ওটা আমি লক্ষ্য করিনি, জানালে উনি আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন-ওদের সদর দরজা থেকে উত্তর দিকে থাকা গ্যাস লেম্পের দূরত্ব কত? এই সব প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। এতে বিরক্ত হওয়ার ভঙ্গী করে উনি আমার ইনচার্জ বাবুকে বললেন—ওহে, তুমি এটা নিজে এনকোয়ারী করো। জুনিয়রদের ভালো করে কাজ শেখাও না কেন? আমাদের ইনচার্জবাবু চালাক লোক। উনি সেই সাহেবের মনোগত ইচ্ছা বুঝে ডাইরী সম্পূর্ণ বদলে ভিন্নরূপ রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন। এই ক্ষেত্রেও আমার ধারণা হলো যে, উনি ভুল খবরে বিশ্বাস করাতে এই ব্যবস্থা নিলেন। এতে কিন্তু তার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে নি।

এছাড়া এরা নিজেরা সর্বতভাবে কাজকর্ম বুঝতেন এবং তাতে দক্ষ থাকতেন। এতে তাঁদেরকে কোনও অধীন কর্মী ভুল বোঝাতে বা মিথ্যা কথা বলতে বা দোষ গোপন করতে সক্ষম হতেন না। তদোপরি তারা কোথায় কার বিরুদ্ধে অবিচার বা সুবিচার হচ্ছে বা তা হচ্ছে না, সেই সব বিষয়ে নিজেরাই খোঁজ খবর করেছেন। এই দু'টি বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি নিম্ন দু'টি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

(১) একদিন আমি এক দীর্ঘদেহী ও তাগড়া চেহারার এক স্মাগলারকে গ্রেপ্তার করে পরদিন তাকে সাহেবের রিপোর্টরুমে আনলাম। বড় সাহেব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ওই জোয়ান লোকটির দিকে তাকিয়ে থেকে আমাকে জিজ্ঞাস করলেন—তুমি কি কানুন মতো গ্রেপ্তারের পর ওর দেহ তল্লাস করেছিলে। এতে আমি, 'হ্যা স্যর" বলাতে উনি আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, হুম, এখন বলতো ঐ লোক মর্দানা না জেনানা।

এতে আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালে উনি আমাকে বলেছিলেন—এইজন্য বিখ্যাত নারী স্মাগলার বাতাসী বিবি। এই ভুলের জন্য তুমি কিরূপ পানিসমেন্ট আশা করো।

এতে ঐ বাতাসীবিবি আমাকে সমর্থন করে বলেছিলো, হুজুর, বাহাদুর। এই ভুল নিম্নপদে থাকাকালে আপনিও একবার করেছিলেন। আপনাদের জমানার লোক আমি। এই নূতন অফিসররা আমাকে চিনবে না। আমি এখন নিজে এসব কাজ করি না। প্রতিটি শহরে আমার এখন লোক আছে। আমি মাত্র গতকাল প্লেনে সিঙ্গাপুর থেকে এসেছে। আগামীকালই ফের প্লেনে ইরাকে যেতাম। কিন্তু আমরা তো আপনাদের দয়াতেই এতে বড় হতে পেরেছি।'

এরপর সেই উর্ধতন বিভাগীয় প্রধান সুর পাল্টে তাকে ধমক দিলেন বটে, কিন্তু আমাকে বললেন—এর জামিন আটকানো যাবে না। বড় বড় ব্যারিস্টার এখনই এর পক্ষে আদালতে যাবে। একে এখনই তুমি এতো টাকার জামিনে মুক্তি দাও। পরে এর বিরুদ্ধে মামলার কথা আমরা ভাববো। এই ভালো কাজের জন্য তোমাকে আমি পঞ্চাশ টাকা রিচয়ার্ড দিলাম।

(২) একদিন শুনলাম যে আমার এক অব্যহত উর্ধতন প্রমোশনের জন্য আমাকে রেকমেন্ড না করে আমার জুনিয়র একজনকে সেই উচ্চপদের জন্য প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। এতে অভিযোগমুখর হয়ে আমি কমিশনার সাহেবের সাক্ষাৎ প্রার্থী

হলাম। কিন্তু আমার ওই ঊর্ধতনটির এজন্য কানুনমতো অনুমতি নিতে আমি বাধ্য। কমিশনার সাহেব আমার এই অভিযোগ একটু মাত্র শুনে আমাকে বলেছিলেন 'আই নো [know] মাই ডিউটি, এ্যান্ড ইউ ডু ইওর ডিউটি'। ইউ মে গো নাউ। এই বিফলতাতে মনোক্ষুন্ন হয়ে আমি রিজার্ভ অফিসে এলে রিজার্ভ অফিসার আমাকে জানিয়েছিলেন—ওহে, তোমার জন্য একটা গুড নিউস আছে, কাল খোদ কমিশনার সাহেব গ্রেডেসন লিষ্ট দেখে তোমাদের দু'জনেরই সার্ভিস বুক চেয়ে নিয়েছিলেন। তোমাদের সাহেবের হুকুম বাতিল করে তোমাকে উপযুক্ত বুঝে তোমাকেই তিনি প্রমোশন দিয়েছেন। কালই আমি এটা গেজেট করতে পাঠাবো।

দ্বাদশ অধ্যায়

একদিন সন্ধ্যাতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ হতে ফোনেতে মেসেজ এলো ঐ তারিখে ভোর রাতে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটা সাইমেলটেনাস হাউস সার্চ হবে। কারণ গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ থাকলেও গুপ্ত বিপ্লবী কাজকর্ম তখনও অব্যাহত। ঐ রাতে আমাদের এই থানাটাকেই ঘাঁটি করে দিকে দিকে অভিযান পাঠানো হবে।

ভোর চারটে হতে ঐ থানা সরগরম হয়ে উঠলো। বহু উর্দীপরা সিপাহী শান্ত্রী ট্রাক ভর্তি করে থানাতে এসেছে। চতুর্দিকে বুটজুতার মসমস আওয়াজ ও রেগুলেসান স্টিক-এর ঠকঠক ও গুলিভরা রাইফেলের ঝনঝন শব্দ। ধবধবে সাদা উর্দীতে, কোমরে পিস্তল এঁটে অফিসররা প্রস্তুত। সমস্ত পুলিস দলটি দশ ভাগে বিভক্ত। প্রতি দলে একজন থানা অফিসর ও একজন উর্দীহীন অর্থাৎ সাদা পোষাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের গোয়েন্দা কর্মী। এক একদল ঐ গোয়েন্দা অফিসর-এর নির্দেশমত এক একদিকে রাতের অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে।

আমার অধীন এবং অন্য থানার আর এক অফিসরের অধীন দলটি তখনও সেণ্ট্রাল এভিনিউ-এর ফুট ধরে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ অমুকবাবুর পা'দুটো একজন ফুট-পাতে শুয়ে থাকা লোকের দেহে ঠক্কর লাগাতে উনি প্রায় পড় পড় হলেন। লোকটা জেগে উঠে গ্যাসের স্বল্পালোকে সামনে পুলিস দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে লোকটির গায়ে গেরুয়া কাপড় ছিল। ঐ পথক্লান্ত সন্ন্যাসী রাতে ফুটেতেই ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন। রাতের শেষে তাঁর পথযাত্রা আবার আরম্ভ হতো।

অমুকবাবু ঐ ধাক্কাটা সামলে উঠলেন বটে, কিন্তু তাঁর পুলিসি মেজাজ সপ্তমে উঠলো। তিনি সেই সন্ন্যাসী সাধুবাবাকে অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে চড় চাপড় ও লাথি মেরে ফেলে দিলেন।

এই ঘটনা দেখে আমি প্রতিবাদ মুখর হয়ে অমুকবাবুর সঙ্গে দারুণ কলহ আরম্ভ করলাম। কিন্তু সেই সাধুবাবা ততক্ষনে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। উনি দুই হাত তুলে অমুকবাবুকে আশীর্বাদ করে বললেন, বাবা! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

সাধুবাবা স্থান ত্যাগ করলেও আমাদের কলহ তখনও চলছিল। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঐ ভোররাতে ঐ পথে তাঁর অভ্যাসমত গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক আমাদের উভয়কেই জানতেন। উনি আমাকে নিরস্ত হতে বললেন, দাদাভাই, ওঁকে আর কিছু বলবেন না। ওঁর অর্থাৎ অমুকবাবুর আর রক্ষা নেই। ওই সাধুবাবা যদি ওঁর মার খেয়ে ওঁকে গালাগাল দিতেন, তাহলে পাপ-পুণ্যে কাটাকাটি হয়ে যেতো। এবং উনি রক্ষা পেতেন। কিন্তু দেখলেন না, উনি মার খাওয়ার পরও কিরূপ বিনা ক্রোধে ওঁকে আশীর্বাদ করে গেলেন। তাই উনি আর কোনও মতে এর জন্যে রক্ষা পাবেন না।

[বিঃ দ্রঃ—এই ঘটনার প্রায় দু'দিন পরই ঐ ভদ্রলোকের ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল। অমুকবাবু মদ খেয়ে এক আসামীকে দারুণ প্রহার করেন। তাতে সে আহত হলে উনি তাতে ভয় পেয়ে তাকে নিজেই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হাসপাতালের তরুণ ডাক্তারবাবু তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করে মেডিকেল রিপোর্টে আইনমত লিখেছিলেন—পেশেন্ট সেড হি ওয়াজ এসল্টেড বাই অমুকবাবু। এর ফলে ওঁর সঙ্গে তাঁর কলহ। হাসপাতাল হতে ফোন পেয়ে বড় সাহেব নিজে হাসপাতালে এসে তখনও টিপসি অবস্থাতে থাকা অমুকবাবুকে পেয়ে মহাখাপ্পা। পরে মাতাল হয়ে মারপিঠ করার অপরাধে তিনি ডিসমিস হয়েছিলেন। পরে তাঁকে অর্থাভাবে এর ওর কাছে ভিক্ষা করতে দেখা গিয়েছিল।]

ঐ রাত্রে আমাদের পার্টিটা যে বাড়ীটি ঘেরাও করে তল্লাস করেছিল, সেই বাড়ীতে কোনও বমাল উদ্ধার করা যায়নি। পরে শুনেছিলাম ঐ বাড়ীর এক তরুণ পুত্র তার এক পোষা ট্রেনিংপ্রাপ্ত এক কুকুরের মুখে তার গুলিভরা পিস্তলটি গুঁজে দিলে কুকুরটি নর্দমার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে মূল আড্ডাতে পিস্তলটি পৌঁছে দিয়েছিল।

এই বাড়ীর লোকজনেরা কিন্তু তাঁদের ঐ গুনধর পুত্রের কীর্তিকলাপের কোন খবরই জানতেন না। তাঁরা একবাক্যে তাঁদের ঐ দুধের বাচ্চাকে গ্রেফতার করার জন্য প্রতিবাদ মুখর হয়ে উলেন। ঐ ছেলেটি সেই বছরই স্কলারশিপ পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। কিন্তু ঐ দুধের বাচ্চাই তাদের সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে আমাদের সকল দোষ খন্ডন করে তাদেরকে বললেন—মা-কাকী-জ্যেঠী-ঠাকুমা দেশ মাতার জন্য তোমাদের একটি ছেলেকে দান করো। ততক্ষনে এই ছেলেটির গুণমুগ্ধ প্রতিবেশীরাও সেখানে তার হয়ে ওকালতি করতে এসেছিল। তারা ঐ ছোট ছেলের মুখে ঐ রকম বড় কথা শুনে অবাক। তাদের তখন ভাবনা এই যে, ওর সঙ্গে মেলা মেশা করার অপরাধে তাদের ছেলেরাও পুলিশের ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়ে।

এইদিন বহু তরুনকে বিভিন্ন স্থান হতে পাকড়াও করে এই থানাতে জড়ো করা হয়েছিল। পরে আদালত হতে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে তাদের এক একজনকে এক এক থানাতে সিগ্রিগ্রেট করে রাখা হয়েছিল। ওরা স্পেসাল ব্রাঞ্চের গোয়েন্দা বিভাগের আগামী। আমাদের সঙ্গে ঐ মামলা সম্পর্কশূন্য হলেও ওদের হেপাজতের দায়ীত্ব থানাওয়ালাদেরই ছিল।

[এখানে উল্লেখ্য এই যে এই যুগে স্বদেশ প্রেমের জন্য যে কোনও বাঙালী তরুনকে তাদের বাড়ী বা হোস্টেল হতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, দেখা গেছে তাদের প্রত্যেকেই তাদের স্কুল বা কলেজে ফাস্ট অথবা সেকেন্ড হওয়া স্কলারশিপ পাওয়া মেধাবী সেরা ছাত্র। এর ফলে তারা পুলিশ রিপোর্টে গভর্নমেণ্ট চাকুরী থেকে বাতিল হতো বলে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে বসতে ব্যর্থ হয়েছে। এজন্য I. C. S. এবং I. P আদি সার্ভিসের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে তারা বসতে না পারাতে ঐসব সার্ভিসে পূর্বের মত আর বাঙালীদের দেখা যেতো না।]

পরদিন একজন গোয়েন্দাকর্মী ঐ তরুনের বিবৃতি নেবার জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এলেন। কিন্তু ঐ বালকটি ঐ একই উত্তর দেয়। "আমার মাথা গুলিতে উড়িয়ে দিন বা চোখ উপড়িয়ে নিন। দেশ মাতৃকার বিরুদ্ধাচরন আমি করবো না। আমার মুখ হতে দলের বিষয়ে একটি কথাও পাবেন না। এমনি বারে বারে ওদের এক একজন আসেন ও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যান।

এই দিন—এখানে ঐ স্পেশাল গোয়েন্দা বিভাগ হতে একজন প্রৌঢ় বাঙালী গোয়েন্দা অফিসর এলেন। উনি ঐ ছেলেটিকে পরম স্নেহে তাঁর কাছে বসিয়ে বললেনঃ বাবা শোন। আমি তোমার পিতৃ বন্ধু। এর পর উনি তার কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে বললেন, বাবা কারো কাছে কোনও কথা স্বীকার করো না। তোমাকে একটু সাবধান করে দিতে এলাম। এমন কি আমার কাছেও কোনো কথা বলবে না। কারণ যে বিভাগ হতে তোমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, আমি কিন্তু পুলিশের ঐ বিভাগেরই একজন কর্মী। পেটের দায়ে আমি এখানে চাকরি করি। তোমার মত অমন আমারও একটা সুন্দর ছেলে ছিল। কিন্তু সে বহুকাল হতে নিখোঁজ হয়েছে। সম্ভবতঃ সে তোমাদের দলেতেই ঢুকে থাকবে। ভদ্রলোক চোখের জলে চোখের পাতা ভিজিয়ে ছেলেটাকে মুগ্ধ করলেন। পরের দিন ফের একটা মিষ্টির হাঁড়ি ও কিছু কাপড় চোপড় সহ উনি সেই থানাতে এলেন ও ওগুলি ঐ ছেলেটাকে দিলেন। ঐ অফিসারটি ঐ দ্রব্যগুলি ছেলেটির বাড়ী হতে চেয়ে এনে ছিলেন। ঐ গুলি তারই কাপড় বুঝে সেই ছেলেটির ওঁর ওপর বিশ্বাস আরো বাড়লো। সে এবার তাকে "কাকাবাবু" সম্বোধন করে তাঁর পায়ের ধুলোও নিল।

এর পরের দিন ওই অফিসারটি তরুণটার পিতাকে ও একশিশি মাথাতে মাখবার সুগন্ধী তেল ও কিছু খাদ্য ও কাপড় চোপড় নিয়ে এই থানাতে এলেন। এর পর ঐ অফিসারটি বারে বারে ওর পিতাকে এমন ভাবে 'দাদা' সম্বোধন করছিলেন যেন, উনি তাঁর বহু দিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উনি মাত্র দুই দিন আগে ওঁকে দেখেছেন। এরপর আর দেরী না করে তার ওই পিতাকে নিয়ে উনি দ্রুত থানা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

[আমি দূর হতে ওঁর কথাবার্তা শুনে এবং তাঁর অভিনয় চাতুর্য্য দেখে ততক্ষণে অবাক ও হতভম্ব]

এর পর দুই দিন আর উনি এখানে এলেন না। পরে হঠাৎ হন্তদন্ত ভাবে দারুণ ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে উনি থানাতে এসে ছেলেটাকে হাজত ঘর হতে বার করে তাঁর কাছেতে নিলেন ও তাকে বললেন। 'বাবা' একি তুমি করেছো। আজ ওদের ফাইল খুলে ও তা পড়ে আমি একেবারে অবাক। তোমাদের দলের বারোজন লোকদের মধ্যে দশজন লোকই তো পুলিশের লোক। এমনকি তোমাদের ওই দাদা নামে নেতাটিও এই দলে রয়েছেন।

এই কথা শুনে ওই ছেলেটি প্রতিবাদ করে বললে, না! না! কাকাবাবু তা হতেই পারে না। আমরা সকলেই দেশমাতৃকার নামে শপথ করে ভূর্জপত্রে আমাদের দেহ

হতে রক্ত বারে করে তাই দিয়ে লিখে দিয়েছিলাম, আমরা দলের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না।

হুম। তাই। তাহলে এই দেখ প্রমাণ। এই বলে ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে আনা একটা ফাইল খুলে পড়তে আরম্ভ করলেন। 'শোন'। অমুক দিন তোমাকে অমুক দাদা ভোর ছয়টায় এসে ডেকে বাইরে নেয়। এরপর তোমাকে নিয়ে গিয়ে এই এই দ্রব্য, পিস্তল ও বোমা ভর্ত্তি একটা ব্যাগ তোমাকে দিয়ে তোমাকে ওগুলো অমুক বাড়ীতে পেঁছুতে বলে ছিল। সেইখানে ত্রীতলের একটা ঘরে দুয়ার বন্ধ করে অমুক অমুক দাদাদের সঙ্গে বসে তোমরা এই বিষয়ে পরামর্শ করলে। তারপর ওদের নির্দেশমত তুমি এই এই দ্রব্য ও পত্র অমুক দাদাকে অত নম্বরের বাড়ীতে গিয়ে পেঁছে দিয়ে এলে ও ওর কাছ হতে এই এই জিনিস নিয়ে ফিরে এসে অমুক জায়গায় অমুকের সঙ্গে দেখা করেছিলে ইত্যাদি।

এইভাবে গত এক সপ্তাহের প্রতিটি দিনের তার প্রতিটি ক্ষণের মুভমেণ্ট ও কথা-বার্তা ও কার্যাদি হুবাহু উনি বলে গেলেন। এইসব তথ্য এবং দুয়ার বন্ধ ঘরের মধ্যে কওয়া কথাবার্তা বাহিরের কারোর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। ছেলেটা ঐগুলি শুনে ততক্ষণে কাঁপতে আরম্ভ করেছে। সে এইবার বিভ্রান্ত হয়ে ও মোহমুক্ত হরে একটা স্বীকারোক্তি করতে আরম্ভ করলো। ঐ অফিসারটি ওর মেণ্টাল নোটস নিলেন ও তার পরে অন্য ঘরে এসে তা বিবৃতির আকারে লিখতে শুরু করলেন। পরের বছরে তাঁর রায় বাহাদুর বা রায় সাহেব খেতাব প্রাপ্তি ও প্রমোশন এবার ঠেকায় কে? ঐ ছেলেটি তাদের দলের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানা তো দিয়েছিলই, সেই সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্রের লুকানো স্থান গুলোও তাকে বলে দিয়েছিল। পরের রাত্রে বহু বাড়ী একই সময়ে ভোর রাত্রে তল্লাসী করার ব্যবস্থা তক্ষুণি করতে হবে। পরদিন একটা গ্যাঙ্গ কেসের মামলা ওদের বিরুদ্ধে রুজু করার সুযোগ হয়েছে। এটা হবে হিজ মেজিষ্ট্রি ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মামলা।

উনি চলে গেলেন। ওই তরুণটিকে ফের হাজত ঘরে ঢুকানো হলো। কিন্তু রাত্রে ছেলেটি তার স্বাভাবিক আপন সত্বা ও সম্বিত ফিরে পেয়েছিল। সে তখন তার ভুল বুঝে অনুতাপে বিদগ্ধ। সকালে দেখা গেল যে, ওই ছেলেটা তার ধুতিকে দড়ি করে তা গলাতে ও হাজত ঘরের লৌহ গরাদে বেঁধে ঝুলছে। তার দেহেতে কোনও প্রাণের স্পন্দন একটুকুও নেই। তাতে বিপদে পড়লাম আমরা। পুলিশ হাজতে মৃত্যু একটা সাংঘাতিক ঘটনা। অসতর্ক থাকার জন্য হাজত ঘরের পাহারাদার সিপাহীকে সাসপেণ্ড করে তার বিরুদ্ধে প্রেসিডিং ড্র করা হলো। সেই সাথে যৌথ দায়িত্বের দায়ে আমাদেরও কৈফিয়ৎ চাওয়া হলো। তার সেই কচি মুখের প্রদীপ্ত অথচ স্নিগ্ধ চাহনীটুকু আজও আমার মনে জেগে উঠে।

এই থানাতে থাকা কালে আরও কয়েকটি উল্লেখ্য ঘটনা ঘটেছিল। তার কয়েকটা মাত্র আমি এখানে উল্লেখ করবো।

(১) একটা ছোকরা কিছু অর্থের বিনিময়ে আমাকে কিছু সংবাদ জানাতে চাইল। তার সংবাদ মত আমি কিছু ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার পত্র সমেত সুরেশ ঝাকে গ্রেপ্তার

করে ছিলাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বা পরে এই ঝা বাবু বিহারের মন্ত্রী হয়েছিলেন। যাইহোক। এই ঘটনাতে ঐ বালক আমার ইনফরমার হয়ে উঠে। পরে এর সংবাদমত একটা বালককে কিছু ঐরূপ নিষিদ্ধ প্রচার পত্রসহ এক খাবারের দোকানে গ্রেপ্তার করেছিলাম। ঐ অপরাধী বালকটি তার বিবৃতিতে বলেছিল যে, অন্য এক বালক তার সঙ্গে ভাব করে তাকে খাওয়ানোর জন্য এই দোকানে আনে। এর পর তার হাতে এই গুলো দিয়ে ওগুলো রাখতে বলে ও তারপর এক্ষুণি আসছি বলে ওখান হতে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র পুলিশে এসে আমাকে ধরেছে। এর কথাতে আমরা বিশ্বাস করি না। আদালতের বিচারে ওর তিন মাস মেয়াদ হয়।

পরে—ওই বালক ইনফরমার বিভিন্ন স্থানে ঐরূপ আরও কয়জন বালককে ধরালো। কিন্তু তারাও ঐ একই রূপ বিবৃতি দিল ও বিচারে জেলে গেল।

কিন্তু—পরেতে আমি এতে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠি। তাই ওই বালক ইনফরমারকে একটা দাগ দেওয়া টাকা এবং একটা মার্কা করা নোট তাকে দিয়ে ছিলাম। কারণ প্রতিটা মামলাতে সংশ্লিষ্ট আসামী বলে ছিন যে, তার ঐ বন্ধু বালকটাই দোকান হতে খাবার কিনে তাকে তা খেতে দেয় ও সেই সুযোগে সে তার কাছে ঐসব নিষিদ্ধ প্রচার পত্র গচ্ছিত রেখে বের হয়ে যাওয়া মাত্র পুলিশ এসে তাকে ধরেছে।

এর পর—ওই ইনফরমার বালকের সংবাদমত অন্য এক হোটেলে অন্য এক বালককে আমি এক বাণ্ডিল নিষিদ্ধ প্রচার পত্রসহ গ্রেপ্তার করলাম। আর সেই একই রকম বিবৃতি শুনে ওই দোকানের তহবিলের বাক্সো থেকে ঐ মার্কা করা টাকা ও নোটটা পেয়ে আমি হতভম্ব। দোকানীও আমাকে বললে যে, এর আগের বালকটা ওই নোট ভাঙ্গিয়ে খাবার কিনে ওকে তা খেতে দিয়ে বাকি ভাঙানি নিয়ে একটু আগে এখান হতে বেরিয়ে গিয়েছে।

পরে তদন্তে জানা গেল যে, ওই ইনফরমার বালকটি ওই কংগ্রেসী নেতা ঝা-বাবুর ভৃত্য ছিল। ঝা বাবুর মেয়াদ হওয়ার পর তার বাড়ী হতে ওইসব প্রচার পত্র ঐ বালক সংগ্রহ করেছিল। এর পর আমি অসীম অনুতাপে বহুদিন বিদগ্ধ হয়েছি। তবে দেশ স্বাধীন হরার পর এজন্য এরা 'ফ্রিডাম ফাইটার' রূপে প্রমাণ দাখিল করে সরকারী পেনশন পেয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। তবে এইরূপ পুলিশী ভুলে অন্য বহুজন এই সুবিধা প্রৌঢ় বয়সে ভোগ করতে পেরেছেন।

(২) গোয়েন্দা বিভাগে হতে জনৈক কর্ম্মী এসে থানার সাহায্য চাইলেন। তার সঙ্গে বেরিয়ে একটা রাস্তাতে একস্থানে গেলাম। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে আমাদের সম্মুখে থামলো। কিন্তু যে আরোহীটির নির্দ্দেশে ঐ ট্যাক্সি সেখানে থামলো সেই লোকটিই তা হতে নেমে দৌড় দিল। আমি তাকে ধরতে তার পিছনে ধাওয়া করা মাত্র ঐ গোয়েন্দা কর্ম্মীটি আমাকে রুখে দিলেন। কারণ তাঁর মতে ঐ কাজ আমার পক্ষে হঠকারীতা ও অনর্থক বিপদ বরণ। এর পর ঐ গাড়ীতে তখনও বসে থাকা লোকটির পাশে একটা ব্যাগে একটি ভাঙা পিস্তল ও কিছু কার্তুজ পাওয়া গেল।

কিন্তু ঐ গাড়ীতে বসে থাকা সেই লোকটি কেঁদে উঠে বললো, বাবুসাব। ওই ভাগনেবালা লোক আমাকে মাল খাওয়াবে আর মেয়ে মানুষের বাড়ীতে নেবে ব'লে এই

ট্যাক্সিতে তুলেছে। এবার কিন্তু আমি আর অসাবধান হইনি। ওই অফিসারের বিরুদ্ধে আমি এইভাবে ইনফরমারদের বিশ্বাস করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ পাঠিয়ে ছিলাম।

এইরূপ কয়েকটি ঘটনা ঘটার পর আমি একটা থিসিসের মত দীর্ঘ প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে ছিলাম, আমি তাতে বলেছিলাম যে, এই সব ইনফরমার দু একটি চুরির খবর দিয়ে পুলিশের বিশ্বাসভাজন হয়ে নিজেরা বহু বিরাট চুরি করায়। তারা বিপক্ষ দলের চোরদের ধরায় ও নিজেদের দলের লোকের তাতে একচেটিয়া সুবিধা করে দেয়। ওদের রাখলে কুড়ীটি চুরি হবে ও ওদের সাহায্যে তার মাত্র দু একটি মামলার কিনারা হবে। কিন্তু ওদের না রাখলে এলাকাতে দু একটি চুরি হবে। তার হয়তো একটাও কিনারা হবে না। এই জন্য পুলিশের তদন্তে সূত্রের ওপর বেশী নির্ভরশীল হওয়া উচিত। কিন্তু—চোর না হলে চোরের খবর কেইবা জানবে ও পুলিশকে তা জানাবে। সেই ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, সেই অবস্থাতে ওদের সংবাদে ধরা আসামীদের পূর্বেকার ব্যবহার ও চরিত্র জানা প্রয়োজন ও সেইসাথে তাদের স্থানীয় রেপুটেশন আদির পরিপেক্ষিতে তাদেরকে বিচার করতে হবে। এইখানে বুঝতে হবে যে, এইরূপ কোনও এক ব্যক্তির পক্ষে এই কাজে লিপ্ত হওয়া সম্ভব কিনা।

এই প্রতিবেদন পেয়ে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ তাদের সংবাদ দাতাদের ওপর তীক্ষ্ন নজর রাখতে এবং তাদের সংবাদ বাছাই না করে কোন ব্যবস্থা সম্ভব হলে তক্ষুনি তা গ্রহণ করতে বারন করেছিলেন। এইজন্য ওই ইনফরমাররা কিভাবে ওই খবর জানলো তা তাকে বলতে বাধ্য করার জন্য আমি আমার প্রতিবেদনে বলেছিলাম। তাহলে সত্যমিথ্যা সহজেই যাচাই করা যেতে পারবে। আমার এই মতামত কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়ে অনুরূপ নির্দ্দেশ ওঁরা অফিসারদের দিয়েছিলেন।

আমার এই দীর্ঘ প্রতিবেদনরূপ থিসিসে আমি লিখেছিলাম যে, কোন ব্যক্তিকে দোষী প্রমাণ করলে এদেশে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে মনিটারী পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু এখন হতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী প্রমাণ কেউ করতে পারলেও তাকে সমভাবে ঐরূপ অর্থকরী রিওয়ার্ড দেওয়া হোক। তাহলে—অফিসাররা সম্মান ও অর্থলোভী হয়ে এইরূপ অন্যায্য প্রবণতা হতে মুক্ত হতে পারবে। জনগণও তাদের অনিচ্ছাকৃত অন্যায় আচরণজাত ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে।

আমার এই দীর্ঘ প্রতিবেদন এর ফাইলে ডেপুটি কমিশনার লিখেছিলেন। এ্যান ইন্টারেস্টিং রিভিউ। CP মে লাইক টু সি। এর ওপর খোদ কমিশনার সাহেব লিখেছিলেন। দেয়ার ইজ অরিজেনালিটি। DCHQ টু নোট। DCHQ তাতে লিখেছিলেন। সিন। ফাইলড্।

[কিন্তু—আমি ডেপুটি কমিশনার হলে পুলিশ কাউকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করলে তাকে পুরস্কার দিতাম ও তার গোপন নথীতে ভাল মন্তব্য লিখতাম।]

এই সময় আর একটি শিক্ষাপ্রদ অসৎ রুচিবিহীন ঘটনা আমার মনে পড়ছে। আমাদের ইনচার্জ অফিসার ছিলেন অত্যন্ত অনেষ্ট ও স্ট্রিকট অফিসর। কোন বৈদ্যনাথ তীর্থ ফিরত লোক যদি প্রসাদরূপে বৈদ্যনাথের পেঁড়াও তাকে দিতেন উনি

ওটা উৎকোচ বুঝে তাকে হাজতে পুরতেন। আমার কিন্তু অনেষ্ট ও স্ট্রিকট উর্দ্ধতনদের বেশী পছন্দ হতো। কারণ—ওরা ভালো মন্দ বাচাই করাতে ভালো জনদের সুবিধা হতো। তাতে মুড়ী মিছরীর একদর হতো না। অন্যথাতে মন্দজনরা তলারও কুড়াতো ও সেই সাথে গাছেরও খেতো। অর্থাৎ উৎকোচ নিতো ও প্রমোশনও পেত।

এহেন ইনচার্জবাবু যখন তরুণ ছাত্র। সেই সময় তপরেজ আলি নামে একজন মুন্সীবাবু, যাদের পরে এ্যাসিসটেণ্ট সাব ইনসপেকটার বলা হত, তিনি তাঁর এ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার পিতার অফিসে মুন্সীর কাজ করতেন। পরে সত্যেনবাবু পুলিশে ঢুকে পদোন্নতিতে থানা ইনচার্জ হন। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত রিটায়ার না করা ঐ মুন্সীবাবু মদ্যপ হওয়াতে প্রমোশন না পেয়ে ওই মুন্সী পদেতেই থেকে যান। এখন সম্প্রতি তাঁকে কর্ত্তৃপক্ষ ওঁর অধীনে, ওই থানাতে বদলী করে পাঠিয়ে ছিলে।

পিতার অধীন ও তাঁর অতিপ্রিয় এই কর্ম্মীটারে মদ্যপ ব্যবহার সত্যেনবাবু বাধ্য হয়েই সহ্য করেছেন। একবার মহরমের ডিউটি দেয়ার কালে মদ্যপ অবস্থাতে উনি আখড়া দলের সঙ্গেই লাঠি খেলতে আরম্ভ করেছিলেন।

কিন্তু—এই দিন তার বিরুদ্ধে একজন উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনলো। এই ইনচার্জবাবু আমাদের মত নিজে অনেষ্ট ছিলেন। ওপরন্তু আমাদের মত উনি অন্যদেরকে অনেষ্ট থাকতে বাধ্য করতেন। এতে ইনচার্জবাবু ক্ষেপে উঠে বললেন, 'এ্যাঁ! তুমি একুশ টাকা বারো আনা ছয় পয়সা ঘুষ খেয়েছো।

তপরেজ খান এই সময়ে মৌতাতের গুণে পুলিশী ডিসিপ্লীনের এক্তিয়ারের পুরোপুরি বাইরে। মাত্র বিশ বছর পূর্বের ঐ দিনের বালক সত্যেনবাবুকে উনি লজেন্স কিনে খাইয়েছেন।

আরে। কি কন্ মশাই, টিপসিতে থাকা তপরেজ খান খেঁকিয়ে উঠে তাকে বলেছিল, 'আমি ঘুষ খাইছি? তোমার পিতা ঘুষ খাইয়া তোমাদের লাগি দুই খানা বাড়ী বানাইছে। তাই তোমার ঘুষ খাইবার প্রয়োজন নাই। তুমি তাই অনেষ্ট থাকতে পারতিছ। আমিও ওর মত ঘুষ খাইয়া দুই খান বাড়ী বানাইলে আমার পোলাও তখন তোমার মত একজন অনেষ্ট হইতে পারিবে।

সত্যেনবাবুর স্বর্গত পিতা সৎ ও অনেষ্ট অফিসার ছিলেন। তাঁর আদর্শ ও শিক্ষাতে পুত্র সত্যেনবাবুও অতি অনেষ্ট ও চরিত্রবান। এখানে বুঝা গেল যে, মাতালে কিনা কয়, আর ছাগলে কিনা খায়।

কিন্তু—এতে এও বুঝা গেল যে, মানুষের সুনাম বা দুর্নাম ওই ভাবে প্রপোগান্ডার দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে থাকে। পৃথিবীতে বড় বড় যুদ্ধ জয়েরও মূলে থেকেছে এক তৃতীয়াংশ আর্মস ও এ্যামুনেশন এবং দুই তৃতীয়াংশ প্রপোগণ্ডা। এইজন্য ওইসব প্রপোগণ্ডাকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। এইজন্য কাউণ্টার প্রপোগাণ্ডার প্রয়োজন স্বীকার্য। পুলিশের বহু বদনাম এইরূপ অলীক প্রচারেরই অপকল। সুস্থ অবস্থাতে তপরেজবাবু আমাকে বলেদিলেন যে, ওঁর ওই পিতা অতি সাধু ও সৎ ছিলেন। কিন্তু উনি এও বলেছিলেন যে, তিনি নিজে মদ্যপ হলেও

ঘুষখোর নন। [এটা সত্য ছিল] তপরেজ বাবুর মতে লোকদের সন্দেহ করতে করতে ওই ইনচার্জবাবু সন্দেহবাতিক হওয়াতে ওকে উনি ওই ভাবে সক (shock) ট্রিটমেণ্ট ঐ দিন করেলিলেন। কারণ উনি একদা ওই ইনচার্জবাবুকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলেন ও বাল্যকালে দুষ্টামী করলে উনি তাঁকে ধমকেও ছিলেন। কিন্তু চাকা এখন উল্টোদিকে ঘুরছে বলে উনি উল্টে ওঁকে শাসন করবেন। তাই ঐ দিন উনি একটা তত্ত্ব কথা ওঁকে শুনাইয়া দিলেন।

উপরের ঘটনাটি হতে ভারতে ইম্পিরিয়াল [অধুনা সর্বভারতীয়], প্রভিন্সিয়াল ও সাবর্ডিনেট রূপ তিনটি পৃথক অর্ডার অফ সার্ভিস রাখার ও উক্তপদগুলিতে ডিরেক্ট এ্যাপোয়েণ্টমেণ্ট এর উপকারীতা বা অপকারীতা বুঝা যাবে। এইজন্য এক্ষেত্রে য়ুরোপে পুলিশে মাত্র দুইটি র‍্যাঙ্ক থেকেছে। যথা পুলিশ মেন এবং পুলিশ অফিসার। ওখানে একজনকনেষ্টবলকেই প্রমোশনে চিফ কনেষ্টবল অর্থাৎ পুলিশ কমিশনার করা হয়। একজন পক্ককেশ (Hoary headed) প্রবীন অভিজ্ঞ ও অতি দক্ষ অফিসারের মাথার উপর হঠাৎ একজন তরুণ অনভিজ্ঞ অফিসারকে বসিয়ে দিলে প্রসাশনিক অবনতি ঘটবেই। কোনও এক সংস্কৃতজ্ঞ বা গণিতজ্ঞ ব্যক্তি তৎবিষয়ে বেশী নম্বর পেয়ে কম্পিটিভ্ পরীক্ষার দৌলতে উচ্চপদী হতে পারেন। কিন্তু তাঁর ওই দুইটা বিষয়ে জ্ঞান পুলিশী কার্যে নিষ্প্রয়োজন।

[প্রাগ স্বাধীনতা যুগে ওই অসুবিধা বোঝা যায়নি। কারণ ঐকালে সরাসরি উচ্চপদে নিযুক্ত ইংরাজ উর্ধ্বতনরা তৎকালে অভিজ্ঞ বয়স্ক অধীনদের পরামর্শ সাগ্রহে নিতেন। উপরন্তু তারাও ঐসব বয়স্কদেরকে যথেষ্ট সম্মানও দিয়েছেন।]

তবে অর্ধেক উচ্চপদ মাত্র সরাসরি নিযুক্ত তরুণদের জন্য রাখা যেতে পারে। কারণ পর পর প্রমোশনে উচ্চপদে উঠবার মত বয়স সর্ব্বনিম্ন পদীদের থাকেনি। তাই কিছু উচ্চপদে তরুণ অফিসারদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাঁদের ঔদ্ধত্বের শীকার হলে চলবে না। এদেশের মানুষ চায় যে, তরুণরা প্রবীনদের সম্মান করুক। প্রবীন অধীনদের নিকট হতে কৌশলে এদের কাজ শিখতে হবেই।

এই খন্ডটাতে আমি পুলিশ বিভাগের কিছু দুর্নীতীর বিষয় বলেছি, তবে—ক্ষমতার অধিকারী প্রতিটি বিভাগেই কিছু ব্ল্যাক-শিপ থাকেই। ওদের দমনের জন্য কঠোর তদারকীও থেকেছে। কিন্তু তখনও পুলিশে ওদের সংখ্যা নগণ্য। ওদের বাকি শতকরা আশি ভাগ ছিল সবই সৎ ও আইনানুরাগী, উপরন্তু যারা উৎকোচনিত তারা তা মাত্র জুয়াড়ী' স্মাগলার ও চোর ছ্যাঁচোরদের কাছ হতে নিয়েছে। কিন্তু ভদ্রগৃহস্থদের তারা প্রকৃত রক্ষাকর্ত্তা ছিল। তাদের কাছ হতে কিছু চাওয়া বা নেওয়া তারা মহাপাপ ভেবেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ্যা ভোগী হয়েছে। কিন্তু তারাও ভদ্রগৃহস্থ কন্যাদেরকে তাদের নিজেদের মা ও বোনের সম্মান দিয়েছে।

[তবে—ঐ বিষয়ে চোর-ডাকাতরা আস্কারা পেলে চুরীর সংখ্যা বাড়বেই। তাই তাতে গৃহস্থরা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু তৎকালে পুলিশ কর্ম্মীরা তাদের অপহৃত দ্রব্য তক্ষুনি উদ্ধার করতেও পেরেছে।

[কদাচিৎ শনো যায় যে, এযুগে পুলিশদের কেউ কেউ গুণ্ডাদের ভয় করে ও ভদ্রলোকদের উৎপীড়ন করেছে। কিন্তু ঐ যুগে এইরূপ ঘটনা একটিও ঘটতে পারেনি। ছাত্রীদের পিছনে ধাওয়া করা বা পথে ঘাটে মস্তানী করা তরুণদের প্রারম্ভেই দমন করা হয়েছে। অবশ্য তখন ওদের মদত দেবার জন্য রাজনৈতিক দাদারা তখন থাকেনি। এইরূপ ঘটনা কোন এলাকাতে ঘটলে সংশ্লীষ্ট থানার প্রত্যেক জন নিজেদেরকে অপমানিত মনে করে লজ্জিত হয়েছে। এইজন্য ঐ কালের পুলিশ পাড়ায় পাড়ায় নিজেরাই ঘুরে ওঠতি গুণ্ডাদের খবর নিয়ে তক্ষুনি ব্যবস্থা নিত।]

মার ধোর শুধু নারী বলৎকারক ও দুর্ধর্ষ চোর গুণ্ডাদের উপরই হয়েছে। এটাও আমরা কয়জন তরুণ কর্ম্মী ক্ষমতাতে এলে পুরাপুরি বন্ধ করি। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে, এই বে-আইনী প্রথা প্রতিটী ক্ষেত্রে বন্ধ হওয়া মাত্র রোমিও মস্তানদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে সংখ্যাহীন হয়ে ওঠে। এজন্য ঐ কালের তরুণ অফিসারদের নেতা রূপে আমি দায়ী।

[এই কালে কলিকাতা পুলিশে আশি ভাগ গ্রাজুয়েট নবীন অফিসার অনেষ্ট ও সৎ থাকার একটি কারণও থেকেছে। ঐ সময় ধনী ও সৎ পরিবার হতে বেছে বেছে তরুণ গ্রাজুয়েটদের পুলিশের মধ্যবর্তী পদগুলিতে ভর্ত্তি করা হয়েছে। অভিজাত ধনী পরিবারের নির্লোভী সৎ তরুণরা নারী সংস্পর্শ ও উৎকোচ গ্রহণকে ঘৃণা করেছে।

এই এলাকাতে দুই বিখ্যাত বাড়ীতে আমি প্রায়ই গিয়েছি। (১) কানাকেণ্ট নামে খ্যাত অন্ধ গায়কের বাড়ী, যেখানে আমি ওঁর গান বহুবার শুনেছি। (২) স্বামী-বিবেকানন্দের বসতবাটী। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখনও জীবিত। তাঁর মতেতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে স্বামীবিবেকানন্দ বেশী কাল বাঁচেননি। ওঁর নিকট হতে আমি স্বামীবিবেকানন্দের বহু কাহানী শুনে ছিলাম। ওইগুলি আমি অন্যত্র পৃথক প্রবন্ধে বিবৃত করেছি।

[বিঃ দ্রঃ—এই সময় আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে ফলের দোকানগুলি পেশোয়ারী ফলওয়ালাদের দখলে। ওই মার্কেটের সুপার-ইন-টেন্ডেণ্ট রঞ্জন মজুমদার আমার সহপাটি সুধীন মজুমদাররের পিতা ছিলেন। ওর সাহায্যে ওখানে আমি সর্ব্বপ্রথম দুইজন বাঙালী, একজন বিহারীকে কয়টি ঐরূপ দোকান করে দিই। এতে ওই পেশোয়ারীরা বাঁধা দিলে আমি ওখানে পুলিশ পাহারা মোতায়ন করেছিলাম। এতে ব্যারিষ্টার সুরবর্দী সাহেব অভিযোগ দায়ের করে-ছিলেন। ওঁর অভিযোগ আমি নাকি একজন হিন্দু মহাসভাইষ্ট]।

এই সুরবর্দী সাহেবকে হ্যালিডে পার্কে প্রায়ই সভা করে সাম্প্রদায়ীক জিগীর তুলতে দেখতাম ও শুনতাম। এর কিছু পরে—গিরীশ পার্কে একশ্রেণীর হিন্দুদের অনুরূপ সভা হয়েছে। কিন্তু এই সাম্প্রদায়ীক জীগীরে তখন জনগণ খুব বেশী আকৃষ্ট হতো না। কিন্তু এই সব সাম্প্রদায়িকতা হতে পুলিশ বাহিনী তখনও সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত থেকেছে। একদিন মহা হাল্লা শুনে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। ওখানে একটা সিনেমা হলের সম্মুখের দেওয়ালে একটা ভারত মাতার বিরাট ছবি টাঙানো ছিল। কিন্তু

ওঁর ছায়া নাকি রাস্তার উল্টোদিকে থাকা মসজিদের উপর পড়েছে। সুরবর্দী সাহেব ওই জনতাকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আমার পরামর্শে ও অনুরোধে সিনেমা হলের মালিক ওই ছবি তুলে নিয়ে ওখানে একটা বিরাট ওঁ লেখা প্রতীক তুলে দিতে রাজী হয়েছিলেন। এই বিবাদটী মীমাংসিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ আমাকে পুরস্কৃত করেছিলেন। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম যে, ভবিষ্যৎ দিনের বিপদ আগত প্রায়।

এইবার—এখন এখানে ১৯৩৪ সনের আরম্ভ হল। এর মধ্যে আমার নেগোশিয়েটেড বিবাহ হয়ে গিয়েছে। ভাব করে বিবাহ করায় বিপদজনক পথে আর পা বাড়াইনি। যেমনটি চেয়েছিলাম তেমনটিই পেয়েছিলাম। কিন্তু এই থানার পরিবেশে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রাত্রে থানাতে বদমাসগুলোকে মেরামত করা হতো। তাদের চিৎকার থানার উপরে কোয়ার্টাসে থাকা ঘরণীদের অসহ্য।

[আশ্চর্য এই যে, ওরা আদালতে মারের জন্য নালিস জানালে কোন কোন হাকিম ওদেরকে বলেছেন—তোমরা গুন্ডামী ও ছিনতাই করবে। তাহলে কি তোমাকে ওরা সন্দেশ খাওয়াবে। এর কারণ ওঁরা বহুবার ওদেরকে ওই একই অপরাধে বিভিন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা অভিযুক্ত হতে দেখেছেন। ওঁদের দুজনের মনি ব্যাগ ছিনতাইও শহরে দুই একবার হয়েছিল।

[এই সব গুন্ডাদের বিরুদ্ধে কেউ প্রকাশ্যে সাক্ষ্য দিতে ভয় পাওয়াতে গভর্ণমেণ্ট 'অধুনা বাতিল' গুন্ডা এ্যাক্ট প্রণীত করেন। এই আইনে ক্যামেরা ট্রায়ালে আসামীদের অবর্তমানে সাক্ষীরা গোপনে সাক্ষী দিয়েছে। এই আইনে ঐ সব অপরাধীদেরকে এহ শহর বা প্রদেশ হতে বহিস্কৃত করা হত। ওরা ঐ হুকুম অমান্য করে শহরে ফিরলে ঐসব জেলা খারিজ (Exturned) গুন্ডাদের তিনবছর সশ্রম কারাদন্ড হয়েছে।]

উপরন্তু এই থানার অপবাদ এই যে, এই থানাতে বহাল অফিসারদের বধুরা বেশীদিন বাঁচে না। এর মধ্যে আমার এক সহকর্মীর রহমন সাহেব তাঁর বিবি জুবেদা বেগমকে হারালেন। ইনচার্জবাবু সত্যেন মুখার্জীর স্ত্রীও আমাদের চোখের সম্মুখে এখানে গত হলেন। তাই বাধ্য না হলে এই থানাতে কোনও অফিসার বদলী হতে চাহেননি।

এই থানার ইঁটগুলোর রন্ধে রন্ধ্রে পাপে ভরা। আমাদের এক বড়সাহেব এককালে এই থানার ইনচার্জ ছিলেন। প্রমোশন পাবার পূর্বে তাঁর স্ত্রীকেও উনি এই থানাতে হারিয়েছিলেন। তাই থানা ভিজিটে এলে উনি এই থানার উপরদিকে কখনও চেয়েও দেখতেন না। উপরন্তু এই থানার পূর্বতন বহু কাহিনী তখনও লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

(১) জনৈক জবরদস্ত একজন থানা ইনচার্জ অতীতে এই থানাতে বহাল ছিলেন। উনি এক দুধর্ষ খুনে দস্যুকে পাকড়াও করে আনলেন। সে ঐদিন সকালে পথে ওঁকে একা পেয়ে বস্তীর মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। অসীম দেহবলে উনি মুক্ত হয়ে থানাতে ফিরে হল্লা বার করে তাকে গ্রেপ্তার করে থানাতে এনেছিলেন। রাত্রে ঐ গুন্ডা

সর্দারকে সিঁড়ীর তলাতে পেড়ে ফেলে তার ভুঁড়ীর উপর দাঁড়িয়ে উনি নৃত্য করাতে তার নাড়ী ভুঁড়ি গুহ্য পথের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসাতে তার ঐখানেই মৃত্যু হয়।

এই সংবাদ পেয়ে ঐ বিভাগের ইংরাজ ডেপুটী সাহেব ওঁকে গ্রেপ্তার করতে এসে দেখলেন যে, ঐ ইনচার্জবাবু তাঁর কোয়াটার্সে হার্টফেল করে মারা গেছেন।

প্রবাদ এই যে ওদের আত্মারা প্রায়ই ওই সিঁড়ির তলাতে এসে কলহ ও দাপাদাপী করে। থানার দুই একজন সিপাহী দুই এক দিন ওই সিঁড়ির তলাতে কলহরত অবস্থাতে ওঁদেরকে নাকি দেখেওছে। তাই রাত্রে অফিসারদের ওই সিঁড়ি বেয়ে নামার কালে বুক দুর দুর করে থাকে।

(২) ওই ঘটনার পরেতে অন্য এক বাছাই করা দুর্ধর্ষ ইনচার্জবাবু এই থানাতে বহাল হয়েছিলেন। ওর এক উপযুক্ত অধীন কর্ম্মী এক রেপ কেসের গুণ্ডাকে একটি থাপ্পড় লাগালেন। কিন্তু ওর হার্টের অসুখ থাকাতে ক্ষণিকেই তার মৃত্যু হলো। ওদিকে ইনচার্জবাবু তখন তার এক গোপন স্থানে। তার একান্ত আর্দ্দালী ছাড়া অন্য কেউ তার ঠিকানা জানে না। ওই আর্দ্দালীর মুখে খবর পেয়ে থানার ঐ বড়বাবু ছুটে এলেন। ওই অপরাধী অফিসারটি তাঁর পায়ে আছড়ে পড়ে কেঁদে বললেন, বড়বাবু আমার ফাঁসী হলে আমার স্ত্রী পুত্রের কি হবে? এতে বড়বাবু একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু—তুমি ভুলে যেওনা যে, ওই মৃত আসামীরও ঐ তোমার মতই স্ত্রী পুত্র রয়েছে। এরপর উনি মুখ ফিরিয়ে অন্য অফিসারদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন। হুম। কে কে এই ঘটনা দেখেছে? ঐ লাসকে একটা মাদুর বা কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখো। কিন্তু ঘটনাটি আসামীর জামীন হতে আসা এক উকিলের সম্মুখেই ঘটেছিল। কিন্তু উকিলবাবু সকলকে আসস্ত করে বলেছিলেন। আমার দিক হতে কোন ভয় নেই। কত মক্কেল আসবে ও চলে যাবে। কিন্তু আপনারা আমার জন্য চিরদিনই থাকবেন।

বড়বাবু এক অনুগত লোকের হ্যাকনি ক্যারেজ ভাড়া করে ওই মৃতের হাতে হাত-কড়ী ও কোমরে দড়ি বেঁধে ঐ গাড়ীতে তুললেন। ওঁর সঙ্গে কয়জন অফিসারও রইল। উনি ডাইরী বইতে ওই আসামীর একটি স্বীকারোক্তিও লিখে ডাইরী ক্লোজ করে বড় সাহেবের অফিসে তা সকালে পাঠানোর জন্য উনি নির্দেশও দিলেন। আসামী তার ঐ বিবৃতিতে দোষ স্বীকার করে বলেছিল যে, সে চোরাই দ্রব্য হাওড়াতে একস্থানে রেখেছে। এক্ষুনি ওখানে পুলিশ না গেলে ওটা অন্যত্র গায়েব হয়ে যাবে। তখন হাওড়া ব্রীজ না হওয়াতে সেখানে ভাসমান সেতু। মধ্যে মধ্যে ওটা খুলে বড় বড় স্টীমারগুলো ওইখান দিয়ে পাশ করানো হতো। ওটা অতরাত্রে কখন খোলা হবে। এই খবরটাও উনি বেরোবার আগে জেনে নিয়ে ছিলেন। এরপর ফিরে এসে তিনি প্রতিবেদন লিখেছিলেন। হাওড়া ব্রীজ বন্ধ থাকাতে ওঁকে একটা নৌকা ভাড়া করতে হয়ে ছিল। কিন্তু মাঝপথে হঠাৎ ঐ আসামী হাতকড়ী সমেত লাফিয়ে গঙ্গায় পড়েছে ও ডুবে গিয়েছে। বহু চেষ্টা করেও তাকে উদ্ধার করা যায় নি। ডক পুলিশকে খবর দেওয়া হইয়াছে।

আরও একটি অদ্ভুত ঘটনাও এককালে ঐ এলাকাতে নাকি ঘটে ছিল। ঐকালে বহু ঘোমটা পরা মাড়বারী মহিলারা ভোর রাত্রে গান গেয়ে গঙ্গা স্নানে যেতেন। জনৈক মহাধনী লম্পট মল্লিকবাবু ঐ সুযোগে প্রতিদিনই ওদের একজনকে ধরে একটা খালি ত্রিতল বাটীর মধ্যে টেনে নিয়ে তাকে বলাৎকার করেছে। ঐরূপ তিনটি ঘটনার পর ঐ গঙ্গা স্নানার্থিনীদের সংখ্যা কমে। কিন্তু চোখের জল ফেললেও লজ্জা এড়াতে ওরা ওইসব বাড়ীতে বা থানাতে জানাতেন না।

ঐ সময়ও এক দুর্ধর্ষ থানাদার এই থানাতে বহাল ছিলেন। উনি ও ওর দল বল সাড়ী পরে কেউ পর্দা ঢাকা রিক্সাতে ও কেউ ঘোমটা পরে পদব্রজে ওই ভোর রাত্রে ওইখানে গিয়েছিলেন। মল্লিকবাবু যথারীতি ওদের পিছন থেকে এক বালিকাকে ধরে টেনে ওই খালি ত্রিতল বাড়ীতে নেওয়া মাত্র ওরা সকলে সেখানে ঢুকে মল্লিক বাবুকে ধরলেন। ওই মেয়েটিকে ওখান হতে যেতে দেওয়া হল—কারণ আদালতে মামলা রজু করলে ওই মামলা নাও টিকতে পারে। এরপর সকলে মিলে মল্লিকবাবুকে ঐ বাড়ির ছাদে নিয়ে গিয়েছিল।

ইনচার্জবাবু এবার তাঁর এক জুনিয়ারকে হুকুম দিলেন, 'ওহে! এবার একে ছাদ হতে নীচে ফেলে দাও। কিন্তু ওই জুনিদার অফিসর এতে রাজী না হওয়ায় উনি অন্য এক অফিসারকে বলেছিলেন। সিংজী, ওতো পারবে না। তুমি তাহলে এটি করো। এতে বহু সতী লক্ষীদের চোখের জল মুছবে। তুমি তাদের আশীর্বাদও পাবে। সিংজী এতে এগিয়ে এসে ওঁকে তুলে নীচে ফেলে দিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। চোর চোর, নীচে লাফালো, ও পালালো, ঐ পতনের আওয়াজে তখন বহু লোকজন তখন ওখানে জড় হয়েছে। তাদেরকে'ও ওই রূপই ওরা বুঝালেন।

এরমধ্যে ওঁদের একজন ওর থেঁথলে যাওয়া দেহটা তুলে ভিতরে এনে দয়া পরবশ হয়ে তার মুখে জল দিচ্ছিল। এটা জেনে ইনচার্জবাবু ভিতরে এসে ঐ অফিসারকে বলেছিনেন, উহুঁ! অমন কাজও করবেন না। ও হাঁ করতে পারলেই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

এইরূপ বহু পূর্বযুগের ঘটনা সেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময় হতে নাকি এই থানাতে ঘটেছিল। এরা ছিলেন তখন শিষ্টের পালক ও দুষ্ট লোকের যম। তবে এইগুলির সবটুকু সত্য ছিলনা। এই সব বহু প্রবাদ খটনা আমার স্ত্রী শুনেন ও আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি তাঁকে তাঁদের ল্যান্সেডাউন রোডের পিতৃগৃহতে পাঠাতে চাইলাম। কিন্তু উনি কিছু তেই এই পাপ পুরীতে আমাকে রেখে অর্থাৎ আমাকে ছেড়ে অন্যত্র কিছুতেই যেতে চাইলেন না।

পাশের গলিতে থানার একটি বড় গেট ছিল। ওটি এখানকার এই থানা বাড়ীতে বিবাহ হলে বা কাউর মৃত্যু হলে খোলা হয়। তাই ঐ গেট খোলা দেখা মাত্র প্রতিবেশীরা আতঙ্কিত হয়ে তাদের বারন্দাতে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এর পর আরও একবার ওই গেটটা খোলা হয়েছে।

আমার জ্যেঠা মশাই রায় বাহাদুর কালিসদয় ঘোষাল উপদেশ দিয়ে ছিলেন। ইচ্ছা করে বদলী হওনা। পর নারী হতে দূরে থেকো। উৎকোচ কখনও গ্রহণ করো না। কিন্তু ওঁর ওই প্রথম উপদেশটী এবার অমান্য করতে হলো। আমি অন্য থানাতে বদলী হবার জন্য আবেদন পাঠালাম। বহু দালাল কিছু উকিল ও গুন্ডার দল ও দুই একজন স্থানীয় মোড়লও এটাই চাইছিল। আমি ওখান হতে বিদায় হলে রাম বাগানের বেশ্যা পল্লীর কিছু লোক পূর্বোক্ত একটা গান প্রায়ই গেয়েছে।

এই বেশ্যাদের আমি পুলিশের, গুণ্ডাদের ও উকিলের উৎপীড়ন হতে রক্ষা করে-ছিলাম। তাদেরকে ওদের অর্থদানের বাধ্য হতে হতো না। ওদের লজ্জাকর আয়ের বড় ভাগ ওরা নিতে পারেনি। সে কতদিনের কত পুরানো কথা। এরপর বহু বহু বৎসর অতিবাহিত। ঐ থানার সম্মুখের রাস্তাদিয়ে যাবার কালে থমকে দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে ঐ থানাকে উদ্দেশ্য করে বলেছি। বন্ধু, চিনতে পারো। একদিন তুমি তোমার স্নিগ্ধ ক্রোড়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে। তুমি দিয়েছো আমাকে বহু বহু অভিজ্ঞতা ও আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার বহু বহু উপকরণ। এইজন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমাকে দেবার মত আমার কিছুই নেই। ওই জোড়াসাঁকো থানাটি আজও তেমনিভাবে সেই একই স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এই দীর্ঘ অতীতের মধ্যে আরও কত অতিথি জোড়াসাঁকো থানাতে গিয়েছেন ও সেখান হতে ফিরে এসেছেন। এখন যাঁরা ওখানে রয়েছেন তাঁদের আমি সর্বান্তকরণে মঙ্গল কামনা করি। এই নূতন যুগের আগমনে তারা এখন সুখেই থাকবেন। ওই থানাটিকে আজ আর কেউ পূর্বের মত বউ মরা বা বউ মারা থানা বলবে না।

এই থানাতে থাকা কালে আরও যেসব ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি অবলম্বনে আমি অন্ধকারের দেশ এবং অধস্তন পৃথিবী নামে দুইখানি ক্রাইম উপন্যাস লিখেছি।

এই সময় এই এলাকার জুপিটর সিনেমা কাম থিয়েটার হলে আমার লেখা দুইখানি নাটক, পুকুর চুরি ও নীচের সমাজ অভিনীত হয়। উপরন্তু ডঃ সত্য লাহার প্রকৃতি নামক পত্রিকাতে বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও ভারতবর্ষে কয়েকটি কাহিনী আমি লিখেছিলাম।

ওদিকে আমার পুলিশী গুরু সত্যেন বাবুও গোয়েন্দা বিভাগে বদলি হয়ে গেলেন। লোকেরা বলেছে যে, আমি ওর মতবাদের প্রতিক এবং সৎ গুণের অধিকারী।

না আর এখানে না। আমাকে শ্যামপুকুর থানাতে বদলী রদ করার জন্য স্থানীয় ভদ্র জনগণ কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত পাঠিয়ে ছিলেন। ওদিকে—রাম বাগানের বেশ্যা-পল্লীর মেয়েরা এই খবর শুনে কেঁদে ছিল। ওই অঞ্চলে এখনও আমি পুরুষানুক্রমিক একটি প্রবাদ পুরুষ। একথা ওখানে যাতায়াত করা বহুজন আজও আমাকে শুনিয়ে যাচ্ছে। আমার পূর্বের অন্য এক অফিসার ওদের ওই বেশ্যা পল্লীর চার্জে ছিলেন। তাঁর উৎপাতে অস্থীর হয়ে ওরা কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত পাঠালে তাকে বড়বাজারের থানাতে বদলী করে আমাকে ওঁর স্থলে আনা হয়।

এই দিন বদলীর পাকা হুকুম এল যে, আমাকে শ্যামপুকুর থানাতে জয়েন করতে হবে। কিন্তু পর দিনই ফের অন্য এক হুকুমে আমার এই বদলি কিছু দিনের জন্য মুলতুক রাখা হয়েছিল।

পুলিশে এ সময়ে দলবাজী ওদলবন্ধী করতে দেওয়া হতো না। পুলিশে তখন ফৌজী ডিসিপ্লীন পুরাপুরি থেকেছে। জোটবন্ধী বা গোষ্ঠি বন্ধী তখন পুলিশে বরখাস্ত যোগ্য অপরাধ। এই ক্ষেত্রে তাদের দল ভাঙ্গতে তাদের দূর দূর স্থানে ধীরে ধীরে বদলী করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ থানা হতে নথীপত্রে বদলী হবার পর কয়েকটি কাজ শেষ করার জন্য ওখানে আমাকে আরও কয়েক সপ্তাহ থাকতে হলো।

আমার বদলী রুখতে জনগণের নিকট হতে মাস্-পিটিশন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো ফের হয়েছে। ঠাকুর বাড়ীর প্রধান ম্যানেজার নিজে এজন্য কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। পরিশেষে রাম বাগানের বেশ্যা নারীরাও তাদের আঁকা বাঁকা দস্তখত সমেত এক দরখাস্ত লালবাজারে পাঠালে ওনারা স্তম্ভিত হলেন। আমার এই জনপ্রিয়তা দেখে কর্ত্তৃপক্ষ অবাক। পুলিশি ইতিহাসে এর কোন পূর্ব্বতন নজীর নেই। হেডকোয়াটারসের ডেপুটি এটাকে একটা চিফ্ পপুলারীটি আখ্যা দিয়ে আমার বিরুদ্ধে একটা মন্তব্য রাখলেন। কিন্তু খোদ কমিশনার কলসন সাহেব তাঁর নোটে লিখলেন। এর এই পপুলারীটিকে প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেতে পারবে। ওকে ভোকাল পাবলিকদের শান্ত করতে আমরা লাগাতে পারবো। ওকে এক্ষুণি ওখান হতে বদলী করা ঠিক হবে না। এতে পাবলিক কমোশন হতে পারে। তবে বেশী দিন ওকে এখানে রাখাও কখনও উচিত নয়। লেট হিম স্টে দেয়ার ওনলি ফর এ মান্হ। বাট কিপ হিম্ আন্ডার কিন ওয়াচ।

কিন্তু—ঐ দিনের ঘটনাতে মহম্মদ মহসীন এবং অন্যদেরকে বিভিন্ন থানাতে ও অফিসে বদলী করে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই থানার কোয়াটারস তাদেরকে ভোকেট করতে বলা হলো, অফিসারদের মত তাদের স্ত্রীদেরকে সেপারেট করা তখন তাদের প্রয়োজন হয়েছিল। এর ফলে বহুকাল এদের বিরাগ এড়াতে অমেরা কয়জন পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও করতে পারতাম না।

আমি যে আন্ডার ওয়াচ তাও একদিন বুঝতে পারলাম। আনন্দ বাজার পত্রিকা অফিসটা তখন থানার নিকট বর্ম্মন স্ট্রীটে। ওখানে আমার কয়জন সাহিত্যিক বন্ধু কাজ করে। ওদের সঙ্গে কয়েকদিন আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম, ওই পত্রিকাতে আমি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লিখেছিলাম। সেই খবরও তাদের নিকট পেঁছেও ছিল। একদিন এক উর্দ্ধতন কর্মী আমাকে ডেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। ওহে তোমার সঙ্গে ওই কাগজওয়ালাদের আলাপ আছে। ওদের সঙ্গে আরও একটু আলাপ রেখো। ওখানে—আমাদের বিরুদ্ধে কি লিখছে বা কি লিখবে ওই বিষয় একটু একটু খবর আমাকে জানাবে।

[কিন্তু আনন্দবাজারের লোকেরা আমার সঙ্গে কথা বলতো, কিন্তু তা সত্বেও আমাকে বিশ্বাস করতো না। বরং তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য গোপন রেখে আমার কাছ হতে খবর সংগ্রহ করতে চাইতো।]

আমাকে ওই থানাতে না রাখার বিষয়ও ততদিন বুঝতে পেরেছিলাম, হঠাৎ অন্য থানা হতে একজন অফিসারকে এই থানাতে বদলী করে আমার অধীনে 'আন্ডার ট্রেনিং' রাখা হলো। এই প্রথাটি কলকাতায় প্রথম প্রবর্তিত হলো। কারণ গুন্ডা দমনে ও মামলা ডিটেকসনে আমি নূতনত্ব এনে ছিলাম। উপরন্তু—বেশ্যা পল্লীতে শান্তি রক্ষার বিষয়ে তখন আমি একজন পথিকৃত রূপে স্বীকৃত। আমার ওখানে থাকা কালে একটিও প্রসটিটিউট ড্রাগীঙ বা মার্ডার বা ছিনতাই ওখানে হয়নি। যাইহোক। আমার স্থানে পাঠানো ছেলেটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। ঐ

ছেলেটি আমারই মত উইলিং অফিসার তো বটেই। ওপরন্তু সে এতটুকুও কাজকর্মে স্নার্কার বা বার্কার নয়।

আমি এই সময় প্রথম অপরাধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে নীরবে গবেষণা করতে আরম্ভ করেছি। ডঃ গীরিন্দ্র শেখর বোস তখন সবে কলকাতার য়ুনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েছেন। ওঁর কাছে আমি বেছে বেছে বহু পাকাপোক্ত পকেটমার ও সিঁদেল চোরদেরকে নিয়ে যাই ও তাদের উপর মানসিক ও যান্ত্রিক পরীক্ষা করতে থাকি। ডঃ গীরিন বোস এ বিষয়ে সানন্দে আমাকে সাহায্য করেছিলেন।

এই সময়—উনি আমাকে বেশ্যানারীদের ও তাদের উপপতিদের উপর কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার বিষয়বস্তু বলেছিলেন। আমাকে শীঘ্রই এই থানা ছেড়ে যেতে হবে। তাই এই দিকে আমাকে বেশী মন দিতে হল।

আমার সহকারী ছেলেটি বেশী দিন জীবিত থাকলে সেই আমার স্থান নিতে পারতো। তাকে আমি পিক পকেটের বিভিন্ন দল ও তাদের পৃথক এলাকাগুলো তাকে আমি চিনালাম, ও বললাম যে, এদের এক এক দল এক এক স্থানে কাজ করে। এদের এলাকাতে অন্যেরা কাজ করলে এদের মধ্যে কলহ হয়। এদের কোন দলের সঙ্গে কোন দলের শত্রুতা, তা তাকে ধারণা দিলাম ও বললাম যে, এই এলাকাতে পকেটমারী হলে তুমি ওই এলাকার দলকে খুঁজবে। এবং তুমি ওই দলের সাহায্য নেবে। এদের প্রত্যেক দলের একজন পৃথক ওস্তাদ অর্থাৎ নেতা আছে। উপরন্তু ওরা অপরাধ করার কালে একতা দেখালেও ওরা দ্রব্যের ভাগবাটোয়ারা কালেই কলহরত হয়ে থাকে। ওই ছেলেটিকে আমি সঙ্গে করে ওদের পৃথক পৃথক ডেরা অর্থাৎ মুভিং অফিসগুলোও চিনিয়ে দিয়েছিলাম। কোন কোন দল কিরূপ পদ্ধতিতে কাম উম করে এবং কোন দলের খাউরা অর্থাৎ বামাল গ্রাহকেরা কোথায় কোথায় থাকে ও কিভাবে কোথা হতে ওদের দলগুলিকে ও তাদের লোকদেরকে চিনতে ও খুঁজতে হয় তাও তাকে আমি বুঝিয়ে দিলাম।

এই পিকপকেট ছাড়া সিঁদেল চোরদের বিষয়ও তাকে আমি ওয়াকিবহাল করে দিয়েছিলাম। ওদের চোখের চাহনী ও চক্ষুপত্রের উত্থান পতন ও ঠোটের বাঁক ও কথার মাত্রা হতে কিরূপ পুরোনো পাপীদের চিনতে হয় তাও আমি তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই অবল-প্রয়োগী চোর ছাঁচোরদের এবং বল-প্রয়োগী খুনেদের ও ছিনতাইকারীদের প্রভেদ বুঝতে পারছিল না। ওকে আমাকে সরজমীনে দেখাতে হয়েছিল যে, অবল প্রয়োগী চোররা কিরূপ গোড়ালীর উপর চেপে ও বলপ্রয়োগী খুনেরা পায়ের আঙ্গুলে ভর করে ডিঙ্গি মেরে চলে থাকে। উপরন্তু—ওই অফিসারটি এক লহমাতে দেখে কোন সুটেড বুটেড লোক ইন্সিউরেন্স এজেন্ট, বা বড় কোন অফিসর বা সে একজন ভ্যাগাবন্ড বা প্রবঞ্চক তা বুঝার বিষয় সে শিখতে পারেনি। এইজন্য—একদিন সে রামবাগান বেশ্যা-পল্লীতে একাকী ডিউটি দিতে গিয়ে একটা কেলেংকারী করে বসেছিল। উনি একদিন এক মহাধনী ও প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মাতলামীর অপরাধে অপমান করলেন। উনি ওই অফিসরকে বলেছিলেন—"মাতলামী এখানে না করে কি ঐ কাজ

কালীবাড়ীতে গিয়ে করবো। এতেই ওই তরুণ কর্মীটি ক্ষেপে গিয়ে তাকে অপমান করেছিলেন।

[অন্য একদিন উনি এক বিখ্যাত নটকে তার গাড়ী হতে টিপসী অবস্থাতে নামার কালে তাকে চ্যালেঞ্জ করলে উনি বলেছিলেন, 'খবরদার হাম আলমগীর হ্যায়', কিন্তু উনি ও'কে না চিনে তাঁকে তার প্রাপ্য সম্মান দেননি। এজন্য ওর সঙ্গে আমাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। অন্য একদিন উনি 'উদয় সিংহ' নাটকের নামকরা অভিনেতা অমুকবাবু মদমত্ত অবস্থাতে তার এক বন্ধুর দিকে পেন নাইফ উ'চিয়ে বলেছিলেন, 'বল শালা, উদয় কোথায় ?' এটা দিল্লাগী না বুঝে উনি ওকে গ্রেপ্তার করেছিলেন।]

এইসব বেশ্যানারীদেরকে আমি নিজেই সংঘবন্ধ করে ওদের অধিকার বিষয়ে সচেতন সচেতন করেছি। তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ওরা এখন প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে ভয় পায় না।

আমি ও'র এইসব ব্যাপারগুলি অতিকষ্টে মিটমাট করতে পেরেছিলাম। এরপর— ওকে কোন গলিতে কোন কোন মানী গুণী ও ধনী ও ক্ষমতাসীনদের কোন কোন ডুপ্লিকেট ওয়াইফরা থাকেন বা আছেন—সেই বিষয় তাকে বুঝিয়ে বলে তাকে এই বিষয়ে কিছুটা পাকাপোক্ত করেদিলাম।

এই অফিসারের এই সব ত্র'টিতে এই পাড়ার বহু স্থানীয় ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ মুখর হয়ে উঠাতে আমি চিন্তিত হলাম। কারণ—যে স্ট্যান্ডার্ড ও অধিকার বোধ আমি এদের মধ্যে এনে দিয়েছি তা হতে এখন সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে এরা অভিযোগ মুখোর হবেই।

এক গৃহ-কর্তার অভিযোগ, এই পাড়ার এক গৃহস্থ বাড়ীতে আসার কালে তাদের জামাতাকে ই'নি ধমকেছেন। উনি না বুঝে অমুক বেশ্যানারীর চাকরকে গ্রেপ্তার করেছেন। অমুক স্থানীয় ব্যক্তির মামাকে উনি ধাক্কা দিয়ে এই স্থান ত্যাগ করতে বলেছেন। অমুক বেশ্যানারীকে উনি ১২নং থেকে ১৬নং যেতে দেননি।

এইজন্য আমি একটা নিয়ম স্থানীয় লোকদের সম্মতিতে ওখানে চালু করে দিয়েছিলাম। ঠিক হলো এই যে, রাত্রে এখানকার স্থানীয় লোকেরা জলন্ত লন্ঠন নিয়ে পথে বেরুবে। তাহলে পুলিশ বুঝতে পারবে যে এরা স্থানীয় লোক। আমার প্রবর্তিত এই রীতিটা কর্তৃপক্ষও সমর্থন করেছিলেন।

আমার অধীন এই তরুণ শিক্ষানবীশটিকে আমি এখানকার কাযগুলির জন্য নিযুক্ত রেখে আমি ডঃ গীরিন্দ্র শেখর বসুর নির্দেশিত পন্থাতে এই পাড়ার নারীদের উপর কিছু গবেষণাতে মন দিয়েছিলাম। এই গবেষণার বিষয়টি ছিল কলার-থেরাপি অর্থাৎ বর্ণালি চিকিৎসা। এই বিষয়ে কিছুটা ধারণা আমি এখানে দেব। এতে বিবাহিত পাঠক পাঠিকাদের কিছুটা উপকার হবে।

মেনকা নামা ও হাল্কা গৌর বর্ণের এক অষ্টাদশী নারী তার ১২ নম্বরের বাড়ীর ঘর লালরঙের করে তাতে লাল আলোর বাল্ফ জ্বালিয়েছে। সে নিজেও ওই রঙের সঙ্গে ম্যাচ করে লাল রঙের সাড়ী ও ব্লাউজ পরেছে। ওতে তার ধনী উপপতী বাবুটী অত্যন্ত এ্যাগ্রেসীভ হয়েছে এবং ঐ নারীও তাতে অত্যন্ত উত্তেজিত থেকেছে। সারারাত ওদের ঘর হুল্লোড় ও দাপাদাপি চলেছে। ভোরেতে ওর ওই উপপতি নির্লজ্জ ভাবে চিৎকার করে তার ড্রাইভারকে ডেকেছে ও তাকে নিয়ে বাড়ী ফিরতে বলেছে।

কিন্তু ১০ নম্বর বাড়ীর বিমলা নামের উজ্জল শ্যামবর্ণ অষ্টাদশী মেয়েটী তার বাড়ীর ঘরের দেওয়াল গোলাপী রঙে রঙিয়ে তাতে গোলাপী আলোর বাল্ব জ্বালাতো। সে নিজেও ওই গোলাপী রঙের সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে গোলাপী রঙের শাড়ী ও ব্লাউজ ব্যবহার করেছে। ঐ বিমলা নামে নারীটী ও তার উপপতি ঠিক স্বামী স্ত্রীর মত নীরবে সেখানে রাত্রি যাপন করেছে। ভোরেতে উঠে ওর ঐ বাবুটি নীরবে ও সলজ্জ ভাবে নীচে নেমে এসে মৃদু স্বরে তার ড্রাইভারকে তাকে নিয়ে বাড়ী ফিরতে বলেছে।

[কিন্তু দিবাকালে আমি মেনকা নামের নারীকে শান্ত স্বাভাব ও ওইবিমল নামের মেয়েটিকে মুখরা দেখেছি।]

সকালে মেনকাকে আমি তাদের বারান্ডাতে তার লাল রঙের ছিন্ন ভিন্ন হওয়া শাড়ী ও ব্লাউজ একটা টুলে বসে সেলাই করতে এবং বিমলাকে তার শাড়ী ও ব্লাউজ বারন্ডাতে শুখুতে দিতে দেখতাম। কিন্তু তাতে কোন ছেড়া কাটা বাফাটা দেখিনি। মেয়ে দুটি আমাকে অভিধানীক অর্থেই দাদা বলে ডাকতো। ও সেইমত ভক্তি করতো। আরও কিছু কাল এই থানাতে থাকতে পারলে আমি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার্থে তাদেরকে তাদের ঘরের রঙ ও সাড়ীর রঙ বদল করতে অনুরোধ করতাম। ও দেখতাম যে তাতে তাদের ওপপতিদের এই স্বভাব বদল হচ্ছে কিনা। আমার এই বিপথ গামীনী ভগিন্বয় [sin-soaked] এত সৎ ছিল যে, তারা প্রতি সন্ধ্যাতে তাদের স্ব স্ব উপপতিদের কল্যাণের জন্য মাথার সিঁথিতে সিঁদুর পরতো।

[সকালে মেনকার গালে ও ঠোঁটে কয়েকটি স্থানে আয়োডিন মাখানো তুলো দেখা গিয়েছে। কিন্তু বিমলার ঠোঁটে লিপস্টিকের লালরঙ মাত্র দুই স্থানে উঠানো দেখা গেলেও তার মুখে কোন দাঁতের বা নোখের দাগ বা অন্য কোন ক্ষতদেখা যায়নি। ওর মুখটা বরং পূর্বের মতই তুলতুলে ও ঢলঢলে দেখা গিয়েছে।]

এদের এই বিষয়টী থেকে আমি কলার খেরাপী বিষয়ে আকৃষ্ট হই। এই বিষয়ে আমার দুইজন বিবাহিত বন্ধুকে নিজেদের উপর এইরূপ পরীক্ষা করে এবিষয়ে তাদের অনুভুতি আমাকে জানাতে বলেছিলাম। এমানেও—দেখা গেল যে, শয়ন কক্ষের দেওয়াল নীলাভ বা সবুজ করে তাতে ওইরঙের আলোক জ্বালালে পত্নীরা স্বামীদের বাধ্য ও বশংবদ হয়। কিন্তু ওইসব শয়ন কক্ষের রঙ অরেঞ্জ বা ডীপ ব্লু রঙের করে তাতে ঐ রঙের আলোক জ্বালালে স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের বাধ্য ও বংশবদ হবে।

[গাড় লাল ক্রোধ ও কম লাল রঙ, ঘৃণা এনেছে। সবুজ ও ভায়োলেট রঙ ইমপোটেন্সীর অব্যর্থ ঔষধ। ওঁদের বধুরা ওই রঙের শাড়ী ও ব্লাউজ পরুণ। হাল্কা ভায়লেট রঙ অপরাধ ইচ্ছা এবং যৌনজ স্পৃহার এবং হাল্কা সবুজরঙ সৎ প্রেরণা ও যৌনজ সংযম এনেছে।

(ক) [রেস্তারাঁ গুলিতে আমি এই সময় লক্ষ্য করি যে, কম আলোকে লোকে ওখানে বেশীক্ষণ থেকেছে। বেশী খাদ্য খেয়েছে ও মৃদু স্বরে বেশী কথা বার্ত্তা কয়েছে। কিন্তু ওখানে তীব্র আলোক থাকলে ওরা কম সময় থেকেছে। কম খাদ্য খেয়েছে ও কমকথা উচ্চস্বরে বলেছে।

লড়াকু লোকেরা আলোর ঠিক নীচে এবং শান্ত প্রকৃতির লোকেরা আলোক হতে দূরে আসন গ্রহণ করেছে।]

এতদিনে ওখানে কিছু বাবুদের অর্থানুকুল্যে আমার সাহায্যে বেশ্যাপল্লীর ছেলে মেয়েদের জন্য ক্লিনিক সেণ্টার গড়ে ওঠেছিল। ওইখানে আমি কলার থেরাপীর একটা দিকের বিষয় পরীক্ষা করেছিলাম। ওখানে দেওয়াল ও আলোক, লাল রঙের করলে ছেলেমেয়েরা এগ্রেসিভ আলোতে অবাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওদেরকে কিছুকাল গোলাপী রঙের ঘরে গোলাপী আলোতে রাখলে তারা বাধ্য, অনুগত ও মেধাবী হয়েছে, তবে এইসব পরীক্ষাজাত ফল পেতে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়ে থাকে।

কোন বেশ্যা নারীর ঘরে তীব্র আলো থাকলে তাদের বাবুরা সেখানে কম সময় থাকে বটে, কিন্তু ওরা তাতে অত্যন্ত অ্যাগ্রেসিভ হয়ে ওঠে। ওই ঘরের আলো হলে ওরা বহুক্ষণ থেকেছে এবং ব্যবহারে শান্তভাব দেখিয়েছে।

[বিঃ দ্রঃ—এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অবশ্য আমি বহুপরে এই বিষয়ে পড়াশুনা করে জেনেছিলাম ও তা বুঝেছিলাম। সেই সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা উচিত হবে।

"মানুষের চক্ষের রেটিনার পিছনেতে কিছু কোমস (comes) নামক স্পর্শকাতর (Sensitive) বর্ণালী কোষ (Colour cells) রয়েছে। এই বর্ণালী কোষের সাহায্যে অন্য বহু দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসার মত অপরাধ চিকিৎসাতেও লাভ করা গিয়েছে। চক্ষু কোনও বর্ণ অর্থাৎ রঙ দেখলে ওই কোমস নামক কোশগুলি তৎ তৎ বর্ণমত বিভিন্ন রূপরেখা সংকেত ব্রেণের বিভিন্ন বোধস্থান গুলিতে পাঠিয়ে মানুষের ব্যবহার রীতি (Behavioer Pattern) বদলে দিয়ে থাকে।

এর পর আমি কিছু আদি মনোভাবী নারীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজের ল্যাবোরেটারীতে নিয়ে ডঃ গীরিন্দ্র বোসের সাহায্যে যান্ত্রিক পরীক্ষা করে দেখি যে এইসব বেশ্যানারীদের দেহেতে পেইন স্পষ্ট ও হিট স্পট কম। এইজন্য তাদের কষ্ট ও উষ্ণবোধ কম। কিন্তু সেই স্থলে তাদের কোল্টস্পট টাচ্‌স্পট বেশী থাকাতে তজ্জন্য ওদের দেহে স্পর্শবোধ ও শৈত্যবোধ বেশী। কিন্তু সাধারণ স্বাভাবিক মানব মানবীদের ক্ষেত্রে এরূপ উল্টো থেকেছে। এখানে—পুরানো পুরুষ অপরাধী এবং এইসব উৎকট বেশ্যা নারীরা সমগোত্রীয়। এই কষ্টবোধ হীনতার জন্য এইসব আদি স্বভাবী নারীরা প্রতিটি দংশন, খিমচুনিতে ও অন্যান্য নীপিড়ণে কষ্ট না পেয়ে তারা তাতে পায় আনন্দ।

এইসব পরীক্ষাকালে আমার বাল্যকালের একটা ঘটনাও মনে পড়ে গিয়েছিল। তাতে ওই ঘটনারও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমি পেয়ে গিয়েছিলাম।

"আমাদের জমিদারী থাকা কালে আমাদের এক বাগদী প্রজা তার স্ত্রীকে প্রতিদিনই তাড়ি খেয়ে এসে মারধোর করতো। এতে আমর এর প্রতিকার করতে এগুলো ওই আদি মনোভাবী নারীটি আমাদেরকে বলেছিল যে, "তা দাদাবাবু, উনি

আমাকে মারুন। উনি আমাকে না মারলে উনি যে আমাকে ভালোবাসেন তা আমি বুঝবো কি করে?"

এই সময় এদের বিষয় আরও একটা বৈজ্ঞানিক তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এই তথ্যটি ভদ্র পরিবারগুলির বিপথগামী পুত্র কন্যাদের সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এইরূপ পরীক্ষা করার সুযোগ ওই বেশ্যাপল্লীতেই বেশী।

আমি এদের কয়েকজন বাবুর সঙ্গে কথা বলে তাদের সাহায্যে কয়েকটি তীব্র যৌন স্পৃহা অর্থাৎ সেক্সিনারীর সন্ধান পাই। এদের একজনের এক উপপতি ছিল মেধাবী চিকিৎসক। অনুসন্ধানে আমি দেখি ও জানি যে, এইসব নারীরা প্রত্যেকেই মিষ্টি বেশী পরিমাণে খায়। ওই ডাক্তারবাবুর মাধ্যমে আমি জানি যে এদের পিত্তরস কম ক্ষরিত হয়। এইজন্য ওই ডাক্তারবাবু আমার অনুরোধে কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তার ল্যাবোরেটারিতে করেছিলেন।

এতে আমি বুঝতে পারি যে, চিনি খাদ্যজাত দোষ ওদের তিক্ত পিত্তরস দ্বারা বিনষ্ট বা সমীকৃত না হওয়াতেই ওরা এতো সেক্সি অর্থাৎ যৌনস্পৃহী হয়ে থাকে। আমি এও বুঝি যে, তিক্ত ও মিষ্টির উল্টা হওয়াতে এই তিক্ত ওই মিষ্টিকে বিনষ্ট করেছে। এই বিষয়ে আমি আরও অনুসন্ধান করে স্থির সিদ্ধান্তে আসি যে, যাদের দেহে পিত্তরস কম ক্ষরিত হয় তারা মিষ্টি খেলেই—ছেলেদের ক্ষেত্রে অপরাধ স্পৃহা ও মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌনস্পৃহা বাড়বেই। এতে এদেরকে প্রচুর তিক্ত পাতার রস প্রতিদিন খাওয়ালেই নিরাময় করা যাবে।

[বিঃ দ্রঃ—তেতো নালরসে মিশে তিক্তরস টাইমোলিন নামে একটা রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে যা শর্করা জাতীয় পদার্থকে নিমেষে বিনষ্ট করে। এই তেতো খাইয়ে আমি তাতে বহু তরুণ তরুণীর প্রেমরোগ নিরাময় করতে পেরেছিলাম।]

এই সম্বন্ধে আমি একটা দীর্ঘ থিসিসও লিখেছিলাম। কিন্তু এটা আমি কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্বগুলির মত পাঠাতে সাহস করিনি।

এসময় এই থানার এলাকাতে অন্য একটি ঘটনা ঘটলো। শ্রী শম্ভু ব্যানার্জী যিনি পরে I A S এবং বিহ্যাবিলেটেসন কমিশনর হয়েছিলেন। তিনি ভবানীপুরে মিত্র ইনিষ্টিটিউসনে আমার সহপাঠি ছিলেন। এর এক ভ্রাতা যিনি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান তার কলেজস্ট্রীটে পকেট মারা গেল। তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রমথ ব্যানার্জী তখন ল কলেজের প্রিন্সিপাল। তাঁর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ওতে খোয়া যায়।

[ভবানীপুর মিত্র ইনিষ্টিটিউসন একটি 'লাকি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উত্তরকালে এখান হতে পাশ করে বেরানো ছাত্ররা প্রায়ই দিকপাল হয়েছে। রমাপ্রসাদ মুখার্জী ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। আমার নিজের সহপাঠিরাও এক একজন জজ বা অনুরূপ কিছু। শুরু করেছে যারা নিম্নপদে তারাও আমাদের মত দ্রুত প্রমোশনে সর্বোচ্চ পদী ও নামি হয়েছে। প্রতি

সপ্তাহে ঐ সময় স্যার আশুতোষ নিজে এসে ম্যাট্রিক ক্লাসের প্রতিটি ছাত্রের সঙ্গে কথা বলতেন।

শম্ভু ব্যানার্জী আমাকে ফোনে বললেন, "দেখ চেষ্টা কর। ওই জিনিস উদ্ধার নিশ্চয়ই হবে না। আমি তক্ষুণি ওই এলাকার পকেটমার সর্দার মোজেস মিয়াঁকে ডাকলাম। এই ভদ্রলোক একজন ইহুদী মুসলীম। টকটকে গাত্রবর্ণ। এজন্য উনি সুট পরে ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসে উঠে ইংরাজ সাহেবদের পকেট কাটেন।

মোজেজ মিয়াঁ, এসে বললেন, আজ্ঞে উনি আপনার বন্ধু? এছাড়া এতো ছোট একটা কাজ আমার দলের লোক করাতে আমি লজ্জিত। ওকে আমি এজন্য কয়েকটা গাঁট্টাও দিয়েছি। ওর ভালো করে শিখছা কিছুই হয়নি। ছোকরাকে আমরা কয়েকদিন জেল ঘুরিয়ে আনবো। ছোকরা একেবারে নবীন সাহেব, এর পর মোজেজ মিয়া বামাল সমেত ওই ছোকরাকে আমার হাতে তুলে দিলেন, ছোকরা আদালতে দোষ স্বিকার করে জেলে গুনিদের কাছ হতে শিক্ষা নিতে গেল।

মূল্যবান কাগজ ও একটা সিকিসমেত মানিব্যাগ ফেরৎ এলো, ঘটনার দু' ঘণ্টার মধ্যে রিকভারী হওয়া একটা অভিনব ঘটনা।

এতে আনন্দবাজার কিংবা অমৃতবাজার কোন কাগজ ঠিক মনে নেই। লিখলেন যে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও ধনীদের সামান্য দ্রব্য ও দুঘণ্টার মধ্যে রিকভাড হয়। কিন্তু দরিদ্রের খোয়া জিনিস ওদের বন্ধুরা [পুলিশ] ফেরত দেন না এখনও এই ধারণা।

কিন্তু ওদের এই ধারণা ভুল। পুলিশ কর্মীদের ফরিয়াদিদের দুঃখে দুঃখী হলেই ওদের মধ্যে এই সহানভুতি আসে। এই সহানুভূতি, আমি ওই চোর চোট্টা গুন্ডা ও বেশ্যানারীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছিলাম, নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়। আমি এই কাজ করেছিলাম অপরাধ বিজ্ঞানকে জানার ও পুলিশি দক্ষতা বাড়ানোর জন্য, বিজ্ঞান দেবির সেবার জন্য।

এইজন্য মিথ্যা দোষারোপ আমার উপর বহু ভাবে হয়েছে। একদিন আমার এক উর্ধ্বতন আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন। "ওহে, কিছু লোকবলে যে তোমার নাকি কোলকাতাতে আঠারো জন বৌদি। দুইশ দিদি ও ষোলশ ছোট বোন রয়েছে। এর উত্তরে আমি তাকে বলেছিলাম, স্যার ওরা আমাকে হিংসে করছে কেন? ওরা কি ও থেকে ভাগ নিতে চায়। ওরা নিজেরা নিজেদের জন্য ওদের জোগার করছে না কেন? আমার এই কথাতে উনি আমার বিষয়ে লেখা উড়োচিঠি আমাকে দেখালেন।

এমনি ভাবে আমি নিজের আইডেলিজিম মত কাজ করে ও জনগণের সত্যকার সেবা করে প্রতিদিনই শত্রু বৃদ্ধি করে চলেছিলাম। সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ থাকতে হলে এগুলো সহ্য করতেই হবে, তাই আমাকে এখানে একই সাথে দুইটি ফ্রণ্টে লড়তে হয়েছিল।

[তবে হ্যাঁ উত্তর কালে আমি সাবধানে ও খুব আলগোছা ভাবে কিছু বিভিন্ন শ্রেণীর ভদ্রকন্যাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছিলাম। কিন্তু তা আমি করেছিলাম

নারী দুজ্ঞের মনকে বুঝতে ও জানতে। অপরাধ বিজ্ঞানের যৌনজ অপরাধের গবেষণার জন্য এর প্রয়োজন হয়েছিল।]

কিন্তু এইদিন ওই উর্ধ্বতনের নিকট পাঠানো উড়ো চিঠি গুলো দেখার পর দিন হতেই বেনামি পত্র বিষয়ে আমি গবেষণা আরম্ভ করেছিলাম। ওই গুলির প্রেরকদেরকে খুঁজে বার করবার জন্য আমি কয়েকটি ফরমুলা অর্থাৎ মৌল সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। [মৎ প্রণীত অঃ বিঃ পুস্তক দ্রঃ] ওই ফরমুলা মত তদন্ত করলে আজও প্রতিটি বেনামী পত্রের প্রেরককে সহজে খুঁজে বার করা যেতে পারে।

আমি কিছুদিন রামবাগানের গায়ীকা ইন্দুবালা দেবীর ও অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র [কানা কেষ্ট] সাহায্যে মিউজিক্যাল থেরাপী সম্বন্ধে গবেষণা করি ও জানি যে, যেকোন দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি বিভিন্ন কমবেশী সুরঝঙ্কার দ্বারা নিরাময় করা সম্ভব।]

কিছুদিন পরে এমন একটা ঘটনা এই এলাকাতে ঘটলো যার জন্য এই থানাতে আমার পক্ষে নিরাপদ থাকেনি।

এখন যেস্থানে মহাজাতি সদন নির্ম্মিত হয়েছে, ঐ স্থানটি একটি খোলা মাঠ ছিল। আমি সিমলা ব্যায়াম সমিতির অনুরোধ ওখানে একটা কুস্তীর আখড়া স্থাপনে কয়েকজন তরুণকে সাহায্য করি। ওখানে দেশয়ালী পালোয়ানদের সংখ্যা বেশী ছিল। ওরা ওখানে এককী হনুমানজীর মুর্ত্তিস্থাপন করে ঢাক ঢোল কাঁসী বাজিয়ে পূজা শুরু করল। উপরন্তু বহু হিন্দু মল্লবীরের আবির্ভাব হলো।

ওই স্থানের বিশেষ করে কলাবাগানের মুশ্লিম মস্তানরা দেখলো যে, তাদের মস্তানীতে একচোটিয়া অধিকার আর থাকছে না। উভয় পক্ষে বেধে গেল মারপিঠ। মুশ্লীমরা আখড়া চড়াও হয়ে হনুমানজীর মূর্তি সরাতে চাইল। এজন্য বহু মস্তান আমদানী করল। তাই বেশির ভাগই মুশ্লিম মস্তান গ্রেফতার হল। কারণ তখন হিন্দু মস্তানরা ওখানে কেউ ছিল না।

এই সময় কংগ্রেসেও পরিবর্ত্তন কামী ও পরিবর্ত্তন বিরোধী এই দুই এর বিরোধ তখনও তুঙ্গে। সে সুযোগে ব্রিটীশ এজেন্টরা কিছু মুশ্লীম নেতাদের সাহায্যে মুশ্লীম লিগকে শক্তিশালী করেছিলেন।

সুরাবর্দী সাহেবের নেতৃত্বে গর্ভনমেণ্টের নিকট আমার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন পাঠানো হলো। রাইটাসের একজন এ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারীর ফোনে তক্ষুনি শুনেছিলাম। উনি আমাকে স্নেহ করতেন। ওর খবর এই যে ওই প্রতিবেদনে আমাকেই আসামী করেছে। আমি প্রথম আত্মরক্ষার এক অবিনব পন্হা বের করেছিলাম। আমি তক্ষুনি থানার এলাকা ঘুরে ঘুরে কয়েকজন ফুটপাত অবরোধকারী দেশয়ালী হিন্দুকে পাকড়ালাম। ওরা এক ঠাকুরের সামনে ফুটপাতে মাদুর পেতে বসে ভজন করছিল। ওদের জন চৌদ্দ লোককে থানাতে আনলাম। এখানে সিরিয়াস মামলা আনলে তা ডিফেন্ডড হবে। কিন্তু পেটী কেসে টাকা জরিমানা বা ওয়ার্নিং এন্ড ডিসর্চাজ হয়। আমি রাস্তা বন্ধ করার অপরাধে চারজন

মুসলীম ও দুজন হিন্দুকে একত্রে এক এক গ্রুপে বেশ কয়েকটি গ্রুপ মামলাতে কেইস লিখলাম, পরদিন যথারীতী অনারারী হাকিম টিকি দেখে দুইজনকে সাবধানকরে মুক্তি দিয়ে বাকী সকলকে আট আনা করে জরিমানা বা ওয়ানড এণ্ড ডিসকারেজ করলেন এতে আমি আত্মপক্ষ সমর্থনে একটা জুডিসিয়াল ডিসিসনের সাহায্য পেলাম।

এক সপ্তাহ পরে গর্ভনমেণ্ট থেকে ওই প্রতিবেদন লালবাজারে এলো সাম্প্রদায়ীকতার মিথ্যা অভিযোগ এনে আমার কৈফিয়ৎ চাওয়া হলো ও বলা হলো—তোমাকে কেন দণ্ড দেওয়া হবে না, তার উপযুক্ত কারণ সাত দিনের মধ্যে আমাকে জানাও।

কিন্তু আমি সাত দিনের জন্য অপেক্ষা করিনি ঐ দিনই আমি ওর উপরে ওদেরকে জানালাম যে, ওরা সকলেই জুডিসিয়ালি কনভিকটেড হয়েছে। ওদের দোষ আদালতে প্রমাণিত। অতএব এ বিষয়ে কোন কৈফিয়ৎ চাওয়াতে কনটেম্পট অফ কোট হবে। এই উত্তর পেয়ে কর্তৃপক্ষ নীরব হলেন। উপরন্তু ওরা দেখলেন যে, মুস্লীমদের মত হিন্দুদেরও আসামী করা হয়েছে। ওতে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব নেই। এজন্য আমাদেরকে ওরা একটা বকশীষও দিলেন।

এর ফলে আমি ক্রশমামলা [Cross Case] সম্পর্কিত একটি নূতন বিষয়ের আবিষ্কার করলাম। অন্য অফিসারও পরেতে এইভাবে আত্মরক্ষা করেছেন। সাম্প্রদায়ীক ভেদনীতির এটা অব্যশ্যম্ভাবী পরিণতি, এই নীতিমত কিছু ক্ষেত্রবিশেষে উভয় পক্ষকে গ্রেফতার করার রীতি চালু হয়।

[বিঃ দ্রঃ—এর বহুপরে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র ওই স্থানে মহাজাতি সদন ভবন নির্ম্মান করেন ওই কুস্তিগীররা ও ব্যায়ামবীররা ওই স্থানের দখল কর্পোরেশনকে প্রথমে দিতে অস্বীকার করে। ওদের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা ফাইল লালবাজারে আগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরী হয়েছিল। ওতে আমার নাম দেখে আমাকে ডেকে পাঠানো হয়। আমি ওদেরকে ওই স্থানটি ত্যাগ করতে রাজী করি। এজন্য ওরা কেউ এটি রুখতে আদালতেও যায়নি।]

আমার প্রদর্শিত উপরোক্ত রীতিটির বহুল পরিমাণ ব্যবহার সেই সময়েই শুরু হয়েছিল যা বর্তমানে আরও বেশী ভাবে চলছে। কর্তৃপক্ষ কাউর কোন কাজে কৈফিয়ৎ চাইলে সে ঐ একই বিষয়ে তার এক বন্ধুকে দিয়েনিজের বিরুদ্ধে মামলা আনিয়ে ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারী বন্ধ করত। পরে উত্তেজনা কমে গেলে লোকে ওইগুলো ভুলে গেলে আদালতে যে ওই মামলা তার ওই বন্ধুকে দিয়ে উইথড্র করে অথবা হাজির না করিয়ে, খারিজ করান হত।

এই থানা থেকে আমার বদলির সময় হয়ে এসেছে। আমি জোড়াসাঁকো এলাকার চোর, চোট্টা, ঠগী, গুণ্ডা বেশ্যানারীদের ও তাদের উপ-পতিদের নিকট কৃতজ্ঞ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপদেশমত গবেষণা আমি ওদের সাহায্যেই

করতে পেরেছি। আমার ওইসব অভিজ্ঞতা চার হাজার পৃষ্ঠার আট খন্ড অপরাধ বিজ্ঞানে তা লিপিবদ্ধও করেছি। আমি ওদেরকে জেনেছি, বুঝেছি ও ভালোবেসেছি।

আমি প্রসঙ্গত ওইসব পাকাপোক্ত অপরাধী বন্ধুদের মধ্যে দেখা ঐতিহ্য ও মহানুভবতা সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করবো।

[কিন্তু এর আগে এখানে বলে রাখা ভালো যে, এইসব অপরাধীরা অপরাধ করা ওদের জন্মগত অধিকার মনে করলেও দুটি অপরাধ তাদের সমাজেও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। যথা—(১) বিশ্বাসঘাতকতা এবং (২) নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বলাৎকার। এইজন্য হাজত ঘরে ওদের সঙ্গে রেপ কেশের আসামীকে রাখলে তা জানা মাত্র তাকে তারা মারধোর করবেই। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তারা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করেছে। কোন পুলিশ কর্মী ঘুষ নেওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে তাকে তারা ছুরি মেরেছে। কিন্তু মিথ্যা কেসে তাকে ফাঁসালেও সে ক্রুদ্ধ না হয়ে ভেবেছে যে, এটাতে সে নির্দোষী হলেও অন্য বহু মামলাতে থাকার জন্য ওরা তাকে এই সাজা দিয়েছে। তাদের মতে তার যেমন চুরি করার অধিকার আছে তেমনি গৃহস্থদেরও তাকে সাজা দেবার অধিকার থেকেছে।]

(ক) একদিন আমার কলেজে পাঠ করার কালের এক অধ্যাপক ডঃ পাল আমাকে থানাতে দেখে অবাক হলেন। ভদ্রলোক প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন, "বাবা আমি কলাবাগানের ভিতর দিয়ে বাড়ী ফিরছিলাম। আমার কাঁধে ছিল একটা পুরানো ছাতা। চল্লিশ বছর আগে আমার বিয়েতে দান সামগ্রির সঙ্গে ওটা পেয়েছিলাম। ওঁকে যেমন চল্লিশ বছর কাঁধে বইছি ঠিক তেমনই এই পর্যন্ত ছাতাটাও আমি কাঁধে রেখেছি। তাই এর মূল্য সামান্য হলেও আমার কাছে ওটা অসামান্য। ওটা বাবা না পেলে আমার মৃত্যুযন্ত্রণা।"

থানার হেড জমাদার মোহন সিং তখন কিছু তদন্ত তথ্য পকেট বুক থেকে পড়ে থানা ডাইরি বুকে লেখাচ্ছিল।

মোহন সিং ওইসব কথা শুনে আমাকে বললেন, বাবুসাব, ইনে আপকো মাষ্টার থি। তবতো ইনকো ছাতা মিলনে চাহীয়ে। এরপর মোহন সিং ডঃ পালকে বলল, 'আইয়ে মাষ্টারজী।' ওরা দু জনে থানা থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। ওইকালে একজন সাধারণ হেড কনেষ্টবল যে কোন অফিসারদের চাইতে তদন্ত ও শাশানোর ব্যাপারে ঢের বেশী দক্ষ হত। এদের কাছে অফিসারদেরও কাজ শিখতে হতো। প্রায় দু ঘন্টার পরে মাষ্টার মশাই থানাতে ফিরলেন বললেন, 'বাবা, এখনও ছাতা পাইনি, তবে তা আমি পাবো।'

এরপর মাষ্টার মশাই একটু বসে থেকে জিরিয়ে নিয়ে আমাকে বলেছিলেন— 'তোমার মোহন সিং তো আমাকে তোমার এক সিপাহী সত্যনারায়ন সিংহের হেপাজতে আমাকে দিয়েছে। এরপর ওই সত্যনারায়নজী বস্তীতে নিয়ে গিয়ে এক শেখ কীরমমিয়ার সঙ্গে জান-পহচান করালেন। ওই করিম সর্দার আমার নিবেদন

ধীরভাবে শুনে জিজ্ঞাসা করলে। ঠিক সে বতাইয়ে মাষ্টারজী। ওহী কাম মোড়কো পশ্চিমে পর না পুবে পর হুয়ে, আমার উত্তর শুনে উনি বললেন, 'হু হুঁ। ওহীত মেরী এলাকা। আচ্ছা আর কাহিয়ে—পিছুমে না বগলমে আপকো একটো ধাক্কা ওহী বকথ্ মিলি? আমার উত্তর শুনে উনি ঘাড় নেড়ে বললেন 'ঘাবড়াইয়ে মাৎ মাষ্টারজী। ওহী লেড়কা হামারী থি। আপকো ছাতা মিলেগি। লেকেন এইখানি মৎ করিয়ে। এরপর ঐ ওস্তাদজী আমাকে অন্য একটা বস্তির মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে একটা ঘরে সারি সারি করে রাখা শুধু ছাতা। কোন কোনটা হাতল হাতীর দাঁত দিয়েবাঁধানো। কোন কোনটা বাঁট পুরোপুরি রূপার পাত দিয়ে মোড়া। কিন্তু বাবা আমি একজন নির্লোভী অধ্যাপক। ওই ওস্তাদজী আমাকে আমার ছাতা ওর মধ্যে হতে বেছে নিতে বলল বটে কিন্তু আমি আমার ছাতাটা ওর মধ্যে দেখতে পেলাম না। এতে ওই সর্দারজী আমাকে আসস্থ করে জানালো যে, ওই ছাতা তখনও ওখানে জমা পড়েনি এবং বললেন যে, আমি যেন আধ ঘণ্টা পরে যাই ও আমার ছাতাটা নিয়ে আসি। হাঁ মাষ্টার মশাই ছাতা ফিরে পেয়েছিলেন, তাতে উনি বলেছিলেন, 'পৃথিবী তাহলে একটা নয়। বাপু আর একটাও আছে!'

[ডঃ পাল ঐ সময় আমাকে বলেছিলেন যে, এদের ওপর থিসিস লিখে তুমিও আমাদের মতন ডকটরেট হও। উনিই আমার মাথাতে অপরাধ বিজ্ঞানে ডকটরেট হওয়ার চিন্তা প্রথম ঢোকান। কিন্তু ডঃ গিরীন্দ্র শেখর আমাকে বলেছিলেন, এখনও এর সময় হয়নি। লোকে ডকটরেট হয়, কিন্তু—বহুজন তাদের থিসিস পাবলিশ করে তা জনগণকে জানাতে সাহসী হয় না। পাছে ওর অনাষ্যতা লোক চক্ষে ধরা পড়ে। তুমি এমন থিসিস লিখবে যা প্রকাশ ও প্রচার করতে পারবে।

(খ) অমুক মহারাজ ক্যালকাটা ক্লাবের মাত্র দ্বিতীয় ভারতীয় মেম্বার। সেইসঙ্গে ইংরাজ চিফ সেক্রেটারীর সঙ্গে বান্ধুত্ব। স্যার আর, এন, মুখার্জী প্রথম মেম্বার এই হেন এক নাগরীকের জামাতা বাবাজীর হাত ঘড়ি বিডন স্ট্রীটে ছিনতাই হয়েগিয়েছিল। রাইটার্সের ফোন পেয়ে পুলিশ-কমিশনার উদ্বিগ্ন হলেন, তিনি পাল্টা ফোন করে আমাদের উদ্বিগ্ন করলেন।

তক্ষুনি ডাক পড়ল এলাকার এক বড় সর্দার বড়মিয়ার উনি থানাতে এসে ইনচার্জ বাবুকে বললেন। 'বাবুসাব'। ঘড়ী আপলোগকো মিলবে। লেকেন কেস উস নেহী হোবে। জবানী আপ লোগ ঠিক রাখিয়ে হাঁ।

এই সময় ওই জানাইবাবুও থানাতে উপস্থিত ছিলেন। বড়মিয়া ওই জামাইবাবুর দিকে কিছুক্ষন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন ও তার পর আপন মনে বললেন, হাঁ। আমার আদমী ঠিকসে আদমী চিনেছে। এরপর উনি ওই জামাইবুকে বললেন। তব আইয়ে দামাদবাবু—মেরিসাথ'। ওরা দুজনে থানা থেকে বেরিয়ে গেলে আমরাও নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা শুনে ও তা জেনে আমরা ফের শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম।

যাক—তবু মন্দের ভালো এই যে জামাইবাবু পরবর্তী ঘটনা চেপে যাওয়াতে ও তা কাউকে না বলাতে ব্যাপারটা ফের বেশীদূর গড়াইনী এই চমকপ্রদ ঘটনাটি এইবার এখানে বলা যাক।

বড় মিয়া ওই জামাইবাবুকে প্রথমে একটা বস্তীতে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে ওরা তার চোখে একটা কাপড় জড়িয়ে মাথা ও মুখ ঢেকে দেয়। এরপর ওই অবস্থাতে একটা হ্যাকনি ক্যারেজ অর্থাৎ ঘোড়া গাড়ীতে তুলে বহু দূরে অন্য একটা বস্তীতে এনে তার চোখের ওই বাঁধন খুলে দিয়ে একটা মাঠকোঠার দ্বীতলার ঘরেতে নিয়ে আসে। সেখানে এসে ওই জামাইবাবু দেখলেন যে, ওই ঘরের একটা পুরা দেওয়ালে বহু পেরেক পোতা ওইসব পেরেকের প্রতিটীতে এক করে হাত ঘড়ি ও পঁ্যাক ঘড়ি ঝুলছে। এইসব দেখে শুনে ওই জামাইবাবু তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। ওই সব রুপার ও সোনার ঘড়ির মধ্যে দুইটি সোনার ঘড়িতে হীরক বসানো ছিল।

বড় মিয়াঁ এবার জামাইবাবুকে বলে দিলেন কেয়া দেখতে বাবুসাব। অপক ঘড়ি কোনঠো। উ আপনি চুন লিয়ে, অর্থাৎ—ওটাকে অপনি চিনে ও বেছে নিন।

জামাইবাবু এতে লোভাতুর হয়ে উঠলেন। ওর দৃষ্টি তখন ওই হীরাবসানো নীরেট সোনার ঘড়িটার দিকে। উনি ওই ঘড়ীটাই তাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন 'ওহি ঘড়ি মেরা ঘড়ি হ্যায়।' এই কথাটা শুনা মাত্র ওই গুণ্ডা সর্দার বড় মিয়াঁ ক্রোধে ফেটে পরে তাকে বলেছিল। বাবুসাব, হামলোক তো বদমাস হ্যায়ই। লেকেন আপ হামলোকসে ভী বদমাস আছে। ওহী কোনেওয়ালী ক্যারেড গেণ্ডকো ঘড়ি আপকো আছে। লেকেন আপকো ওহী ঘড়িভী নেহী মিলেগা।

এর পর ওরা ফের সকলে ওই দামাদবাবুর চোখ দুটো ঠিক ওমনি ভাবে ঢেকে তাকে ওই একই হ্যাকনী ক্যারেজে তুললো ও তারপর বিডিন ষ্ট্রিটের যে জায়গাতে তার ঘড়ি ছিনতাই হয়েছিল ঠিক সেই জায়গাতেই তাকে নামিয়ে দিয়েছিল।

এই জোড়া সাঁকো থানার এলাকাটী ছিল ঐকালে সমগ্র ভারতের মধ্যে ক্রীমীনোল জীতে গবেষণা করার উপযোগী একটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবেষণাগার। কিন্তু কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সেণ্টাল এ্যাভিনিই তৈরী করতে ওর দুধারের বিরাট বস্তীগ্রামগুলি ভেঙ্গে ফেলে অপরাধ বিজ্ঞানের ছাত্রদের একটা বিরাট ক্ষতি করে দিয়েছন। তবু মন্দের ভালো এই যে, ওই ধংসাত্মক কাজ সম্পূর্ণ হবার পূর্বে আমি ওই গবেষণাগার ব্যবহার করতে পেরেছিলাম।

[বিঃ দ্রঃ—উপরোক্ত পিকপকেট সর্দ্দার ও স্পেশালিষ্ট মোজেসের সঙ্গে আমার রিটারার করার পর মাত্র একবার দেখা হয়েছিল। তখন সে বৃদ্ধ হওয়াতে নিজে কাম উম না করে শুধু লেড়কাদের শিখছা দেয়। ওই দিন আমি আমার এক ডাক্তার বন্ধু উভয়ে উভয়কে দেখে গাড়ী হতে নেমে রাজাবাজারের মোরে কথা বলছিলাম। হঠাৎ আমার ওই বন্ধু আঁতকে উঠে তার পকেটে হাতদিয়ে বলল, 'ভাই আমার সর্বনাশ হয়েগিয়েছে। জামাইবাড়ী তত্ত্ব পাঠাবার জন্য দুহাজার টাকা আজই

ব্যাঙ্ক হতে তুলেছিলাম।' আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে, ওর পকেট রেজার ব্লেডের দ্বারা কাটা। আমিই এইজন্য দায়ী। আমাকে না দেখলে উনি এসময়ে ওর গাড়ী হতে ওখানে নামতেন না। সলজ্য ভাবে আমি এদিক ওদিক তাকাছিলাম।

হঠাৎ ভীর থেকে এক প্রায় বৃদ্ধ ইজের পরা লোক বেরিয়ে এসে আমাকে সেলাম করে বললো। 'হামকো চিনতে হুজর। হামি সেই মোজেজ মিয়াঁ আছে। হামশুনেছে আপনার পিনসন হুয়ে গিয়েছে। লেকিন আভিতক্ এই বান্দা আপকো মদতমে রহে। অভিনভ এই বান্দ আপকো মদতমে রহে। সমঝে কি এহীবাবু আপকো দোস্ত। লেকন সাব ক্যাবোলেক। হামে লো ককো জামানা কব চলা গয়া। এহী জামানা লাড়কা লোক কো বাত ছোড়দিয়ে সাব। ইনে লোক আদমী চিনতা নেহী। ছজতীয়াকো ইজ্জত দেতা নাহী।'

এর পর ওই মোজেজ মিয়াঁ ওই ভীরের মধ্যে থাকা এক ছোকরাকে ডেকে বলল, এ রুকমনীয়া। ইনে বাবুকো রুপেয়া অভি আপোষ দেও। এতে রুকমনীয়া ছুটে একটা দোকানে ঢুকে ও'র ওই টাকা সমেত মণি ব্যাগটা আর দোস্ত রহমেনিয়া সেখানে, ড়েকে আনলো। আমার ওই বন্ধুবর গুণে দেখলেন যে, পুরো দুহাজার রুপেয়া তখনও তাতে মজুত থেকেছে।

ডাক্তার বাবু ওথেকে ওদেরকে দুশো টাকা বক্‌শিশ দিতে চাইলো। ওরা তাতে প্রতিবাদ করে বলেছিল, 'বাবু সাব। হাম লোগ সব শেয়ানা আছি। হামলোগ কোই ভীখ মাঙনলয়ালা মামুলী আদমী নেহি। দান-উন কহীসে সে নেহী লেবে। আপনা হিম্মতমে সে কামাতা হ্যায়'।

এর পর ওদের একজন ডাক্তার বাবুর গলাতে ঝুলানো স্টেটিস স্কোপ দেখে তাকে ডাক্তার বুঝে তাকে উল্টো একটা গ্রাটিশ উপদেশও দিয়ে দিল। ডাক্তারসাব। রুগী লোকসে ফীজ থোড়ী কম লিজিয়ে, গরীবকো মাগনা দেখিয়ে, উন লোককো পকেট আপ মাত্ মারিয়ে।

(গ) আমার এক বন্ধু এ্যাডভোকেট রোজ সন্ধ্যে বেলা হাইকোর্ট হতে পদব্রজে রেড-রোড ধরে তার ভবানী পুরের রেসিডেন্স কাম, [CUM] চেম্বারে যেতেন। ঐ দিন সন্ধেতে গড়ের মাঠের কাছে এক গাছতলা থাকে বড় ছুড়ি হাতে লাল গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরা একজন লম্বা লোক বেরিয়ে এলো ছোড়াটা উকিল বাবুর বুকেতে ঠেকিয়ে বললো। 'এবে শালা, লিয়ে আয় তুহার পাশ যা কুছ আছে।' আমার ওই এ্যাডভোকেট বন্ধু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার ম্যাণ ব্যাগটা পকেট থেকে বার করে তার হাতে তুলে দিল। কিন্তু বন্ধুর কালো কোট দেখে ওই লোকটা তাকে উকীল বুঝে নিল। এবার ব্যাগটা খুলে ওতে থাকা চারশ টাকা গুণে দেখলো। এর পর সে ওর ওই ব্যাগ হতে ওর ঠিকানা সমেত একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে সেটা তার কালো ফতুয়ার পকেটে রেখে বলল। 'আপ উকিল বাবু হ্যায়, অপকো রুপেয়া ম্যায় নেহী লেবে। এই ব্যাগ-আপ আপোষ লিয়ে।

ওই ব্যাগ সমেত মুক্তি পেয়ে এ্যাডভোকেট বন্ধু ত্বরীৎ গতিতে ওই স্থান ত্যাগ করেছিল।

এই ঘটনার সাত মাস পরে ওই উকিল বাবু তার চেম্বারে একাকী বসে ছিলেন। একজন চোঁয়াড়ে চেহারার লোক তার ওই ঘরে ঢুকে তাকে আদাব জানিয়ে তার মামলার বিষয়ে সাহায্য চাইলো। ও বললো, সার, এক ঘুষুল বাবু মেরি পিছে পড়ে, ও মেকো টাঙ করে। মে পাকড় যায়ে তো জামানতকো ইন্তার করিয়ে, উকিল বাবু' তার কথা শুনে আবেদন ড্রাফট করে তার কাছ ফিজ চাইলেই, সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল। ক্যা আপ ফিজ মাঙতা বেইমান। আপকো ফিজ তো-মে উসরোজ ময়দানমে ছোড় দিয়ে সে, বেইমান কাহাকা।'

এবার আমাকে এই সব বন্ধু দের ছেড়ে এই থানা-থেকে বিদেয় নিয়ে অন্য থানাতে যেতে হবে। এবার পাকা খবর এসে গেছে। উপরন্তু শুনা গেল যে, ইনচার্জ বাবু সত্যেন মুখাজীকেও লালবাজারে গোয়েন্দা বিভাগে বদলি করা হবে। এই সত্যেন মুখাজী ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তার মতন দুধর্ষ অথচ অতি সৎ পুলিশ কর্মী এইশতাব্দীতে কম দেখা গেছে।

এতদিন পরে আমাদের দুজনের ছাড়াছাড়ি হবে। যে কোন মুহূর্তে হকুম আসতে পারে। এই বুঝে সত্যেন মুখাজী আমাকে একদিন তার ঘরে ডেকে কিছু উপদেশ দিলেন। সত্যেন বাবু পরে রায়বাহাদুর হয়েছিলেন।

আমাকে স্নেহ সূচক স্বরে বললেন, দেখ বাপু, তোমাকে আমি খুব যত্ন করে কাজ শিখিয়েছি। তুমি এখন আমার একমাত্র উপযুক্ত শিষ্য এখন যাবার আগে আমি দশটি উপদেশ তোমাকে শুনাবো। এই মত কাজ করলে তুমি দ্রুত প্রমোশন পাবে ও কোন শত্রু তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।

সেই দিনের ওই উপদেশগুলো আমার আজও তাজা ফুলের মতন মনে পড়ে। তবে ওই দশটা [Ten Commandment] উপদেশের কয়েকটি আমি গ্রহণ করতে পারিনি। এতে গুরুর আদেশ লঙ্ঘণ করায় আমি পাপী হয়েছি। এই দশটি উপদেশ আমি নিচে উদ্ধৃত করে ছিলাম।

"এক নিস্প্রয়োজনে কাউর কোন উপকার করবে না। যে ডুবছে সে বদলোক হলে আরও ডুবাও। এর কারণ এই যে, কাউকে উপকার করার কোন শেষ নেই। কাউকে আজ যদি তুমি একটা উপকার করো, তাহলে সে কালই তোমার নিকট হতে আর একটা উপকার চাইবে, এরপর যে, দিন তুমি তার উপকার করা বন্ধ করবে, সেই দিন হতেই সে তোমার শত্রু হয়ে উঠবে, কিন্তু তুমি সুবিধা পেলেই লোকের অপকার করতে পারো, তাহলে সে বলবে যে তোমার হুকুমমত আমি তোমার সব কাজ করে দেবো, এর প্রতিদানে তুমি শুধু আমার কোন অপকার দয়া কার করো না। এখানে কাউর উপকার করে তার দ্বারা যে কাজ করাতে পারবে না, সেই কাজ তার কোনও অপকার না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার দ্বারা করিয়ে নিতে পারবে।

(২) জীবনের উন্নতির জন্য খোসামদ অর্থাৎ চাটুকারীতা কিছুটা প্রয়োজন।

কিন্তু অনাবিল ভাবে কাতর খোসামদ করলে। কিন্তু ওর মধ্যে দুইমাস গ্যাপ পড়লেই পূর্বের খোসামদ গুলো আবাদি হয়ে বাতিল হবে। তাহলে যে ওই কাজ গোড়া হতে নূতন করে গোড়া হতে আরম্ভ করতে হবে তাই ঠিক প্রমোশনের সময়ের ঠিক দুই মাস আগে থেকে ওটা আরম্ভ করো। যারা বহু আগে হতে আরম্ভ করেছে। তারা এতো দিনে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তখন তুমি জোর কদমে তাকে ওই বিষয়ে ডিঙিয়ে যেতে পারবে।

(৩) অর্থব্যায়ের কার্পণ্যের মত শক্তি ব্যায়ের ও কার্পণ্য করো। কারণ—পরে আর ও বড় কাজে ওর দরকার হতে পারবে। সুযোগ বেশী আসেনা। তাই ওটা আশা মাত্র ওকে কাজে লাগাবে, প্রয়োজন হোক বা নাহোক, প্রতিটি লোকের দুর্বলতার খবর রাখে। তাহলে তার সঙ্গে বিরোধ বাঁধলে ওই গুলো ব্যবহার করতে পারবে।

(৪) প্রতিটি লোককে সন্দেহ করবে। কিন্তু তা যেন সে না জানতে পারে। উপরওয়ালাদের কখনও বিশ্বাস করবে না। তবে মুখে বলবে যে, তুমি তার বশংবদ।

(৫) কৈফিয়ৎ কেউ চাইলে জব্বর ভাবে তাকে তা দেবে। কখনও তাকে বলবে না—স্যার। আই মে বেই একসকিউজভ। তাহলে ওরা তোমাকে একটা পানিশমেন্ট দেবে। তুমি তাতে বলবে যে, তুমি ঠিক কাজই করেছো, এখন তুমি আমাকে বলে দাও ভবিষ্যতে ওতে আমি করবো, উপরন্তু ওতে একজন উর্দ্ধতনকে জড়িয়ে দেওয়া ভালো। তাতে জয়েন্ট ডিফেন্সের সুবিধা পাবে।

(৬) যদি বুঝো যে অমুক লোক তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাঠাতে পারে। তাহলে তার ওই অভিযোগ পাঠাবার আগেই তুমি তার নামে একটা সত্য মিথ্যা অভিযোগ পাঠাবে। তাহলে তাকে তখন আত্মরক্ষার্থে ব্যাস্ত হতে হবে।

(৭) মাঝে মাঝে একে ওকে কামড়ে বুঝতে হবে যে, তুমি কামড়াতে পারো ও ওই ভাবে কামরাবার ক্ষমতা তোমার থেকেছে।

(৮) ভীড় সরাবার সময় লাঠি কখনই ছুঁবে না। তাতে বহু লোক ক্ষেপবে। ভীড়ের মধ্যে ছোট স্টিক নীচু করে ওদের একজনের পিছনে ঠুকবে। তাতে যার লাগবে, সেই শুধু তা বুঝবে এবং দৌড়বে। তখন তাকে দৌড়াতে দেখে অন্যরাও দৌড়াবে।

(৯) যে যতো ছোটই হোক না কেন তার কাছ হতেও উপদেশ শুনবে ও মতলব নেবে ও তাহাতে উচিত বুঝলে কিছু গ্রহণ করবে।

(১০) ক্ষুদ্র শত্রুকেও উপেক্ষা করবে না। কাউকে একবার ঘাটালে তাকে রেহাই দেবে না। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। নয়তো ঐরূপ লোককে এড়িয়ে যাবে।

এই সত্যেন বাবু ছিলেন একজন কলিকাতা পুলিশের প্রবাদ পুরুষ। অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি পুলিশে সর্বোচ্চ পদী তো হয়েছিলেনই। উপরন্তু পুলিশের প্রাপ্য প্রতিটি উপাধি ও পদক তিনি লাভ করেছিলেন। জনগণের মত খোদ পুলিশ কমিশনার ও তাঁকে সমীহ করেছে। তাঁর রিটায়ার করার পর আমি পদটি পেয়ে ধন্য

হয়েছিলাম। ওর ওই আসনে উনি আমাকে বসিয়ে কলিকাতা ছেড়ে ওই দিনই আন্দামান দ্বীপে বাস করতে জাহাজে উঠেছিলেন।

এই বার তিনবৎসর চাকুরী পূরা হবার পর ১৯৩৪ খ্রীঃ শেষে আমাকে এই থানা ছাড়তে হবে। তবে এখোনো এই স্থান ত্যাগ করতে পনেরো দিন দেরী রয়েছে।

এইবার এই সময়কার দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ওখানে কিছু বলবো। এটা সমাজ বিজ্ঞানীদের গবেষণাকার্যে কিছু উপকারে আসতে পারবে।

[এই বড়বাজার ও জোড়াসাঁকো থানাতে থাকা কালে আমি আমার অকৃত্রিম দুই বন্ধু (১) শ্রী হেমরাজ পোদ্দার'ও (২) শ্রীরাম গুপ্ত নামে দুই সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী ব্যক্তির আমি সংস্পর্শে এসেছিলাম। এদের যতটা আমি উপকার করেছি, তার বহুগুণ বেশী তারা দুজন আমার উপকার করেছিল। তাদের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তারা আমাকে ত্যাগ করেনি।]

শ্রী শ্রীরাম গুপ্ত এই ভদ্রলোক ১৯৩০ রিক্ত হস্তে ফরিদাবাদ হতে কলিকাতা আসে। বড়বাজারে কংগ্রেসীদের জীবিকার জন্য তৈরী চাপাটী খাওয়াতে এসে এজেন্টদের মধ্য আহত হলে, আমি তাকে হাসপাতালে পাঠাই। সেই সূত্রে ধীরে ধীরে এই দেশপ্রেমী লোকটার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কারণ—ওই সময় সে বহু জুয়াড়ীদের খবর আমাকে দিত। তার খবরে বহু চোরাই মালও আমি উদ্ধার করে নাম কিনি।

এই সময় জুয়ার কেসে যত ফাইন হত তার অর্ধেক পুলিশকে বকশিশ দিত। দুই বৎসর দেওয়ালী কালে ওর খবর মত জুয়া ধরে প্রায় চার হাজার টাকা আমি রিওয়ার্ড পেয়েছিলাম। শ্রীরাম গুপ্তকে ওটা আমি দিয়ে ওর ব্যবসাতে লাগাতে বলি। এতে শর্ত থাকে কুড়ি বছর পর তার ওই টাকা তার ব্যবসাতে বাড়লে সে ওই দিয়ে আমার মাদরাল গ্রামে আমার দেওয়া জমিতে কিছু সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের সৌধ তৈরী করে দেবে। এই প্রতিশ্রুতি ২০ বছর পর সে নিজেই মনে করে ঐ কাজ করেছিল। তবে এরপরেও বিগত যুদ্ধকালে ওকে আমি আরও কিছু এরজন্য দিয়েছিলাম।

[বিঃ দ্রঃ—আমি লক্ষ্য করেছি ও তা দেখে ক্ষুণ্ণও হয়েছি বহু হরিজন হিন্দু নিজেরা প্রতিমা স্পর্শ করে পূজো করতে বা পূজো দিতে অপারগ। এই অবস্থার প্রতিকারে আমি মাদরাল গ্রামে আমার বহু জনদরদী স্বার্থত্যাগী ও সমাজসেবী বন্ধুগণের থেকে অর্থ ও নানাবিধ সাহায্য দানরূপে গ্রহণ করে একটি মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। উদ্দেশ্য ঐ সব দুলে বাগদি মুচি ইত্যাদি হরিজন হিন্দুরা নিজেরা বিগ্রহ স্পর্শ করে নিজেরা পূজা অর্চনা করতে পারে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা এতে যদি ওখানে না আসতে চায় তো না আসুক। কিন্তু বহু কষ্টে হিন্দুরা ও সিডিউল্ড হিন্দুরা ওখানে একত্রে পূজা অর্চনা করেছে।

আমার আত্মীয়বৎ ও স্থাপত্যবিদ বন্ধুর সাহায্যে ওখানে একটা বাড়ী তৈরী করেছি। একটা আবাসিক উচ্চবিদ্যালয় ও একটি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় গড়ে তুলেছি।

আমাদের জমিদারীর আয় ও আমার লেখা বই থেকে আয়ের সাহায্যে ওখানে বহু জমি কিনে একটা বৃহৎ বাগান ও খেলার মাঠ করি। প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রূপে সকল প্রকার দায় দায়িত্বও আমাকে পালন করতে হয়েছিল জনগণের কিছুটা সেবা যাতে করতে পারি সেই জন্য। এই বাড়ীটি আমার প্রথমা স্ত্রী শান্তিদেবীর নামে "শান্তিধাম" রাখা হয়েছে। গ্রামবাসীদের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন এই মধুর স্মৃতিটুকু বজায় রেখে দিতে চেষ্টা করেন।

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৎসর বিশেষ কারণে আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী অমলা দবীকে বিবাহ করি। তাঁরই আগ্রহে আমাদের গ্রামের এই সকল উন্নয়ণমূলক আরও কিছু কাজ করতে শুরু করি। ইনিও বেশী দিন বাঁচেন নি—বর্তমানে কলকাতার বসত বাড়ী তাঁরই নামে এখনও স্মৃতি বহন করে আছে। যাঁদের অনুপ্রেরণায় আমার এত সব ক্রিয়াকাণ্ড তাঁরা কিন্তু আজ একজনও নেই। এই কথাটা বারে বারে আমাকে ব্যথিত করে তোলে। আরও ভাবি যে স্ত্রীকে ভালবাসা আমার কাছে কোনও আকস্মিক ভাবাবেগের বিষয় ছিল না—আমার মতে স্ত্রীকে ভালবাসা বা তার প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত হওয়া বংশগত আবশ্যিক ধর্ম।

এর আগে স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়ে আরও কিছু বলতে চাই। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে স্বামীজী অত্যধিক কঠোর পরিশ্রমের জন্য অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। স্বামীজীর বাড়ীর বহু স্মৃতি বিজড়িত ও পুণ্য ঘরের মেঝে স্পর্শ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল বেশ কয়েকবার। তাঁরই মুখে স্বামীজীর নিম্নোক্ত শেষ ইচ্ছার কথা শুনেছিলাম। তাঁর ইচ্ছা ছিল সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাহ্যিক রূপ মত এমন একটি সর্বজনীন উপাসনালয় তৈরী হবে যার চার দিকের স্থাপত্য হবে বিশ্বের চারিটি প্রধান ধর্মের প্রতীক স্বরূপ যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের মন্দির মঠ, গীর্জা ও মসজিদের মতন। আরও যে সকল ধর্ম আছে তাদের আদর্শগত রাখা যেতে পারে। এই উপাসনালয়ের মাঝে র‍্যাকে রাখা থাকবে সব ধর্মের ভাল ভাল গ্রন্থসকল এবং সকল ধর্মের সংকলন করে একটি পৃথক ধর্মগ্রন্থও লিখতে হবে। প্রতি সপ্তাহে ওখানে প্রত্যেক ধর্মের মানুষেরা একসঙ্গে এই গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনবে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে "করপরেটিভ ষ্টাডিজ অব রিলিজিয়ন"কে আবশ্যিক পাঠ্য করতে হবে। আর শিক্ষার্থীদের বলা হবে ধর্মগুলির মধ্যে মিল খুঁজে বার করতে।

অপরাধীদের মধ্য থেকে ইনফরমার রাখতাম আগেই বলেছি। শ্যামপুকুর থানার এসম্বন্ধে একটা ঘটনা বলি। যাঁদের সম্বন্ধে খবর জানবো সে সম্বন্ধে ইনফরমারের কতটুকু অভিজ্ঞতা বা ক্ষমতা আছে তা জানা দরকার। এক ইনফরমার একদিন জানালো যে এক ব্যক্তি এক পুটলি জাল মুদ্রা নিয়ে জনৈকা বেশ্যা নারীর বাড়ীতে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ট্রেন ধরবে। যথারীতি ওয়াচ রাখা হল। দেখা গেল এক ব্যক্তি পুটলিসহ সেই বেশ্যা বাড়ী ঢুকছে এবং গভীর রাতে সেই বাড়ী ঘিরে ফেলে গ্রেফতার করেছিলাম। ঐ তক্তাপোষের তলায় সেই জাল মুদ্রার পুটলিও পাওয়া

গেল। যেহেতু ঐ নারীই ঐ ঘরের বাসিন্দা এবং ভাড়ার রসিদও ওঁরই নামে তাই আইনমত ঐ নারীই এই জাল মুদ্রার জন্য অপরাধী। এই জন্য ঐ নারী প্রকৃত অপরাধী নয় জেনেও তাকেও গ্রেফতার করতে হয়েছিল। তাকে গ্রেফতার না করলে আদালত এবং আমার উর্ধ্বতন অফিসাররা আমাকে কৈফিয়ৎ চাইতেন। পাবলিক প্রসিকিউটর প্রকৃত অপরাধী ব্যক্তিটির সঙ্গে নিরীহ গরিব মেয়েছেলেটিকেও আদালতে তুলেছিল। এবং বলেছিল যে কে প্রকৃত অপরাধী তা আদালত বিচার করুক। ঐ নারী আত্মপক্ষ সমর্থনে আদালতে কি বলবে কারণ সে নিরক্ষরাও দরিদ্র। তাই আইনজ্ঞ নিয়োগ করার সামর্থ নাই।

নিম্ন আদালত থেকে হাই কোর্টের সেসন আদালতে এর বিচার হলে ঐ জালিয়াৎ লোকটি বলেছিল যে, সে ঐ নারীর ক্যাজুয়াল ভিজিটর বা কাষ্টমার মাত্র। ওর ঘরের তক্তাপোষের নীচে কি আছে বা না আছে তা তার জানার অধিকার নেই। এই অজুহাতে সে সসম্মানে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল আর ঐ নির্দোষ নারীর চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল। এই মামলা থেকে গৃহের দ্রব্যের হেফাজাতীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে আইন যে কত ত্রুটিপূর্ণ তা আমি জেনেছিলাম। আবার জজ বা জুরীরাও এ সম্বন্ধে অসহায়। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন যে "বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে।" আদালত থেকে আইনমত ঐ নারীর সমর্থনে একজন আইনজ্ঞ রাখা হয়েছিল কিন্তু তিনিও পারলেন না। উপরোক্ত বিচার বিভ্রাটের কারণ হল ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং যথাযথ আইনের ব্যবস্থার অভাব। ভারতীয় রীতিনীতি ভাবধারা সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে সমাজ বিজ্ঞান তথা আইন ব্যবস্থা এখনও রচিত হল না। এই সব জজ-জুরী আইনজ্ঞেরা ধনী মানী ঘর থেকে এসেছেন তাই সমাজের নিচু স্তরে তথা গরীব মানুষদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। ভারতীয় বিচিত্র অপরাধ বিজ্ঞান সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান নেই। এসব নোংরা লোকদের নিয়ে কেউ গবেষণাও করেনি। তাছাড়া এই সব ঘরের মানুষ নিচু বেশ্যাদের বাড়ীতে কোনও দিন যেতেন না—তাই তাদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। এই বেশ্যারা পেটের দায়ে দেহ বিক্রি করার সময় কত চোর ডাকাত বদমাইসকে বাধ্য হয়ে উপপতিরূপে গ্রহণ করে। আর যখন সামান্য পয়সাতে পেট চলে গেলেই হল তখন ঐসব আজে বাজে কাজে তারা যাবে না। এইসব বড় বড় অপরাধের ব্রেনের সেট আপ এবং পরিবেশের সম্ভাব্যতার রূপ ভিন্ন। আবার এক্ষেত্রে ইনফরমারদের এক্সপোজ করাও বে-আইনী। ওদের গোপন সংবাদ পৃথকরূপে লিপিবদ্ধ করাই রীতি। আর তা আদালতে দাখিল করাও বে-আইনী। যদি ঐ ইনফরমারকে আদালতে সাক্ষী করা হত বা তার পাঠানো সংবাদ আদালতে দাখিল করা হত তাহলে ঐ অক্ষম নির্দোষ নারী মুক্তি পেত এবং দোষী শাস্তি পেত। যে পেটের দায়ে দেহ বিক্রয় করেই ঠিক মত চলতে পারে না তাকে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হল। কেউ বুঝলেন না যে যদি সে জালিয়াতি করে অত টাকা রোজগারই করতে পারবে তবে সে বহুজনের কাছে কেন দেহ বিক্রয় করবে? জুরীদের একজনকে

আমি চিনতাম তাই পরে একদিন প্রকৃত ঘটনা বলাতে তিনি আঁতকে উঠে বলেছিলেন এ্যাঁ।

ঐরূপই বহু ঘটনারই আমি নীরব সাক্ষী তাই এসব ঘটনা মনে পড়লেই আমি অনুশোচনাতে দগ্ধ হই। বিপক্ষীয় উকিল এই বিষয়ে জেরা করলে আমি বলতাম যে আমার মতে ঐ নারী এই বিষয়ে নির্দোষী কিন্তু ঐ পয়েণ্টে ডিফেন্স হতে আমাকে কোনও প্রশ্ন করা হোল না। ধর্মাধীকরণের আসনে বসে এমনি কতো অধর্মের কাজই অজ্ঞাতবশতঃ করা হয়ে থাকে।

এই থানাতে থাকা-কালে আমি মানুষের দৈহিক অসাড়তার [ফিজিকাল ইনসেন্সিবিলিটি] সহিত মানসিক অসাড়তার [মেন্টাল ইনসেন্সিবিলিটি] বিষয়ে কিছুটা গবেষণা করেছিলাম।

কোন এক পুরোনো পাপীকে আমি তার রক্ষিতার গর্ভজাত এক পুত্রকে আদর করে বলতে শুনেছিলাম—"এ শালে বড়ো হবে তো হামসে বহুৎ বড়া চোর হবে। এ শালে বে দাগী চোর বানবে।" এখানে ওর পুত্রকে ভদ্র ঘরের কারুর মতো ডেপুটি হাকিম হবার কামনার বদলে সে তার পুত্রকে দাগী বড় চোর করতে চেয়েছে।

কিন্তু বহু গৃহস্থ মানুষের মধ্যেও এই একই নৈতিক অসাড়তার প্রকার ভেদ দেখা যায়। এই বিষয়ে পূর্ব অধ্যায়ে কয়েক স্থানে আমি বলেছি। পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে ভদ্র ঘরের পৃথকরূপ নৈতিক অসাড়তার দৃষ্টান্ত বহু আমি দেব। এই অবস্থার শিকার হলে যে কোনও শিক্ষিত গৃহস্থ মানুষও হঠাৎ জঘন্য অপরাধী হয়ে যেতে পারে।

এই দিন হঠাৎ টেলিফোন ম্যাসেজ এলো—এখুনি আমাকে শ্যামপুকুর থানাতে জয়েন করতে হবে। ওখানে কোনও এক ঘটনার টাল সামলাবার জন্য আমার প্রয়োজন এখুনি। একটা ট্যাক্সী করে আমার পরিবার বর্গ উঠে বসেছে। লরীতে জিনিষপত্র উঠানো হয়েছে। আমি এবার জোড়াসাঁকো থানা ত্যাগ করে শ্যামপুকুর থানাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সময় সকাল আটটা ১৯৩৪ খ্রীঃ সবে আরম্ভ হয়েছে। সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ পড়ে রয়েছে। কতদিন পর এই পথ শেষ হবে তা এখনও আমার অজ্ঞাত।

———